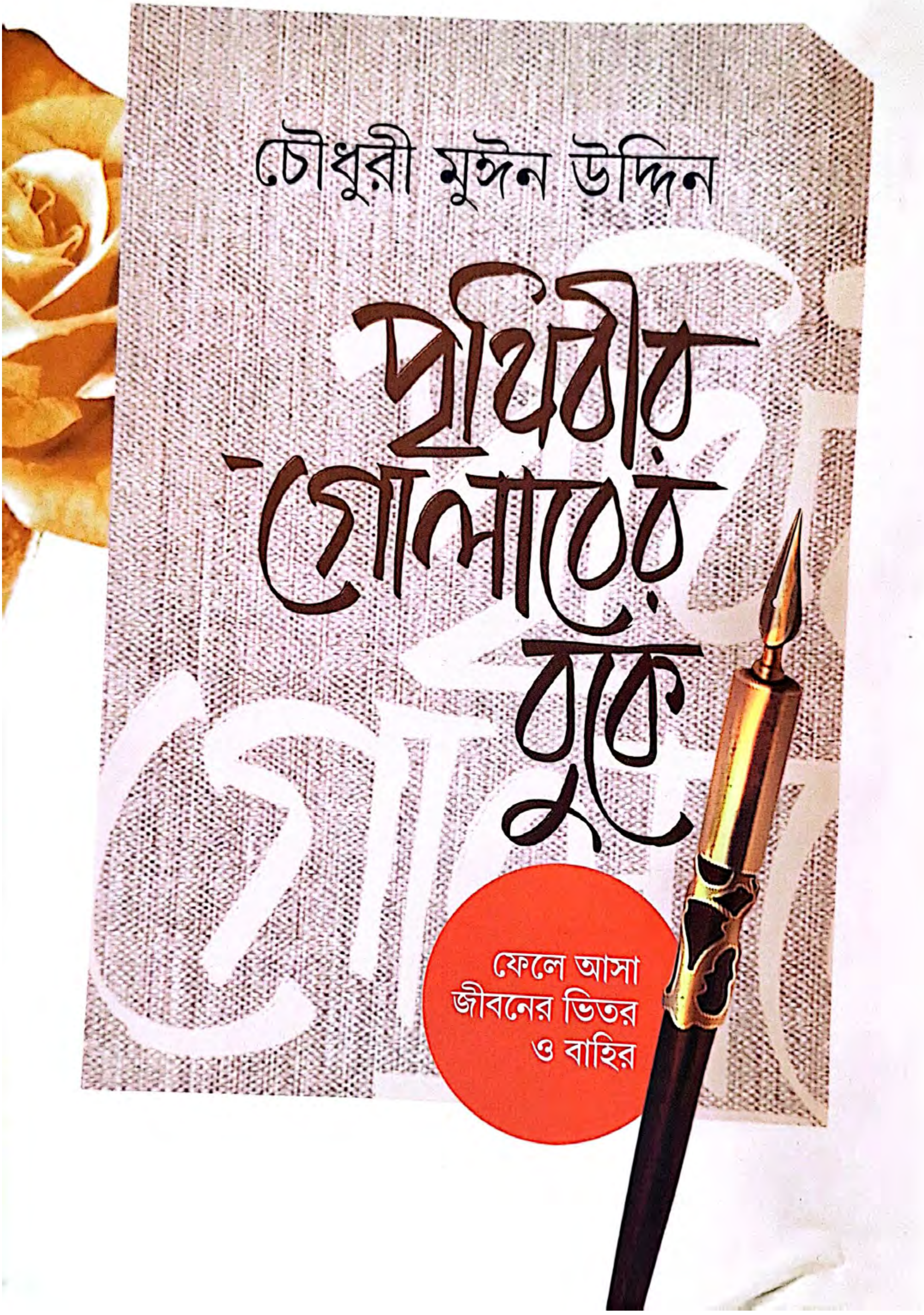

CamScanner

পৃথিবীর গোলাবের বুকে

ফেলে আসা জীবনের ভিতর ও বাহির

চৌধুরী মুঈন উদ্দিন

BORNOMALA
বর্ণমালা

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

উৎসর্গ

আমার আব্বাজান
দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী
এবং দুই আম্মাজান
দেলজাহান বেগম চৌধুরানী
ও
জাহানারা বেগম চৌধুরানীর
পুণ্য স্মৃতির স্মরণে

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

'তরুণ সূর্যের মতো জন্ম মোর এ বিশ্বের বুকে,
আকাশের কক্ষপথ, বিচিত্র এ নভাঙ্গন পরিচিত নহে মোর কাছে,
আমার আলোক স্পর্শে জাগে নাই কক্ষপথে এখনও তারা-রা,
তাপমান যন্ত্র মোর চঞ্চল হয়নি আজও পারদ কণিকা,
নৃত্যপরা রশ্মি মোর স্পর্শ করেনি আজও সমুদ্রের বুক,
স্পর্শ করেনি আজও ভোরের রক্তাভা মোর পর্বত শিখর,
অস্তিত্বের আঁখি আজও পরিচিত নহে মোর কাছে;
কম্পিত তনুতে জাগি ভীত আমি সত্তার প্রকাশে!

প্রাচীর দিগন্ত হতে উঠে এল প্রভাতের রশ্মি যে আমার,
সঞ্চিত রাত্রির ঘন অন্ধকার সহজে সে করিল লুণ্ঠন,
একটি শিশির-বিন্দু ঠাঁই নিল পৃথিবীর; গোলাবের বুকে।'

[মূল: মুহাম্মদ ইকবাল, অনুবাদ: ফররুখ আহমদ]

'Footfalls echo in the memory
Down the passage
Which we did not take,
Towards the door
We never opened,
Into the rose garden.'

[T. S. Eliot, *Burnt Norton–Four Quartets*]

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ভূমিকা

আত্মজীবনী লেখার তাগাদা নিয়মিতই আসত অনেক সুহৃদ, স্নেহভাজন ও আপনজনদের কাছ থেকে। সেই সব অনুরোধ-উপরোধে সাড়া দিইনি অনেকদিন। আত্মজীবনী লেখার অধিকার তো সমাজের সেই সব উঁচুস্তরের মানুষের রয়েছে, যাদের কীর্তিময় জীবনের অতীত মুহূর্তগুলো অর্জন-অবদানের অফুরন্ত গৌরবে সমৃদ্ধ-সুশোভিত। কে আমি যে আত্মজীবনী লেখার দুঃসাহস করব? কে পড়বে এই অজানা, অখ্যাত, সম্পূর্ণ অনুল্লেখযোগ্য মানুষের আত্মজীবনী?

কিন্তু শুধু আমি তো নই, মানুষমাত্রই তো অচেনা এক জীবের নাম। অপরিচিতির আড়াল থেকে তার জীবনের যাত্রা শুরু। যেমন— কোরআনে কারিম তার সেই মহিমান্বিত বাচনভঙ্গিতে ঘোষণা করে:

> হাল আতা আলাল ইনসানে হিনুম মিনাদ দাহারে লাম ইয়াকুন শাইআম মাজকুরা?

'মহাকালের সময় পরিক্রমায় এমন একটা ক্ষণ কি মানুষের জীবনে পার হয়ে যায়নি, যখন তার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না?' (আদ দাহর : ১)

পৃথিবীর বুকে প্রথমবার পা ফেলার আগে মানবশিশুর তো কোনো নাম পর্যন্ত ছিল না। তারপর শুরু হয় তার পথচলা, পরিচিত হতে শুরু করে সে চারপাশের মানুষের সঙ্গে। জীবনপথের প্রতি বাঁকে মুখোমুখি হয় সে প্রকৃতির অন্তহীন রূপশোভার। কোথাও-বা রেখে যায়— ছোট হোক কিংবা বড়— এক-আধটা কীর্তিচিহ্ন, তার জীবনের সঞ্চয়। কবি ইকবালের ভাষায় প্রাচীর দিগন্ত থেকে উঠে আসে তার প্রভাতের রশ্মি— সেই আলোর রশ্মিতে আকাশে তারারা জাগুক বা না জাগুক, ছোট্ট একটা শিশিরবিন্দুর মতো ঠাঁই করে নেয় সে পৃথিবীর গোলাবের বুকে। আমার জীবনটাও তাই। প্রভাতের আলোর রশ্মি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ক্রমেই তাপমান হয়ে শুকিয়ে দেবে একদিন ক্ষুদ্র সেই শিশিরকণা। কিন্তু তার আগে সেই ক্ষণস্থায়ী শিশিরবিন্দুটা তার জীবনের দু-চারটা স্মৃতিকথা অনাগতজনদের সামনে পেশ করে যেতে দোষ কী?

তাই প্রথম লিখতে শুরু করলাম আজ থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে, বিংশ শতাব্দীর বিদায়ি বছরগুলোতে। তখন কাজ করতাম ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। লেস্টার শহরের বাইরে মার্কফিল্ড গ্রামের চোখ জুড়ানো পরিবেশে ফাউন্ডেশনের সুবিশাল ক্যাম্পাস। পাঠক-গবেষকদের শিল্পকর্মের উপযোগী এক মনোরম তপোবন। যেখানে লেখক যে নয় তার মনেও জাগে লেখার এক দুর্বার আগ্রহ। তাই শুরু করলাম লিখে যেতে জীবনের কিছু অতি সাধারণ স্মৃতিকথা। বাংলাতেই লিখতে সাব্যস্ত করলাম, আমার কলম বাংলায় যেমন উচ্ছল-গতিশীল হয়ে উঠবে, ইংরেজি ভাষায় আনবে না সেই প্রাণের স্ফুরণ।

মহা-উৎসাহে শিগ্‌গিরই লিখে শেষ করলাম ফুলস্কেপ সাইজের ২০০ পাতার একটা খাতা। তারপর প্রায় পনেরো-ষোলো বছর আর কলম ধরিনি, বিতর্কিত বিষয়গুলো— বিশেষ করে ১৯৭১-এর বর্ণনা কেমন করে দিই— সেই ভাবনায়। আমার সাংবাদিকজীবনেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি, বস্তুনিরপেক্ষ বর্ণনা আহত করে উভয় পক্ষকেই। আর কাছের মানুষদের আহত করতে তো সহজে মন চায় না। অনেক বন্ধু-সুহৃদ যখন আত্মজীবনী লেখার তাগাদা দিতেন, তখন আত্মরক্ষার অজুহাতে তাদের হাতে খাতাটা তুলে দিয়ে বলতাম, লিখতে শুরু তো করেছিলাম, কিন্তু এখন আর লিখি না। অভিভূত হয়ে এক বৈঠকেই পড়ে শেষ করতেন অনেকে, তারপর মৃদু চাপ দিতেন আবার লিখতে শুরু করতে। কিন্তু সেই চাপ আর মৃদু থাকল না, যখন কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে স্নেহাস্পদ ড. ফয়সল তারেক লন্ডনে এসে হাজির হলো। সে একরকম বাধ্য করল আবারও লেখা শুরু করতে। ইতোমধ্যে লেখা অংশগুলো কপি করে বাংলাদেশে থেকে টাইপ করিয়ে আনল সে। অন্য সহকর্মী আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি জাদুকর কামাল শিকদার আমার কম্পিউটারে এবং ফোনে ডিকটেশন অ্যাপ ইনস্টল করে দিলো, যাতে কলম হাতে নেওয়া ছাড়াই অনায়াসে রচনার কাজ এগিয়ে যেতে পারে। ফাঁকি দেওয়ার আর কোনো উপায় রইল না। ঠিক করলাম, সত্যনির্ভর, বস্তুনিরপেক্ষ হবে আমার রচনার উপাদান, তবে যথাসম্ভব কাউকে আহত করার প্রবণতা এড়িয়ে।

আত্মজীবনী যদিও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণমাত্র, কিন্তু তা সমসাময়িক সমাজ ও জীবন, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক মুল্যবান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

খতিয়ানও বটে। তাই চেষ্টা করেছি ছোট হোক কি বড়, আমার জীবনের সব অভিজ্ঞতা সযত্নে পরিবেশন করে যেতে। এঁকে যেতে চেয়েছি মৌসুমি বাংলার অপরূপ প্রাণমাতানো ছবি। আর সেই সঙ্গে ছড়াগান, শ্লোক-স্লোগান, হাসিকান্না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপসহ পারিপার্শ্বিক সময়ের সাক্ষী কোনো কিছুকেই অবহেলা করে এড়িয়ে যাইনি। এতে অবশ্য আমার দীর্ঘকালীন স্মৃতি বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। অবাক হয়ে ভেবেছি, এত কিছু মনে রাখলাম কেমন করে? আব্বার কাছে শোনা আমার জন্মের আগেকার রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু খণ্ডচিত্র এতে রয়েছে, তবে তার চেয়েও বেশি রয়েছে আমার সরাসরি অর্জিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ-বিশ্লেষণ। নিতান্তই আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে করা এসব বিশ্লেষণের সঙ্গে সবাইকে একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সাহস করতে চেয়েছি আমাদের বর্তমান জোর করে চাপানো একদেশদর্শী রাজনৈতিক বয়ানটা ভিন্ন এক কোণ থেকে বিবেচনা করে দেখার।

আত্মজীবনী লেখার, অন্তত এভাবে হৃদয় নিংড়ে ফেলে আসা বাংলাদেশের রূপশোভার বর্ণনা দিয়ে লেখার পেছনে লুকিয়ে আছে ঘরমুখো বাঙালির দেশে ফেরার এক অব্যক্ত আকুতি। আমার এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা পড়ে এক সাহিত্যামোদী সাংবাদিক বন্ধু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফোন করলেন, জানতে চাইলেন এমন সুন্দর সাবলীল বাংলা থেকে জাতিকে কেন আমি এতকাল বঞ্চিত করে রাখলাম। কৈফিয়ত দিলাম, আমি তো নই, বঞ্চিত করেছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের এক হিংসা ও মিথ্যা অপবাদের রাজনীতি। আমার অবস্থার সঙ্গে অকারণে দেশান্তরিত মহাকবি দান্তের (Dante) অবস্থার কী অপূর্ব সাদৃশ্য!

রাজনৈতিক জিঘাংসা-প্রতিহিংসার বর্বরতা শুধু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একচ্ছত্র গৌরব নয়। বহু যুগ আগে ইটালির ফ্লরেন্সে বিজয়ী দল একইভাবে পরাজিত দলকে নির্যাতন ও নির্বাসন করত। দান্তের (Dante) পোপবিরোধী 'সাদা-গুয়েল্পরা' ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পোপপন্থি 'কালো-গুয়েল্পদের' দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিল। দুই বছর পর ক্ষমতা দখল করে কালো-গুয়েল্পরা একইভাবে দেশছাড়া করেছিল সাদা-গুয়েল্পদের। এ সময় দান্তে রোমে অষ্টম বলিফিসের দরবারে দূত হিসেবে থাকায় তাকে দুর্নীতির অভিযোগে গরহাজির (in-absentia) হিসেবে বিচার করে বিপুল জরিমানা ও নির্বাসনের দণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানা পরিশোধ করার কোনো উপায় দান্তের ছিল না, কারণ কালো দল তার সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি আগেই বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছিল। কিছুদিন পর ফ্লরেনটিনরা তার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নির্বাসন ও দেশে ফিরে এলে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তাকে অগ্নিকুণ্ডে জ্বালিয়ে মারার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অনেকটা বাংলাদেশের কুখ্যাত আইসিটির রায়ের মতো আরকি।

কবি দান্তের (Dante) বিখ্যাত Commedia-এর একাংশে তার নির্বাসিত জীবনের সকরুণ দীর্ঘশ্বাস গাঁথা রয়েছে—

'দেশান্তর করে রেখেছে আমাকে
যে দারুণ বর্বর নিষ্ঠুরতা,
আকাশ পৃথিবীর ছোঁয়ায় ধন্য
আমার এ পবিত্র কবিতা
সকল বাধা অতিক্রম করে
আমন্ত্রণ করবে কি
আমাকে আবার ফিরে যেতে
সেই মেষপালের দেশে
যেখানে পরম প্রশান্তিতে ঘুমাতাম
ছোট্ট মেষশাবকের মতো
কবির গৌরবে আবার ফিরব কি
সেই দেশে, একদিন অবশেষে।'

তারপর আসা যাক নামকরণের প্রসঙ্গে। শিরোনাম নিয়ে শিরঃপীড়াও কম যায়নি। প্রথম খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম একটা নাম— 'জীবনের নীল দিগন্তে'। বহুদিন পর্যন্ত এটাই নাম দেবো ভাবতাম। নিচে দ্বিতীয় শিরোনাম *আত্মজীবনী* যোগ করে। কিন্তু মত পাল্টালাম T.S Eliot-এর একছত্র কবিতা 'Footfalls echo in the memory' পড়ে ভাবলাম চমৎকার নাম পেয়ে গেছি, নাম দেবো 'পদধ্বনির প্রতিধ্বনি'। তারপর ইকবালের কয়েকটা পঙ্‌ক্তি আরও বেশি সংগতিপূর্ণ মনে হলো, কবিতাটা শুরুতে যোগ করা হলো, যার শেষ ছত্রটি 'একটি শিশিরবিন্দু ঠাঁই নিল পৃথিবীর; গোলাবের বুকে'। তাই নাম ঠিক করলাম, 'পৃথিবীর গোলাবের বুকে'। তবে সবাই এটা পছন্দ করবেন এমন কথা নেই।

আমার এই একান্ত ব্যক্তিগত রচনা কত সহৃদয়, শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগ্রহ, অনুরোধ, উৎসাহ, এমনকি সরাসরি চাপপ্রয়োগের ফসল, তার পুর্ণ ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যাবে না। এখানে শুধু সীমিত কয়েকজনকেই উল্লেখ করছি— ফয়সল তারেক, ফাহাম আব্দুস সালাম, কামাল শিকদার, মোজাম্মেল হোসেন তুহিন, ফরিদ আহমদ রেজা, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, শাহনাওয়াজ আলী,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আব্দুদ দাইয়ান ইউনুস, মীর মাসুম আলী, আব্দুল্লাহ নাজিব, ফারুক আমিন এবং আমার পরিবারের সদস্যরা। যাদের নাম নিয়ে ধন্যবাদ দেওয়াটাও শুধু অপরিপূর্ণ, আংশিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার হবে। আজীবন চিরকৃতজ্ঞ থাকলেও তাদের কাছে আমার ঋণ পরিশোধ হবে না।

এই প্রথম খণ্ডে শুধু আমার জীবনের এক-তৃতীয়াংশের— প্রথম পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্মৃতিচারণ পরিবেশন করলাম। বাকি দুই-তৃতীয়াংশে রয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে আমার আগন্তুক-পথচারী জীবনের আরও বহু বর্ণাঢ্য, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার খতিয়ান। প্রথম খণ্ড পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে কোনো একদিন খোদা চাহে তো দ্বিতীয় খণ্ড উপহার দেওয়ার ইচ্ছে রইল।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এক

ঝিলটার স্বচ্ছ-সজল পানি সকালবেলার রোদে ঝিলমিল করে চমকাচ্ছে। চৈত্র মাস, তাই বাংলাদেশে এখন বসন্তকাল— শীতের হিমেল হাওয়া ও গ্রীষ্মের উত্তাপের মাঝখানে পালাবদলের ঋতু। সকালের রোদে তীব্রতা নেই, একটা সতেজ সুন্দর আমেজ ব্যস্ত নগরীর মাঝখানে এই মনোরম আবাসিক এলাকাটাকে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে রেখেছে। জন মিল্টন বলেছেন, মর্নিং শোজ দি ডে— দিনটা কেমন হবে সকাল দিয়েই তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই সুন্দর সকালে বোঝার কি কোনো কায়দা ছিল যে, এই দিন বাংলাদেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনবে এক অকল্পনীয় পরিবর্তন। রাস্তার মাঝামাঝি একটা ভিলার সামনে এসে আমার রিকশাটা থামল। দরজায় মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে একজন কাজের লোক খুলে দিলো। বাড়িটা বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল।

গেটের ভেতরে সবুজ ঘাসের সুন্দর লন। তারপর দোতলা বাড়িটা। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা টয়োটা গাড়ি। সামনের ফ্ল্যাগ পোস্টে ছোট্ট একটা লাল-সবুজ পতাকা। লনের ওপরে পাতা একসারি ফোল্ডিং চেয়ার। অন্য কেউ নেই, তাই আমি গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম।

আগের রাতে কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরোনোর সময় চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহ ভাই বললেন, 'কাল সকালে তোমার ডিউটি শেখ সাহেবের বাড়িতে, পুরো সকালটা সেখানেই থাকবে।' আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম— শেখ মুজিব তো তখন বাড়িতে থাকবেন না, তিনি থাকবেন প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায়। খালি বাড়িতে আমি করব কী? তবে বললাম না কিছুই। চাকরি তো!— কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন।

শেখ সাহেবের গাড়ি ড্রাইভওয়েতে দেখে একটু সন্দেহের মধ্যে পড়লাম। তবে কি তিনি প্রেসিডেন্ট হাউজে যাননি? একা একা বসে আছি, তাই সাম্প্রতিক

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রাজনীতি এবং দেশের জটিল অবস্থা সম্পর্কে নানা ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মার্চ মাসের এই চব্বিশটা দিন যেন পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের জীবনের চাইতেও ছিল অধিক ঘটনাবহুল। সিনেমার রিলের মতো একটির পর একটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ১ মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংসদ মুলতবি করার ঘোষণা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কী যে হয়ে গেল, আর কী যে হবে— কল্পনা পর্যন্ত করা যাচ্ছিল না। কে জানে কী আছে এই দুর্ভাগা দেশটার নসিবে?

কতক্ষণ ভাবছিলাম মনে নেই। সংবিৎ ফিরে এলো যখন দেখলাম শেখ সাহেব বেরিয়ে আসছেন তার চিরাচরিত পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। ঝাঁকড়া চুল ও মোটা গোঁফ মিলিয়ে অপূর্ব লাগছিল শেখ মুজিবকে। হাতে ট্রেডমার্ক পাইপটা নিয়ে শেখ সাহেব এসে সোজা আমার পাশেই বসে পড়লেন, সালাম দিয়ে সম্ভ্রমসহকারে নড়েচড়ে বসলাম, মৃদু হেসে শেখ সাহেব বললেন, ‘চৌধুরী! তুমি তো দেখি সাতসকালেই এসে গেছ।’ তারপর কথাবার্তা শুরু হলো, শেখ সাহেব বললেন, তিনি আজ প্রেসিডেন্ট হাউজে যাননি, তবে তার উপদেষ্টারা গেছেন। তিনি বললেন, ‘আলোচনা প্রায় ভেঙে গেছে, আমরা তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছি। আজকের বৈঠক শুধু এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার জন্যই।’ বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এর পরিণতি কী হবে মনে করেন? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শেখ সাহেব বললেন, ‘এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই, আল্লাহই ভালো জানেন।’ সম্ভবত আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা জানেন বলেই শেখ সাহেব স্নেহের সুরে বললেন, ‘দেখো, তুমি তো জানো আমি পাকিস্তান ভাঙতে চাইনি।’ বললাম, তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার গাড়ির ওপর ওটা কী? ফ্ল্যাগ পোস্টে পতাকাটার দিকে তাকিয়ে অনেকটা অপ্রস্তুত সুরে তিনি বললেন, ‘আর বোলো না, ছেলেরা জোর করে লাগিয়ে দিয়েছে।’ বললাম, ছেলেরা নেতা না আপনি নেতা, তারা জোর করে লাগিয়ে দিলো আর ওটা উড়িয়ে আপনি গত কদিন ধরে প্রেসিডেন্ট হাউজে যাচ্ছেন, ইয়াহিয়া বুঝি বিশ্বাস করবে যে আপনি পাকিস্তান ভাঙতে চান না!

অনেকটা ছেলেমানুষি অভিমানের সুরে তিনি বললেন, ‘পশ্চিমারা বাঙালির অধিকার দিতে চায় না, তা না হলে তারা পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে দিলো কেন? সমস্ত গন্ডগোল তো সেখান থেকেই শুরু হয়েছে।’ বললাম, তা তো অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু তারা তো পরে ইসলামাবাদে অধিবেশন ডাকল, আপনি গেলেই পারতেন। মুজিব বললেন, ‘কেন যাব আমি পশ্চিম পাকিস্তানে?’ জবাবে বললাম, কেন যাবেন না? সেটাও তো আপনার দেশ; আপনি কি শুধু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অর্ধেক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন? শেখ বললেন, 'হবেটা কী গিয়ে? ওখানে তো আমার কোনো এমপি নাই।' বললাম, নাইবা থাকল, আপনি আপনার সব এমপিকে নিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গিয়ে উঠতেন, তাহলেই দেখতেন পশ্চিম পাকিস্তানি এমপিদের অর্ধেক হোটেলে এসে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে লাইন লাগাত। আশ্চর্য হয়ে শেখ সাহেব বললেন, 'কেন তারা আমার সঙ্গে যোগ দিতে যাবে!' আমি বললাম, আপনার সঙ্গে যোগ না দিলে তারা ক্ষমতার অংশ কেমন করে পাবে? সরকার গঠন করবেন আপনি আর ভুট্টোর সঙ্গে থাকলে তারা কি মন্ত্রী হতে পারবে? পশ্চিম পাকিস্তানিদের চরিত্র তো আপনার জানা আছে, নিজের স্বার্থের জন্য তারা ভুট্টো বা পিপলস পার্টির তোয়াক্কাও করত না। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেখ বললেন, 'তোমার কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু আমার লোকদের তো বোঝাতে পারলাম না।'

একটু পরে একজন-দুজন করে দলের মাঝারি মাপের নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করলেন। শেখ সাহেব তাদের নিয়ে ঘরের ড্রইংরুমের দিকে গেলেন। আমাকে বললেন, তুমিও আসো আমাদের সঙ্গে। সেখানে শুরু হলো আওয়ামী কায়দায় জোরগলায় লম্ফঝম্ফের রাজনীতি, বিশেষ করে অন্যান্য বিরোধীদল ও সংবাদপত্রগুলোর তুলাধুনা সমালোচনা। এদের অনেকেই আমাকে চেনে না, তাই আমার দাড়ি দেখে সম্ভবত আমাকে *দৈনিক সংগ্রাম*-এর রিপোর্টার মনে করছিল কি না, কে জানে! হঠাৎ করে তাদের সমস্ত উষ্মা গিয়ে পড়ল ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবস সংখ্যায় পাকিস্তানের খোদা হাফেজ শিরোনামে লেখা *সংগ্রাম*-এর সম্পাদকীয়টার ওপর। একচোট নিতে কেউ ছাড়ল না, যেন রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল— কে কত কঠোর কঠিন হতে পারে। *সংগ্রাম*-এর সম্পাদক আখতার ফারুক সাহেবের নাম নিয়ে এক রকমের গালিগালাজও শুরু হলো। এক-আধজন তো আখতার ফারুককে কীভাবে পিটাই করা হবে তার পরিকল্পনা শুরু করে দিলো। এ সময় শেখ সাহেব হয় তার কর্মীদের শাসাতে অথবা কিছু দলীয় আলোচনা করতে চাইলেন। আমাকে বললেন, 'তুমি পিছনে আমার রিডিং রুমটায় গিয়ে একটু বসো।' ড্রইংরুমের পেছনে একটা ছোট্ট লম্বা রুম। সেখানে আগেও একবার শেখ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা মাঝারি গোছের সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও রিভলভিং অফিস চেয়ার। পাশের দেওয়ালে একটা সাদামাটা সোফা, তার উল্টোদিকে ছোট বুকশেলফে বেশ কিছু বই-পুস্তক। মনে আছে, এর আগেরবার যখন এ কামরায় শেখ সাহেবকে ইন্টারভিউ করতে এসেছিলাম, সেদিন কথাবার্তা শেষ করে বের হওয়ার সময়

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

শেখ সাহেব বললেন, 'তুমি মনে করো না যে আমি তোমাদের বইপত্র পড়ি না।' এই বলে বুকশেলফ থেকে একটা বই বের করে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম ইংরেজি বই, মাওলানা মওদূদীর *ইসলামিক ল অ্যান্ড কনস্টিটিউশন*। মনে মনে পুলকিত হলাম, তাহলে মুজিব মাওলানার বইও কেনেন। কিন্তু মলাট উল্টে দেখতেই ভুল ভাঙল, প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা— টু মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড শেখ মুজিব, নিচে দস্তখত গোলাম আযম। যেতে যেতে ভাবলাম, বই তো রেখেছেন বটে, কিন্তু পড়েছেন কি না, কে জানে!

এমন সময় বাইরের রাস্তা থেকে মুহুর্মুহু স্লোগানের আওয়াজ আসতে লাগল। বেলা তখন দুপুর ১টা। কামরা থেকে বের হয়ে গেটের দিকে গেলাম ব্যাপারটা কী দেখার জন্য। দেখলাম প্লাকার্ড, পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে একটা মস্ত বড় মিছিল শেখ সাহেবের গেটের সামনে এসে পৌঁছেছে। আদমজী শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল। শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন, গেটের ভেতরে একটা ফোল্ডিং চেয়ার রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি মেগাফোন দিয়ে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। চেয়ারটার সঙ্গে পা দিয়ে আমি আমার ছোট খাতাটায় নোট নিচ্ছিলাম। চিরাচরিত নিয়মে মুজিবের আগুনঝরা বক্তৃতা। বললেন, 'এবার বাঙালি জেগে উঠেছে, আমাদের আর দমিয়ে রাখা যাবে না, বাংলার মানুষ এবার তাদের অধিকার আদায় করেই ছাড়বে। কোনো ছুতানাতা, কোনো টালবাহানা চলবে না। আমাদের এবারের সংগ্রাম অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ার সংগ্রাম।' ভাবছিলাম, মুজিব কি জেনে-বুঝেই পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করলেন? কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হলো না, চেয়ার থেকে নেমেই তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'চৌধুরী! তোমার নোটটা কোথায়?' খাতাটা বাড়িয়ে দিতেই আমার হাত থেকে কলম নিয়ে তিনি একটা শব্দ কেটে দিলেন— শব্দটা পাকিস্তান। বললেন, দেশ লেখো দেশ আর তোমার কলিগদেরও বলে দাও।

মিছিলটা চলে যাওয়ার পর আবার সাধারণ অবস্থা ফিরে এলো। কিছু কিছু নেতাকর্মী বিদায় হলেন আর বাকিদের নিয়ে শেখ সাহেব আবারও ড্রইংরুমের দিকে গেলেন। ভাবলাম, এখন তো আর কোনো কাজ নেই, তাহলে আমি বিদায় হই না কেন? গেটের কাছে ফিরে আসতেই দেখলাম দূর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন নিখিল পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মিনহাজ বার্ণা। আমাকে বললেন, 'শেখ সাহেব কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।' ড্রইংরুমে ঢুকতেই বার্ণা অনর্গল বলে চললেন— ভুট্টো এইমাত্র প্রেস

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কনফারেন্স শেষ করেছেন, আলোচনা ভেঙে গেছে, সমাধানের আর কোনো আশা নেই। বার্ণা আরও বললেন, ভুট্টো ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতোমধ্যে ফিরে যাচ্ছেন, পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। শেখ সাহেব বার্ণাকে নিয়ে আবার রিডিং রুমে ঢুকলেন, অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আর কেউ ভুট্টোর প্রেস কনফারেন্সে ছিলে কি না। আমরা না সূচক জবাব দিতেই শেখ সাহেব বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে সাধারণভাবে হাঁক দিলেন— মুসাকে ডাকো, এ বি এম মুসা। বুঝলাম, আমাদের আস্তাবলের অন্য পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক মুসা ভাই মুজিবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, জটিল ব্যাপারে তিনি মুসার পরামর্শকে মূল্য দেন। অল্পক্ষণ পরেই মুসা ভাই এসে হাজির হলেন, শেখ সাহেব মুসার হাত ধরে রিডিং রুমে গিয়ে ঢুকলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাও এসে হাজির হলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে শেখ সাহেব বললেন, 'এখন আর কিছু হবে না, যা বলবার বিকেলেই বলব, বিকেলে আবার আসবে।'

আমরা বিদায় নিলাম, বেবিট্যাক্সিতে করে পুরানা পল্টনে আমার বাসার দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিলাম, ২৫ মার্চের বিকেলটা দেশ ও জাতির জন্য কী নিয়ে আসবে কে জানে! বাংলা পঞ্জিকার হিসাবে এই দিনের শেষে যে রাত আসবে, তা হবে গাঢ় অন্ধকারে ঘেরা অমাবস্যার রজনি। কে জানে এ দেশের কপাল থেকে সেই কালো অমানিশার অবসান কবে হবে? সুদীর্ঘ ৫০ বছর পরে দূর প্রবাসে বসে সেদিনের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনছি আর জীবনের হালখাতা লিখছি।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দুই

ঘাসের ডগায় তখনো বাকি আছে দু-একটা শিশিরকণা, মেঘ-বৃষ্টিহীন উজ্জ্বল শরৎ সকালে সূর্যকিরণ পড়ে হীরকখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল চমকাচ্ছে। শতাব্দী-প্রাচীন বহড়াগাছের বিশাল শামিয়ানার তলায় সতেজ সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর শুয়ে বই পড়ার প্রচুর শখ ছিল আমার।

শুক্রবার, তাই স্কুলে যাওয়ার তাগাদা নেই। নিত্য রোজের গৎবাঁধা রুটিন সেরে মাঝ সকালে এসে আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে শুয়ে পড়লাম সূর্যমুখী হয়ে। হাতের খোলা বইটা চোখের ওপর ছায়া জোগাল। চমৎকার বই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'উৎকর্ণ'। প্রতিভাবান লেখকের জাদু স্পর্শে সাদামাটা ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। খরস্রোতা নদী, অন্তহীন সমুদ্র, সবুজ-শ্যামল ঘনবন-অরণ্য-পর্বতসহ অপরিচিত জগতের অজানা বিস্ময় আমার কিশোর মনে জাগাত উচ্ছল শিহরণ। গল্প-উপন্যাসের পাগল ছিলাম আমি। কিন্তু হৃদয় দিয়ে লেখা ভ্রমণকাহিনির প্রতি আকর্ষণ ছিল আরও তীব্র, আরও দুর্বার। হয়তো আগামী অশ্রান্ত যাযাবর জীবনের প্রথম প্রতিশ্রুতি।

বহড়া-বাদামের বিশাল সেই বৃক্ষ আমার গ্রামের বাড়ির নিশানবরদার হয়ে আছে পুরুষ-পুরুষান্তর থেকে। ছোট ফেনী নদী যখন চলাচলের প্রধান রাজপথ ছিল, তখন নৌকার আরোহীরা গাছটা দেখেই চৌধুরীবাড়ি শনাক্ত করত।

আমার গ্রামের বাড়ির আর দশটা জিনিসের মতো এই গাছেরও রয়েছে একটা ইতিহাস। আব্বার মুখে শুনেছি, এর নিচে কবর দেওয়া হয়েছিল মাওলানা ইমামুদ্দিন সাহেবের কন্যাকে। এই বাড়ির পুত্রবধূ ছিলেন তিনি। ধনৈশ্বর্যের প্রথম জোয়ারের মুহূর্তে বাড়ির তৎকালীন জমিদারপুত্র মনোয়ার আলী চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। মাওলানা ইমামুদ্দিন সাহেবের বাড়ি সদর এলাকার সাদুল্লাপুরে। প্রথম কৈশোরেই সাইয়েদ আহমদ বেরলভি শহিদের জিহাদ আন্দোলনে যোগ দিয়ে দূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি জমান তিনি। অশ্রুতে ভেসে ভেসে বিধবা মা প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন একমাত্র পুত্রের প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু পুত্র তো আর এলো না ফিরে। যুবক ইমামুদ্দিন তখন জ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভির জিহাদ আন্দোলনের প্রথম সারির সিপাহি। দখলদার ইংরেজকে ভারতছাড়া করার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আপসহীন সংগ্রামের অকুতোভয় সিপাহসালার। জিহাদের রঙিন নেশায় বুঁদ নওজোয়ানের মনের পর্দায় ঝাপসা হয়ে যায় গৃহ, স্বজনের স্মৃতি।

স্বপ্নভঙ্গ হলো বালাকোটের পরাজয়ের পর। সৈয়দ আহমদ বেরলভির শাহাদাতের খবরে ভগ্নহৃদয় মুজাহিদরা ফিরে যান যার যার পথে। একরাতে ঘরে ফিরে আসেন ইমামুদ্দিন। ততদিনে কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন বৃদ্ধ মা। সেই রাতে দরজা খোলার আওয়াজে সচকিত হয়ে ওঠেন।

: কে?

: আমি ইমাম।

: ইমাম। বাপ আমার— আর্তনাদ করে ওঠেন মা।

: বেঁচে আছিস তুই?

: হ্যাঁ আম্মা।

তারপর শুরু হলো নতুন জীবন। জিহাদের সেনাপতির তরবারি ভেঙে তৈরি হলো গৃহস্থের লাঙল ফলক। সংসারত্যাগী নতুন করে করলেন সংসারের ভিত্তিপাত। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে গতানুগতিক সংসারজীবনের মোহময় শেকলে বাঁধা পড়ে থাকার লোক নন মাওলানা ইমামুদ্দিন। হাজারো কুসংস্কারে ঘেরা মুসলিম সমাজ নিয়ে বিদেশি দখলদারদের থাবা থেকে দেশ স্বাধীন করা কেমন করে সম্ভব হবে! জং ধরা তরবারি দিয়ে আর যাই হোক, জিহাদকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেওয়া যায় না।

শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ময়লা-আবর্জনারাশি ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করে আসল ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন তিনি সমাজকে। শুরু হলো দাওয়াতে দ্বীনের গণসংযোগ অভিযান।

এই দাওয়াতের পথ ধরেই তিনি আমাদের পরিবারের প্রতাপশালী জমিদার কাবিল চৌধুরীর আধ্যাত্মিক শিক্ষক-মুর্শিদে পরিণত হন। আমাদের বাড়িতে অবস্থান করে চারপাশের গ্রামগঞ্জে ইসলামের ডাক দিয়ে যেতেন তিনি। কবরপূজা, যৌতুক প্রথা, আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ, অযথা তালাক, পরিবারে কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখা থেকে শুরু করে নামাজ, রোযা, যাকাত আদায়সহ অন্যান্য ফারায়েজ যথাযথভাবে আদায় করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আহ্বান জানাতেন। শুধু ওয়াজ মাহফিল বা জুমার খুতবায় নয়, বরং অত্যন্ত দরদি ও প্রগতিবাদী পদক্ষেপ নিতেন তিনি। লোকশ্রুতি আছে, সকালবেলায় কাদাপানি ভরা জমিতে লাঙল চালানোয় রত

www.nagorikpathagar.org CamScanner

চাষির পেছনে পেছনে হেঁটে তাকে বোঝাতে থাকতেন মাওলানা ইমামুদ্দিন। বলতেন, 'মালকোঁচাটা খুলে সতর ঢাকো ভাই— খোদার হুকুম ভঙ্গ হচ্ছে।' রুক্ষ্ম মেজাজি চাষি কখনো বিরক্ত হয়ে গরু খেদানোর কঞ্চি দিয়ে সপাং করে চাবুক মারত মাওলানার পিঠে। তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে আলের দিকে ছুটে যেতেন তিনি। চাষির ডাবা হুঁকোটায় তামাক ছড়িয়ে আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আবার ছুটে আসতেন তার কাছে। বলতেন, 'এই নাও ভাই, রাগ কোরো না— এবার আমার কথাটা শোন।' নিরুপায় চাষি হাল ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেলত নাছোড়বান্দা মাওলানার কারবার দেখে। সার্থক দাওয়াতের অনাবিল স্বাদে উল্লসিত হতেন মাওলানা।

একদিন আসরের নামাজ বাদে কাছারিঘরের সামনে দুটো চেয়ারে বসে আছেন জমিদার কাবিল চৌধুরী ও তার পির মাওলানা ইমামুদ্দিন। দুজনেরই চোখ পাশের সদ্য নির্মিত পাকা মসজিদের বারান্দায় তন্ময় চিত্তে নামাজে রত সুপুরুষ যুবক মনোয়ার আলী চৌধুরীর ওপর। আল্লাহর শোকরে অশ্রুসজল হয়ে এলো কাবিল চৌধুরীর দু-চোখ।

: চৌধুরী সাহেব!
  হঠাৎ মাওলানার ডাকে প্রকৃতিস্থ হলেন চৌধুরী— জি বলুন।
: একটা আবদার করতে চাই, অসম্ভব হলে মনে কিছু নেবেন না— বললেন মাওলানা।
: কী যে বলেন, হুজুরকে অদেয় আমার কী থাকতে পারে! জবাবে মাওলানা বললেন, আপনার এই বড় ছেলেটাকে চাই আমার মেয়ের জন্য। বড্ড নেক ছেলে আপনার।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন কাবিল চৌধুরী। মনে মনে তিনিও ঠিক তা-ই চাইছিলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বিয়ে হয়ে গেল।

প্রথম পরিণয়ের মধুময় দিনগুলোতে যে জিনিসের দিকে কেউ নজর দিলো না, তা হলো 'সমতা', ইসলাম যাকে বর্ণনা করেছে 'কুফু' বলে। মধুচন্দ্রিমার প্রথম আমেজ কেটে যাওয়ার পর দীর্ঘমেয়াদি জীবনের পথযাত্রা আত্মম্ভরি জমিদারতনয় ও কৃচ্ছ্রসাধক পির দুহিতার জন্য কতটা সহজ হবে?

সেদিন চৌধুরীবাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে। দীর্ঘ ছয় মাস কলকাতা হাইকোর্টে জমিদারিসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করে দেশে ফিরে এসেছেন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নবীন জমিদার মনোয়ার আলী। মেয়ে-জামাতাকে দেখতে এসেছেন মাওলানা ইমামুদ্দিন। কাছারিঘরে অপেক্ষমাণ কর্মচারী ও প্রজাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে অন্দরমহলে এলেন মনোয়ার আলী। অভিমানভরে যুবতী স্ত্রী অভিযোগ করলেন: এতকাল বিদেশে পড়ে থাকলে কি চলে?

অহংকারভরে জবাব দেন মনোয়ার: ফকিরের পুত্র ঘর ধরে বসে থাকলে পারে, জমিদারের ছেলে পারে না।

অঝোরে কাঁদলেন পিরকন্যা। এমন সময় ভেতরে এলেন মাওলানা। পিতাকে দেখে চোখমুখ মুছে প্রকৃতিস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেন মেয়ে। কিন্তু মাওলানার চোখ ফাঁকি দেওয়া গেল না।

: কি গো মা, কাঁদছ কেন?

: কই না তো, কাঁদছি না।

: হুম! ভুল আমারই হয়েছে। বলে আবার বাহির বাড়িতে গেলেন মাওলানা। মুহূর্ত পরে অন্দরমহলে উঠল কান্নার রোল। মনোয়ার আলী চৌধুরীর স্ত্রী, মাওলানার কন্যা ইন্তেকাল করেছেন। সেই মেয়ের কবর এই বহড়া-বাদামতলায়।

কোনো সন্তান চৌধুরীবাড়িকে উপহার দেওয়ার সময় পাননি তিনি। অথচ এই বাড়ির সব সন্তান যুগ যুগ ধরে তাকে মায়ের মর্যাদায় বরণ করে নিয়েছে। প্রথম শৈশবে যেসব শিক্ষা আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কোনো দীর্ঘ সফরে বাড়ি থেকে বেরোতে অথবা সফর শেষে ফিরে এলে প্রথম যে কাজ করতে হবে, তা হলো চৌধুরীবাড়ির সেই নিঃসন্তান পুত্রবধূর কবর জিয়ারত করা।

মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো। তেজোদীপ্ত শরতের রোদ দীর্ঘক্ষণ সহ্য করা গেল না। উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বাংলার ভাদ্র-আশ্বিনে প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভরপুর পূর্ণ যৌবনা। বিল, পুকুর আর ধানের জমি পানিতে কানায় কানায় ভরা, চারপাশের গাছপালায় বন্য সবুজের প্লাবন নেমেছে যেন। বহড়া-বাদামের গাছতলা থেকে ছোট ফেনীর তীর পর্যন্ত সোজা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উপভোগ করছি প্রকৃতির অপূর্ব শোভা, আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল সারা মন। এই একটি সকাল— এই একটি দিনের সৌন্দর্য মুদ্রিত হয়ে থাকুক আমার হৃদয়ফলকে চিরকাল। ধন্য আমি জন্মেছি এই দেশে।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

তিন

আমার জন্ম কিন্তু হয়েছে অন্যত্র— এই গ্রামে নয়। শস্যশ্যামল শোভাময় এই গ্রামের পরিবর্তে যান্ত্রিক কোলাহলময় জনপদ কলকাতায়।

১৯৪৫ সাল প্রায় যবনিকার দিকে এসে পৌঁছেছে। নভেম্বরের শেষাংশের কলকাতায় নেমেছে প্রথম শীতের আমেজ। ২৭ নভেম্বরের সকালবেলায় খিদিরপুর এলাকায় পাইপ রোডের (এখন নাম দেওয়া হয়েছে ড. সুধীর বসু রোড) জামাল মঞ্জিলে জন্ম নিলাম আমি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মাত্র শেষ হলো। মনে আছে, কলেজজীবনে বন্ধুদের সঙ্গে রসিকতা করে বলতাম: আমি জন্মেছি মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটাতে।

পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলার ফেনীতে আমার গ্রামের বাড়ি। কলকাতায় জন্মানোর কারণ আমাদের পরিবার তখন কলকাতায় থাকত। আব্বা দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন। চৌধুরীবাড়ির ঐশ্বর্য তখন ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। দাদাজান হাবিবুর রহমান চৌধুরীর সরলতার সুযোগ নিয়ে অন্য আত্মীয়রা তাকে ঠকিয়ে জমিদারির বিভিন্ন তালুক বাগিয়ে নিতে দ্বিধা করেনি। দাদার ইন্তেকালের পর অস্তমান জমিদারির আয়ে আগেকার মান বজায় রেখে পরিবার পরিচালনা অসম্ভব দেখলেন আমার যুবক পিতা। দাদি আম্মা জাহিদা বেগম চৌধুরানীর আশ্বাসে-উৎসাহে আব্বা সাহস না হারিয়ে এগিয়ে গেছেন। দাদি আম্মা বলতেন, 'ভাবিস না, তোর আব্বা সম্পত্তি বেশি রেখে যেতে না পারলেও আমি তোর জন্য একটি সোনার মোহর মাটিতে গেড়ে রেখেছি। খোদা চাহে তো মরার আগে তোকে দিয়ে যাব।' কিন্তু খোদা আর তা চাননি। মৃত্যুর তিন দিন আগে দাদি আম্মা বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তবু ইশারা-ইঙ্গিতে আব্বাকে বারবার কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। আব্বা ঠিকই বুঝেছিলেন দাদি আম্মা সোনার মোহরের ঘটিটার দিকেই ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু সঠিক স্থানটি আব্বা কিছুতেই শনাক্ত করতে পারেননি। তা ছাড়া মুমূর্ষু মাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে হন্যে হয়ে মোহর খুঁজে বেড়ানোটাও তিনি অপ্রীতিকর মনে করেছেন। পরে বহু খোঁড়াখুঁড়ি করেও ঘটিটা আর মেলেনি। তাই চাকরি নিয়ে বিদেশযাত্রা।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কলকাতায় চাকরি নেওয়ার পর আব্বা বিয়ে করেন মুনশীর হাটের বসিকপুর গ্রামে। আম্মা দেলজাহান বেগম চৌধুরানী প্রথমে আমাদের গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। আমার বড় দুই ভাই চৌধুরী আফতাব উদ্দিন ও চৌধুরী কামাল উদ্দিন আর বড় বোন হুসনে আরা বেগম চৌধুরানীর জন্মের পর আব্বা সবাইকে কলকাতায় নিয়ে যান। আমার একমাত্র ফুফু তাহিরুন্নেসা চৌধুরানীর আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে লক্ষ্মণপুরে। বাড়িতে থেকে গেলেন শুধু আমার অবিবাহিত কাকা আকবর হোসেন চৌধুরী। বড় আপার পর আরও এক বোন জন্মেছিল— জাহানারা। কিন্তু অল্পদিনেই তার পৃথিবীর অধিবাস ফুরিয়ে যায়। সন্তানহারা মায়ের দুঃখ ঘোচানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে তখন এলাম আমি।

আব্বা তখন শৌখিন জীবনযাপন করতেন। ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি অথবা স্যুট পরে চলনে সৌম্যদর্শন জমিদারতনয়কে সত্যি অপূর্ব মানাত। এসব অবশ্য আমি পরে পারিবারিক অ্যালবামের ফটোতে দেখেছি। আম্মাও সুন্দর কাপড়-জামা আর অলংকারের ঢের লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আব্বা বলতেন, যশনমলের দোকানের নিয়মিত খদ্দের ছিলেন আম্মা। চাকরির আয়ের সঙ্গে যোগ হতো অবশিষ্ট জমিদারির আয়, দেশ থেকে কর্মচারীরা তা নিয়মিত পাঠাত কলকাতায়। গল্প-উপন্যাস পড়া, সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া, মাঝে মাঝে সবাইকে নিয়ে সার্কাস-মিউজিয়াম এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালসহ শহরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখতে বেরোনো এবং পিকনিকের শখ ছিল আব্বার। তিনি সিগারেটও খেতেন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো খারাপ অভ্যাস তার ছিল না। নামাজ-রোজা, কোরআন আর অজিফাপাঠ, তসবিহ-তাহলিলও ছিল তার নিত্যরোজের সূচি। এ ছাড়া অবশ্য ছিল মেহমানদারি। কলকাতায় আরও কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তারা বেড়াতে আসতেন নিয়মিত। আর যেকোনো উপলক্ষ্যে অজুহাত করে আয়োজন হতো দাওয়াতের পার্টির। এ ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা তদবিরাদির জন্য গ্রাম থেকে প্রায় প্রতিনিয়তই লোকেরা আসত। এদের সবার জন্যই ছিল আব্বার দুয়ার খোলা। আব্বার খালাতো ভাই মাওলানা হাবিবুল্লাহ ছিলেন কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক। তারা সপরিবারে অনেক সময় কাটাতেন আমাদের বাসায়। তার বড় ছেলে শহীদুল্লাহ কায়সার তখন তরুণ ছাত্র। তিনি ছিলেন আব্বার দারুণ ভক্ত। শুনেছি নিজের বাসা থেকে আমাদের বাসায়ই তার সময় কাটত বেশি। পরে ঢাকায়ও দেখেছি আব্বার প্রতি কায়সার ভাইয়ের সেই প্রচণ্ড সম্ভ্রমবোধ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পুরোই বজায় আছে। তাই তার জীবনাদর্শের সঙ্গে ভিন্নমত থাকলেও মানুষ হিসাবে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ছিল অটল।

স্বাধীনতা-পূর্ব কলকাতায় অন্য দিক ছিল অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন। সেদিনের সভা-মিছিল, সম্মেলন-সমাবেশে মুখর কলকাতার নেতৃবৃন্দের সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার বহু কাহিনি আমার কৈশোরে আব্বার মুখে শুনেছি। আলোর ঝলকের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেসব কাহিনি শুনে গর্বে ফুলে উঠত বুক। পরবর্তী জীবনে রাজনীতিতে আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে সেই সব প্রেরণাদায়ক কাহিনির প্রভাব কতটা ছিল, কে জানে।

কলকাতার রেড রোড ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য সীমিত ছিল। ভারতীয়দের সেই রাস্তা ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকাকালে একদিন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রেড রোডে প্রবেশ করেন। সান্ত্রীরা পথরোধ করে দাঁড়ায়। স্যার আশুতোষ গর্জে ওঠেন: 'আমি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, তোমার যদি সাধ্য থাকে থামাও আমার গাড়ি।' রেড রোড খুলে গেল।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী[১] থাকাকালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব নাকি দর্শনার্থীরা যাতে অযথা গল্প করে সময় নষ্ট করতে না পারে, সে জন্য তার অফিসরুমে অতিরিক্ত কোনো চেয়ার রাখতেন না। এক সকালে বরিশাল থেকে এক বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু বাইরের কামরায় তার ইংরেজ একান্ত সচিব পথ রোধ করে রাখলেন সারা সকাল। ধূলি-ধূসরিত লুঙ্গি-পাঞ্জাবি ও তালি দেওয়া জুতা পরা গ্রাম্য চাষি সাহেব পিএ'র ওপর কোনো প্রভাব রাখতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক। নাছোড়বান্দা বৃদ্ধও হার মানতে রাজি নন। হঠাৎ একসময় পিএ'র শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে চট করে ঢুকে পড়লেন শেরেবাংলার কামরায়। ছুটে এলেন ইংরেজ একান্ত সচিব অনধিকার প্রবেশকারী বৃদ্ধকে বের করে দিতে। কিন্তু এসে দেখেন প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই আলাপে লিপ্ত হয়ে গেছেন বৃদ্ধের সঙ্গে। বিরক্তি ও অবজ্ঞাভরে ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন সায়েব। ব্যাপারটা মুহূর্তে আঁচ করে ফেললেন হক সায়েব। পিএ'কে হুকুম দিলেন, 'নরমান! (নামটা বোধ হয় এ-ই ছিল) গেট এ চেয়ার ফর দ্য জেন্টেলম্যান, উইল ইউ?'

---

১. গভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫-এ প্রদেশগুলোর শীর্ষ মন্ত্রীর পদবি রাখা হয়েছিল 'প্রাইম মিনিস্টার'— প্রধানমন্ত্রী।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা, ব্রিটিশরা যাকে দ্য গ্রেট ক্যালকাটা রায়ট নামে বিখ্যাত করেছেন, তার অন্তর্নিহিত কারণ কী, তা নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। হিন্দুরা অবশ্যই ১৯৪৬-এর গ্রীষ্মে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতার কারণে মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণাকেই সরাসরি দায়ী করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আব্বার কাছে শোনা বর্ণনা ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিল দেখে বুঝেছি যে এই থিওরি মোটেই ধোপে টেকে না। গবেষক জনম মুখার্জির মতে, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের একটা অনিশ্চিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তারা দেখাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের মতো তারাও গণআন্দোলন করতে পারেন। মুসলিম লীগের ঘোষণায় হিংস্র কোনো পদক্ষেপের ডাক ছিল না এবং কলকাতা ছাড়া ভারতের সর্বত্র ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবস সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই পালিত হয়েছিল।' জনম মুখার্জি আরও লিখেছেন, 'মুসলমানরা ছিল কলকাতার জনসংখ্যার ২৫ ভাগ, এদের অধিকাংশই ছিল গরিব অভিবাসী। এটাই প্রমাণ করে যে দাঙ্গার জন্য মুসলমানরাই শুধু দায়ী— এই ব্যাখ্যা অসম্ভব। তা ছাড়া যদিও দাঙ্গার কোনো গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান নেই, তবু এটা এখন অনেকটা সর্বজনস্বীকৃত মত যে, এই হিংস্রতায় হিন্দুর চেয়েও মুসলমান নিহতের সংখ্যাই বেশি।'[২] তার এই দাবির দলিল হিসেবে জনম মুখার্জি পেশ করেছেন আরও দুটো মূল্যবান প্রমাণ। প্রথমে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের পেট্রিক লরেন্সকে লেখা মন্তব্যে তিনি বলেন, 'The present estimate is that appreciably more Muslims than Hindus were killed'; দ্বিতীয় উদ্ধৃতি স্ট্যানফোর্ড ক্রিপসকে অক্টোবর মাসে লেখা সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলের চিঠি, যাতে তিনি লিখেছিলেন, 'In Calcutta Hindus had the best of it' (জনম মুখার্জি, পূর্বোক্ত, নোটস, পৃষ্ঠা ২৭০)। কলকাতায় দাঙ্গার আসল কারণ সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম মুসলিমবিদ্বেষ। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই সারা ভারতে বিশেষ করে বাংলায় মুসলমানেরা ছিল চরম অবহেলিত। এককালের নবাব-বাদশাহির উত্তরসূরিরা এখন দরিদ্র-বেকার, সমাজের সর্বনিম্নস্তরে তাদের অবস্থান। কিন্তু বাংলায় তখনো তাদের একটা শক্তি ছিল, তা হচ্ছে সংখ্যা শক্তি। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পতনের পূর্বমুহূর্তে জান বাঁচানোর চেষ্টায় ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া একটা আংশিক গণতন্ত্র দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন জারি করেন।

২. Janam Mukharje. *Hungry Bengal: War, Famine and the End of Empire*. p 16-17.

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বৃহত্তম দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ১৯৩৭ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হওয়া পর্যন্ত যে তিনজন প্রধানমন্ত্রী হন, সংখ্যাগুরু হওয়ার কারণে তারা তিনজনই ছিলেন মুসলমান। তারা হচ্ছেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মুসলিমবিদ্বেষী কলকাতার হিন্দু ভদ্রলোকেরা স্বভাবতই প্রমাদ গুনলেন। তাই মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা সত্ত্বেও হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের নেতাদের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়ে বাংলাকে পুনরায় ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত করার দাবি জানান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহসী নেতৃত্ব দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় মুসলমানদের অতিপ্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচ হিসেবে কাজ করেছে। দাঙ্গা চলাকালে গড়ের মাঠে মুসলিম লীগের জনসভায় বক্তৃতার মাঝপথে দাঙ্গা জটিল আকার ধারণ করেছে বলে খবর পেলেন তিনি। ঘোষণা করলেন, 'ভাইও! কলকাতা জ্বল রাহা হ্যায়। ইয়ে তিররকা নেহি— ইনসানিয়াত কো বাঁচানে কা ওয়াক্ত হ্যায়। মুজহে এজাজত দিজিয়ে।'

'ভাইয়েরা! কলকাতা জ্বলছে। বক্তৃতা নয়, মানবতাকে বাঁচানোর সময় এখন। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

শুধু তৎকালীন কলকাতার নয়, আব্বা আরও শোনাতেন ইংরেজ উপনিবেশ উচ্ছেদের আন্দোলনের অসম সাহসী নেতাদের কাহিনি। জালিয়ানবাগ গণহত্যার করুণ ঘটনা, যার প্রধান নায়ক ছিলেন সাইফ উদ্দিন কিচলু। তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং জার্মানির এক ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন। তার সমসাময়িক বিখ্যাত আইনজীবীরা তাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে সম্মান করত। ১৯১৯ সালে ইংরেজ কুখ্যাত রাওলাট আইন জারি করে প্রথম মহাযুদ্ধকালীন জরুরি আইন চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করছিল। এতে সরকারকে কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার, অনির্দিষ্টকাল আটক করে রাখা এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছিল। ড. সাইফ উদ্দিন কিচলু ও ড. সতপাল নামে আরেক আজাদি আন্দোলনের নেতা এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিলে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার সাইফ উদ্দিন কিচলু ও সতপালকে গ্রেপ্তার করলে তাদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে শুরু হয় গণবিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের একটা ছোট বাগানে সরু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

প্রবেশপথে এ ধরনের এক মিছিলের ওপর গুলি চালানোর আদেশ দেন জেনারেল রিজিওনাল ডায়ার, যা ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা নামে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশবাদের সর্বাধিক কলঙ্কজনক ঘটনা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আব্বার ইতিহাসসচেতন মনে এ ঘটনা কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ হলো তিনি আমার এক ছোট ভাইয়ের নামকরণও করেছিলেন সাইফ উদ্দিন কিচলু— জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার প্রধান নায়কের পুরো নামটার অনুকরণে।

শুনতাম বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, অভিরাম, বিনয়, বাদল, দিনেশের গল্প। খেলাফত আন্দোলন ও জিহাদ আন্দোলনের গল্প। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের অনেক কাহিনি শুনেছি আব্বার মুখে। শুধু একটা এখানে উল্লেখ করব। নামে মাওলানা হলেও মোহাম্মদ আলী জওহরের ইংরেজি ছিল অনবদ্য। মাউন্ট ব্যাটেনের আগে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন ইংরেজি গদ্যের প্রাতঃস্মরণীয় লেখক আর্ল ওয়াভল। ভারত ত্যাগের আগে লর্ড ওয়াভল ইংল্যান্ডে তার মেয়েকে লিখলেন, 'ইন্ডিয়া থেকে তোমার জন্য কী আনব?' জবাবে মেয়ে লিখল, 'ইন্ডিয়ার যা সর্বোত্তম তাই নিয়ে আসুন আমার জন্য।' ওয়াভল লন্ডনে পৌঁছালে মেয়ে জিজ্ঞেস করল, তার জন্য কী এনেছেন তিনি। লর্ড ওয়াভল বের করে দিলেন পুরো এক বছরের মাওলানা মোহাম্মদ আলী সম্পাদিত 'কমরেডের ফাইল'। মেয়ে তো হেসেই খুন। ইউ হ্যাভ ক্যারিড কোল টু নিউক্যাসল। ভারত থেকে আমার জন্য এনেছেন ইংরেজি পত্রিকা, তা-ও আবার পুরোনো।

: এর চেয়ে ভালো কিছু পেলাম না ইন্ডিয়ায়, বললেন ওয়াভল, পড়ো। ইংরেজি ইমপ্রুভ করতে পারবে।

গান্ধি, নেহরু এবং জিন্নাহর অনেক গল্প বলতেন আব্বা। কিন্তু যার কাহিনি আমার তরুণ মনে আগুন জ্বালিয়েছিল, তিনি হচ্ছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষ ছিলেন বাঙালি চরিত্রের অনবদ্য উপমা-প্রতিভাদীপ্ত, সাহসী, জনপ্রিয় অথচ শেষ পর্যন্ত করুণভাবে ব্যর্থ। গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো।

ভারতে তখন ক্রান্তিকাল। পলাশীর শোচনীয় পরাজয়ের পর চলেছে দীর্ঘ ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, নিগ্রহ, দুঃস্বপ্ন আর নিঃশব্দ অপমান। সেই জ্বালার অবসান হতে চলেছে— ভারত ছাড়ছে দখলদার বেনিয়া ইংরেজ। স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবে আবার। বাড়তি মুনাফা হলো একটা নয়, স্বাধীন হিসেবে জন্ম নেবে দুটো দেশ— ভারত ও পাকিস্তান।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কিন্তু আর সব জন্মের মতো স্বাধীনতার জন্মও প্রসবযন্ত্রণাশূন্য নয়। লুটতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর খুন-রাহাজানির সয়লাব বয়ে গেল সারা উপমহাদেশে। চলল বিরামহীন স্থান বদলের পালা। হিন্দুরা চলল হিন্দুস্তানে আর মুসলমানরা পাকিস্তানে। মুহাজির আর শরণার্থীর মিছিলগুলো হতে লাগল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। অনেক বেদনার কাহিনি থেকে গেল। না-বলা ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর বন্যায় সাঁতার কেটে কেটে স্বাধীনতা সন্ধানীরা অবশেষে কূলের নাগাল পেল। আজাদির মধুময় স্বপ্নের আমেজ সদ্য জন্মদাত্রী মায়ের মতোই তাদের মুখ থেকে দূর করে দিলো সব তিক্ততার বিস্বাদ। ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই নতুন দেশ, নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্নে। আমার পরিবারও কলকাতা ছেড়ে দেশে এলো। সন্দেহ নেই, সেই মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথ তাদের জন্য কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কিন্তু কত কঠিন, কতটা বিপৎসংকুল ছিল, সেই অভিজ্ঞতাও আমার নেই। আমি তখন মাত্র পনেরো-ষোলো মাসের শিশু।

বাড়িতে প্রথম দু-তিন বছর কেমন কাটল তার বিবরণও তেমন জানা নেই আমার। এই সময়ের বর্ণনাও খুব একটা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সম্ভবত নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে তাদের। আব্বা চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার চেষ্টা করলেন। নতুন দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী আমাদের এলাকার মানুষ। আর আগে না থাকলেও এতদিনে পরোক্ষ আত্মীয়তাও হয়ে গেছে খানিকটা। আব্বা তার সঙ্গে দেখা করলেন। খোঁজখবর নিয়ে হামিদুল হক চৌধুরী জানালেন, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের যে চাকরি আব্বা কলকাতায় করতেন, তা পূর্ব পাকিস্তানে নেই। সেই চাকরিরও ব্যবস্থা হতে পারে, তবে এর জন্য তাকে করাচি যেতে হবে। করাচি দূরে থাক, কলকাতায় দীর্ঘ প্রবাসজীবনের পর নিজের এলাকার বাইরে; এমনকি ঢাকায় চাকরি নিতেও আব্বা রাজি হলেন না। ফলে রাজস্ব বিভাগেই ছোট এক চাকরি নিতে হলো তাকে। তিনি গ্রহণ করলেন তহশিলদারের পদ। পারিবারিক পেশা জমিদারি অবশ্য তাকে প্রচুর অভিজ্ঞতা দিয়েছিল এ কাজের। বিধির বিপাক বটে, এমনও সময় ছিল যখন তার নিজের পরিবারেই গন্ডা গন্ডা নায়েব, তহশিলদার কাজ করত।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চার

আব্বার প্রথম নিয়োগ হলো আমাদের জেলারই উপকূলবর্তী হাতিয়ায়। মেঘনার মোহনার আরও এক স্থানীয় নাম আছে— শাহবাজপুর নদী। সারা উপমহাদেশের সব কটি বিপুল-বিশাল শক্তিমতী নদী পূর্ব বাংলায় এসে একত্রে মিলে মেঘনা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। এই মহাশক্তিধারী জলধারার মিলনস্থল নোয়াখালী ও বরিশাল জেলার মাঝ দিয়ে। সারা ভারতবর্ষের পলিরাশি বয়ে এনে মেঘনা যুগ যুগ ধরে নজরানা পেশ করেছে সাগরের পদতলে। সেই পলি স্তরে স্তরে জমা হয়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় উপকূলবর্তী দ্বীপ-হাতিয়া, সন্দ্বীপ। হাতিয়ার আবার দু-অংশ, সাগরের কূলকিনারাহীন পানির মধ্যে মস্ত দুটো অশ্রুবিন্দুর মতো ভাসছে উত্তর-হাতিয়া আর দক্ষিণ-হাতিয়া। এই উত্তর হাতিয়া আবার একরাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টিচর— আলেকজান্ডার, চর কাদিরা ইত্যাদি। কালক্রমে পলি জমা হয়ে হয়ে এই দ্বীপমালা একত্রে যুক্ত হতে থাকে। ষাটের দশকের নানা পরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলে এখন গোটা উত্তর হাতিয়াই নোয়াখালী জেলার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালে উত্তর হাতিয়া ছিল সুদূর সমুদ্রদ্বীপ। আর উত্তর হাতিয়ার পরে কাদিরায় পাকিস্তানের প্রথম পোস্টিং পেলেন আব্বা।

আমাদের দেশে তখনো নদীই রাজপথ এবং যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তা ছাড়া সপরিবারে অনেক লটবহর নিয়ে দূরদূরান্তে পাড়ি জমাতে হলে নদীপথের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? আমাদের বাড়ির প্রায় দোরগোড়া দিয়েই প্রবাহিত ছোট ফেনী নদী। একটা বড় সাম্পানে চড়ে আমরা প্রথমে রওনা করলাম নোয়াখালী সদরের সোনাপুর অভিমুখে। জেলার পূর্বতন সদর শহর সুধারাম (মাইজদী) তখন প্রমত্ত মেঘনার করাল ছোবলে সম্পূর্ণ নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছোট ছিলাম, সবকিছু মনে নেই। যা এখনো মনের পর্দায় মুদ্রিত হয়ে আছে তা হলো এক ঝলক ছবি— একটা মাত্র স্ন্যাপ-শট। পলি আচ্ছাদিত বিশাল এক নয়া চর, মাঝে মাঝে সরু পানির ধারা বইছে খালের মতো। দূরে অর্ধভগ্ন দু-চারটা দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ। ঠিক মাঝামাঝি আটকে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা জাহাজ। জোয়ারের অপেক্ষায় কয়েক ঘণ্টা আমাদের এখানে কাটাতে হবে। সেই জাহাজেই নিয়ে তোলা হলো আমাদের। নোনাপানির সামুদ্রিক গন্ধের সঙ্গে লোহা ও কাঠের ভেজা সোঁদা

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে কেমন এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ভেতরে কারা যেন এক খাবারের রেস্তোরাঁ খুলে বসে আছে। পরিবারের সবাই খাওয়া সারল সেই রেস্তোরাঁয়। জোয়ার এলে অন্য এক সাম্পানে চড়ে হাতিয়া অভিমুখে যাত্রা হলো শুরু। হাতিয়ার চর কাদিরায় রাজস্ব উসুলের জন্য ইংরেজ সরকারের আয়োজন নেহাত মন্দ ছিল না। পাকা অফিস ও বিরাট বাসাবাড়ি, শানবাঁধানো পুকুর মিলিয়ে মস্ত কম্পাউন্ড। শুরুর দিকে হয়তো সাহেবদের এসব পদে নিয়োগ মিলত। শুরুর দিকে তাই জেলা প্রশাসকের পদবি ছিল ডিসট্রিক্ট কালেক্টর, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নয়। তাই প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। পরে চাকরি উপলক্ষ্যে অন্য যেসব জায়গায় আব্বা গিয়েছিলেন, সর্বত্র একই অবস্থা দেখেছি। সরকারের কোষাগার পূর্ণ করার দায়িত্ব যাদের, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

কিছু বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্র ছাড়া সেই প্রথম শৈশবের বিশেষ কিছু এখন আর স্মৃতির ভান্ডারে জমা নেই। মনে পড়ে এক অপরাহ্নে ঘুমিয়ে উঠে বারান্দায় এসে বসেছি। মুহূর্তে কোথা থেকে যেন ভেঙেচুরে ঢুকল বিরামহীন জলস্রোত। উঠান ডুবে রান্নাঘরের ভিটা পর্যন্ত চলে গেল পানির তলায়। বসতঘরটা যারা তৈরি করেছিল, তারা নিশ্চয়ই সমুদ্রে ঘেরা এই দ্বীপের খেয়ালি আবহাওয়ার হিসাব করেই এর পরিকল্পনা করে থাকবে। তাই এর ভিটেটা ছিল ছোটখাটো এক টিলার সমান উঁচু। তারপরও এর পাকা করা ভিটার কানায় কানায় পৌঁছে গেল পানি। সারা বিকেল পানিতে ভাটা পড়ার কোনো আলামত নজরে পড়ল না। আর একটু বাড়লেই ঘরের ভেতরে পানি ঢুকে পড়বে। ভয়ে চুপসে গেছি আমরা। আমি আর ছোট বোন রিনা (ভালো নাম তাহমিনা বেগম চৌধুরানী, কলকাতা থেকে ফেরার পরে গ্রামের বাড়িতে ওর জন্ম) তড়িঘড়ি রাতের খাবার খেয়ে আম্মার দুপাশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। আম্মা জানতেন পানি আর বাড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে তিনি ভীষণ ভয় করছিলেন সাপখোপ ঘরে ঢুকে পড়ে কিনা। আব্বা অনেকক্ষণ ধরে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দরুদ পড়তে থাকলেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে গেলাম বারান্দায়। উঠানে আর পানি নেই। সাগর প্রস্থান করেছে বটে, তবে উঠানের জলকাদায় তার জীবন্ত পদচিহ্ন রেখে যেতে ভুল করেনি। চারদিকে কচ্ছপ, কাঁকড়া, ছোট-বড় মাছ, শামুক-ঝিনুক আর শেওলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এক দৌড়ে উঠানে নেমে তুলতে লেগে গেলাম সেগুলো। প্রকৃতির জীবনদায়ী পরশে আনন্দে নেচে উঠল সারা অন্তরমন। গোটা বিশ্বজাহান হাতের মুঠোয়

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পেয়ে গেলাম যেন। আনন্দের সেই জোয়ারে ছন্দপতনের মতো এসে হাজির হলেন আম্মা। ভয়ে-ত্রাসে হইহই করে ছুটে এলেন তিনি। একরকম ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে সাফ করে বুকে তুলে নিলেন আমাকে।

আর একদিন— স্থানীয় হাটবার। হাট তখন আমার জন্য ছিল এক বিস্ময়ভরা, অজানা, অনাবিষ্কৃত জগৎ। চুম্বক যেমন, তেমনি দুর্বার ছিল এর আকর্ষণ। সুযোগ পেলেই একে দেখতে ছুটে যেতে চাইতাম। কিন্তু আম্মার স্নেহসিক্ত কঠোর বাঁধনমুক্ত হয়ে হাটের নয়াদিগন্ত নিরিখ করা আমার জন্য চন্দ্রালোক সফরের মতো শুধু স্বপ্ন হয়েই থাকল। সুযোগ অবশ্য এলো। চাকর ছেলে আর বড়দা (বড় ভাইদের দাদা ডাকার অভ্যাস সম্ভবত কলকাতার সওগাত) বাজারের ফর্দ নিয়ে চলল। তাদের অজান্তে তাদের পিছু নিলাম আমি। ভিড়ের ভেতরে তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা দুষ্কর, তাই হঠাৎ করে উঠলাম কেঁদে। চমকে ফিরে তাকালেন বড়দা। জোর করে আমার হাতটা মুঠোর ভেতরে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চললেন আমাকে। সঙ্গে চলল বকুনি আর ধমকের তুফান। রাগে, অভিমানে ফুলতে থাকলাম আমি, অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে বড়দার মুঠি থেকে হাতটা খসিয়ে দিলাম ছুট। প্রমাদ গুনলেন বড়দা— দুজনে ছুটতে শুরু করলেন আমার পিছু। কিন্তু জনাকীর্ণ হাটের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া কি সহজ? তা ছাড়া বড়দের চাইতে ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়ায় আমার অতিরিক্ত সুবিধাও ছিল। জনতার পায়ের কাছে দিয়ে অবলীলাক্রমে পার হয়েছিলাম সুড়সুড় করে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমার কোনো হদিস বের করতে পারলেন না বড়দা। ভয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বাসায় ফিরে এলেন তিনি। সব শুনে প্রথমে দারুণ রেগে গেলেন আম্মা। বেচারা বড়দার ওপর লাভাস্রোতের মতো বর্ষণ হতে লাগল বকুনি। কিন্তু শিগ্‌গিরই রাগটা ব্যথায় রূপ নিল। হাহাকার করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেন আম্মা। আব্বাকে খবর দেওয়া হলো। ছুটে এলেন তিনি। হারিকেন হাতে দলবেঁধে সবাই খুঁজতে বের হবেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার ঝড়ে পর্যুদস্ত হওয়া থেকে সহজেই বেঁচে গেলাম। ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিলেন আম্মা। অঝোরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেন আর চুমোয় চুমোয় শ্বাসরোধ করে তুললেন আমাকে। 'সেই তো আমার মা, বিশ্বভুবনমাঝে যাহার নাইকো তুলনা'— কত সত্য কবির এই পঙ্‌ক্তি দুটো।

তাই বলে আম্মা শুধু নরম একতাল কাদামাটি ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। শক্ত হাতে শাসন করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। আমাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি এটা জরুরি মনে করতেন। সময়মতো খাওয়া শেষ করার

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

জন্য, মন দিয়ে পড়ার জন্য এমনকি ছড়ি হাতে নিয়ে বসতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। ব্যবহার কখনো করেছেন এমনটা মনে পড়ে না। তবে ব্যবহার করার দরকারও হতো না, তার গম্ভীর মুখ ও ছড়ি ঘুরিয়ে ধমক দেওয়াই রক্ত হিম করে দিত। কিন্তু মায়েদের শাসনের সুরেও যে প্রচ্ছন্ন স্নেহ ঢাকা রয়েছে, সন্তানেরা সহজেই তা আবিষ্কার করে ফেলে। তাই মায়ের যে রূপ সব সন্তান যুগ যুগ ধরে মনের মুকুরে লালন করে, তা হলো স্নেহময়ী জননীর।

চর কাদিরার বাসায়ও চাকর-চাকরানি ছিল কাজে সহায়তা করার জন্য। আম্মা চমৎকার রাঁধুনি ছিলেন। এত ভালো যে, শুনেছি আম্মা যখন দেশের বাড়িতে আসতেন, তখন বিভিন্ন বাড়ির ফুফুরা তাদের বিবাহোপযোগী মেয়েদের রান্না শেখার জন্য আম্মার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও সব সময় রান্নাবান্না তার পক্ষে সম্ভব হতো না। একজন বুড়ি ঝি তাকে সাহায্য করতেন। এ সময় আমার ও রিনার দেখাশোনার জন্য ১০-১২ বছর বয়সের স্থানীয় এক মেয়েকে নিয়োগ করা হলো। অদ্ভুত এক নাম ছিল তার— 'বুক্কি'। কালো শীর্ণ এই মেয়েটার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেল আমাদের পরিবারের সঙ্গে। সে বড় আপার ব্যক্তিগত পরিচারিকার ভূমিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ফুটফরমায়েশও করত। তবে তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল আমাদের ছোট দুজনের দেখাশোনা করা। আমরাও কারণে-অকারণে তাকে জ্বালাতন করতে দ্বিধা করতাম না। কিন্তু আব্বা ছিলেন এ ব্যাপারে দারুণ কড়া, বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিতেন— কাজের লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে আল্লাহ নারাজ হন। তিনি ঈদের নতুন কাপড়চোপড় কেনার সময় চাকর-ঝিদের জন্যও কিনতে ভুলতেন না, সমান মানের না হলেও নতুন কাপড় পেত তারা। একই খাবার তাদেরও দেওয়া হতো।

কিছুদিন পর আমার একটা ছোট বোন জন্ম নিল— জেবুন্নিসা। খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলাম আমরা সবাই। কিন্তু সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। প্রসবোত্তর রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলেন মা। দূর সেই দ্বীপাঞ্চলে ভালো তো দূরের কথা, অতি সাধারণ কোনো হাসপাতালও ছিল না। ফলে চিকিৎসা যা কিছু ঘরেই হতে থাকল। জেবুর দেখাশোনাও এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াল। প্রমাদ গুনলেন আব্বা— চাকরির দায়িত্ব, আম্মার চিকিৎসা ও আমাদের তদারক মিলিয়ে নিশ্বাস ফেলার জো ছিল না তার। এমনি কাটতে লাগল মাসের পর মাস।

সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন আম্মা। আমরা মাতৃহারা হলাম। স্বামী, পুত্র-কন্যাদের অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে মা আমার চলে গেলেন তাঁর মনিবের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দরবারে। কান্নার রোল পড়ে গেল ঘরজুড়ে। প্রিয়জনের বিদায়শোকের করুণতম দিক হলো— এই শোকের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে যেতে হয় নিকটাত্মীয়দের, যেমন জানাজা-দাফন। আম্মার জানাজার আয়োজন হলো আমাদের বাসার সামনের মাঠে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল মাঠটা। জানাজা শেষে একটা খোলা খাটে কাফন মুড়ে আম্মাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে চলল জানাজার মিছিল। অনুচ্চ স্বরে কালেমা পড়তে পড়তে, মাঠ থেকে আমাদের বাসার পাশের পুকুরপাড় দিয়ে রাস্তার অন্য পাশে মসজিদের কবরস্থানে নেওয়া হচ্ছিল তাকে। পুকুরের ঘাটের পাশে একটা বড় বটগাছ, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এর তলায় বসে ছিলাম। খাটটা নিয়ে যখন লোকেরা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি। কান্নাজড়ানো গলায় চিৎকার করে উঠলাম, 'আম্মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?' জবাব কেউ দিয়েছিল কি না সেদিন মনে নেই। তবে আমার সেই বেদনাঘন হাহাকার বাতাসে-ইথারে সওয়ার হয় দূর শূন্যলোক পর্যন্ত গুঞ্জরিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এই কান্নার, এই আর্তনাদের জবাব শুধু একটাই— 'আমরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আর তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

প্রচলিত ইসলামি রুসুম অনুযায়ী সেই রাতে এবং তারপর সপ্তাহখানেক ধরে বিভিন্ন প্রতিবেশী ও পরিচিত-বন্ধু-পরিবার তৈরি খাবার পাঠাতে থাকল আমাদের জন্য। শোকার্ত পরিবারে চুলা জ্বলে না বেশ কিছুদিন। খাবার আসত, কিন্তু খাওয়ার জন্য আগ্রহ ছিল না কারও। তবু বেঁচে থাকার তাগিদে প্রাকৃতিক আচারগুলো পালন করে যেতে হতো। গ্রাম থেকে কিছু আত্মীয়স্বজন এলেন আমাদের দেখার জন্য। ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে থাকল। চারদিকে যেন শূন্যতা, মুহূর্তে গোটা পরিবারটা যেন বিধ্বস্ত অসহায় হয়ে গেল। শুধু একজন মানুষের অভাবে, শুধু আমার দীর্ঘ রোগাক্রান্ত মায়ের তিরোধানে গোটা পরিবার যেন মুহূর্তে নোঙরহীন হয়ে গেল। উদ্দেশ্যহীন অনিশ্চয়তার সাগরে ভাসতে থাকল অবিরাম। শেষে ঠিক হলো, আমাদের আপাতত গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে কাকা-চাচি আম্মা দেখাশোনা করবেন। আব্বা চর কাদিরায় একা থাকবেন। শুধু একজন চাকর তার দেখাশোনা করবে।

বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। ঝি-চাকরদের বিদায় দেওয়া হলো। বুক্কির মা-বাবাকেও ডেকে পাঠানো হলো। কিন্তু বিপদ বাঁধল তখন। বুক্কি নিজেও যেতে রাজি হলো না, তার মা-বাবাও হাউমাউ করে কেঁদে আব্বাকে মিনতি করতে লাগল, 'কোথায় নিয়ে যাব আমরা তাকে? আমাদের কাছে তো সে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

না খেয়ে মরে যাবে। আপনি তার মা-বাপ, আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিন।' আব্বা অনেক বোঝালেন তাদের যে তিনি হয়তো বেশি দিন আর হাতিয়ায় নেই। তারপর কোথায় বদলি হবেন কে জানে। তার পক্ষে তাদের সঙ্গে দেখাশোনার জন্য বুক্কিকে এখানে আনা সম্ভব হবে না। তবু তারা অবিচল। আনতে হবে না। এই পরিবারে সে কী রকম ব্যবহার পেয়েছে তারা তা জানে, তারা নিশ্চিন্ত, ভবিষ্যতে দেখারও কোনো দাবি করবে না তারা ইত্যাদি। নিরুপায় হয়ে আব্বা বুক্কিকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। চর কাদিরায় আব্বার আরও এক বছর কাটল। নিঃসঙ্গ জীবন। পরিবার থেকে দূরে কখনো থাকেননি। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল আম্মার কবরের নৈকট্য। এ সময় আমাদের দেখার জন্য আব্বাকে বারবার গ্রামের বাড়িতে আসতে হতো।

এই অনিশ্চয়তার অবসান হলো অবশেষে— আব্বার বদলির হুকুম এলো। আকাশ থেকে পড়ল যেন হাতিয়াবাসী। আব্বার ব্যবহার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল তারা। কিছুতেই তাকে যেতে দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু তবু যেতে দিতে হলো। ব্যর্থ হলো সব আবেদন-তদবির। একদিন আব্বা গোছগাছ সেরে যেতে তৈরি হলেন। হাতিয়াবাসী কিন্তু এমনিতে যেতে দিলো না তাকে। আয়োজন করা হলো বিদায় সংবর্ধনার। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আবেগ-উচ্ছ্বাসভরে বক্তৃতা করলেন অনেকে। তা ছাড়া ছাপানো মানপত্র আয়নায় বাঁধিয়ে দেওয়া হলো। একজন তা পড়ে শোনালেন। প্রতিটি প্যারা একটি নতুন সম্বোধন দিয়ে শুরু করা ছিল— যেমন 'হে মহাত্মন,' 'হে জনদরদি' ইত্যাদি। কিন্তু মূল শিরোনামের নিচে ছিল চমৎকার দু-ছত্র কবিতা:

'সেই ধন্য ধরাতলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।'

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এই পঙ্‌ক্তি দুটো আমি আজও কেন ভুলিনি! মানপত্রটা ক্রমেই হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শোভা পেত আমাদের ঘরে। 'নিত্য সেবা'র দাবিটা অবাস্তব সন্দেহ নেই, সর্বজনের মনের হার্ডডিস্কে (অথবা 'মন্দিরে'— এই কবিতার ভাষায়) অত দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণক্ষমতা নেই। কিন্তু না ভোলার ওয়াদা, বিশেষত বিদায়ের বেদনাময় মুহূর্ত, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মানবিকতার ঝলকে আলোকিত করে তোলে মানুষের জীবন। উভয় পক্ষই হয়ে ওঠে ধন্য।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পাঁচ

গ্রামের বাড়িতে চাচি আম্মার তত্ত্বাবধানে আমাদের সময় কাটছিল কোনোমতে। চাচি আম্মার জন্য এ কাজটা সহজ ছিল না মোটেই। তার নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর গিয়ে হাজির হলাম আমরা ছয় ভাইবোন। তার মধ্যে আমরা তিনজন নিতান্তই ছোট। জেবু তো কয়েক মাসের শিশুমাত্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকের দরদভরা বদান্যতা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা মুশকিল হলো। ইতোমধ্যে ঘটল আর এক দুর্ঘটনা— জেবুর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর একদিন চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল আমার এই দুঃখিনী মা-হারা ছোট বোনটি। আব্বা অবশ্য ইতোমধ্যে তার নতুন কর্মস্থল বামনীর তাল মোহাম্মদের হাটে চলে গেলেন। স্থানটি আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। কিন্তু উন্নত যাতায়াতব্যবস্থা না থাকলেও বারবার বাড়ি এসে তিনি আমাদের দেখে যেতে পারতেন।

আমার তখন স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে। বড়দা, ছোটদা আর বড় আপা ইতোমধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে আমাদের বাড়ির কাছের ফাজিলের ঘাট প্রাইমারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় স্কুলটার নাম ছিল গোবিন্দপুর প্রাইমারি স্কুল। স্কুলঘরটা ছিল মোট চার কামরা ও একটা টানা বারান্দার টিনের ঘর, মাটির ভিটা আর বাঁশের বেড়া। একটা ছোট কামরা শিক্ষকদের জন্য, বাকি তিনটা বড় কামরা ছিল ক্লাসরুম। শিক্ষক ছিলেন তিনজন— ক্লাসরুমের হিসাবে বোধ হয়। শচীন্দ্র মাস্টার ছিলেন প্রধান শিক্ষক। এই কালো ছোট ক'দের বৃদ্ধ মাস্টারের মধ্যে ছিল একটা শান্ত-সৌম্য স্বভাবসুন্দর ব্যক্তিত্ব। সেকালের প্রথামতো হাতে ছড়িও তিনি রাখতেন, কিন্তু ব্যবহার করতে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শচীন বাবুর বয়স কত আন্দাজ করা মুশকিল— খুব বেশি মনে হতো না, যদিও পরে শুনেছি যে আব্বাও তার ছাত্র ছিলেন। শচীন বাবুর নিজের স্বাস্থ্যও ভালো ছিল আর ছাত্রদের স্বাস্থ্যেরও তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। তার ক্লাসে আমাদের সবাইকে পিঠটান করে বসতে হতো। পিঠ কুঁজো করে বসলেই তিনি ধমক লাগাতেন, বাকি দুজন ছিলেন তরণী মাস্টার ও লাতু মাস্টার। এ দুজন অবশ্য শচীন বাবুর মতো স্বভাবসুলভ শিক্ষক ছিলেন না। ছাত্রদের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা তারা অর্জন করতেন হাতের ছড়ির জোরে। স্কুলের সামনের প্রশস্ত মাঠে আমরা খেলাধুলা

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

করতাম। মাঠের পরে বড় এক টুকরো জমিন পেরিয়ে ছিল ছোট ফেনী নদী। স্কুল ও মাঠটা ছিল একটু নিচু, কিন্তু এর বামদিকে উঁচু ভিটার ওপর ছিল আমাদের পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ইদগাহ। তার পশ্চিম প্রান্তে স্কুলের লাইন বরাবর দুটো পৃথক ঘর, একটা মসজিদ আর অন্যটা হাফেজি মাদরাসা। এরপর রাস্তার অপর পাশে বাজারের দোকানপাট। রাস্তাটা নদী পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে, নদী পার হয়ে ওপারে চর মজলিশপুরে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম খেয়ানৌকা। এখন অবশ্য পুল তৈরি হয়ে গেছে। বাজারটার উত্তরেই ছিল হিন্দুদের বসতি, দুটো ছোট গ্রাম। পূর্বাংশে নদীর তীর ঘেঁষে গোবিন্দপুর, তারপর পশ্চিমপুর। এখানে তাদের একটা মন্দিরও ছিল।

জেবুর মৃত্যুর পর আমাদের লালনপালন নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে উঠল। অনেকেই আব্বাকে আবার বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে শুরু করলেন। তাদের মধ্যে আমার নানা মোখলেছুর রহমান সাহেব ছিলেন প্রধান। সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি দূরদূরান্ত পর্যন্ত সবার খোঁজখবর রাখতেন। তিনিই প্রস্তাব আনলেন আব্বার সদ্যবিধবা এক মামাতো বোনের জন্য। ছাগলনাইয়া থানার হরিপুর কাজীবাড়ির আব্বার মামা কাজী করিম উল্লাহ সাহেবের প্রথম কন্যা তিনি। নাম জাহানারা বেগম। তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে। সেখানে দুই ছোট ছোট মেয়ে হিরু ও শিরিকে রেখে তার স্বামী ইন্তেকাল করেন। বিয়ে হয়ে গেল, ঘরে এলেন আমার নতুন মা। শুরুতে হিরু ও শিরি আসেনি। বাপের বাড়িতেই অন্য কোনো আত্মীয়া তাদের দেখাশোনা করছিল। আম্মা এলেন আর আমাদের বিশৃঙ্খল, ছন্নছাড়া সংসারে ফিরে এলো স্বস্তি— ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো জীবন। কিছুদিন বাড়িতে কাটানোর পর সাব্যস্ত হলো আমরা বামনীতে আব্বার কাছে চলে যাব। হাতিয়ার মতো বামনীতেও (তাল মোহাম্মদের হাট) ছিল মস্ত বড় কম্পাউন্ড। বিরাট অফিসরুম, সামনে বড় এক দিঘি, বেশ বড় বাসা, সামনেই তাল মোহাম্মদের হাট, বড় একটা সেকেন্ডারি স্কুল। যোগাযোগের ব্যবস্থাও খুব খারাপ ছিল না। জেলা সদর মাইজদী পর্যন্ত বাস সার্ভিসও ছিল। একটাই শুধু বাস চলাচল করত— নাম ছিল 'এয়াদ'। আজকাল মোটরগাড়ির ইঞ্জিন অনেক তরক্কি করেছে, কিন্তু তখন এয়াদ বাসটা চালক একা স্টার্ট দিতে পারতেন না। সামনে তার এক যুবক সহকারী লোহার বাঁকা এক রড দিয়ে কয়েক দফা প্রচণ্ড বিক্রমে ঘুরিয়ে ইগনিশানের সূচনা করতেন। ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়ে উঠত ঘনঘন, তাই যেখানে-সেখানে বাস থামিয়ে হাঁক ছাড়তেন চালক, 'পানি দে-রে! জলদি পানি দে।' বালতি হাতে পাশের পানাভরা পুকুরডোবা বা খালের দিকে ছুটতেন তার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সহকারী। বাজার থেকে সম্ভবত মাইল দুই দূরেই ছিল বিশাল বিস্তৃত নদী। নদীর পাড়ে অনেক এলাকাজুড়ে কাদামাটি ভরা নবীন চর। মাটি ভেদ করে উঠত সবুজ অথচ তীক্ষ্ণ শলার মতো একধরনের তৃণ। এত চোখা যে খালি পায়ে এর ওপরে হাঁটাও অসম্ভব। তবে পুরো গজিয়ে গেলে এগুলো প্রায় হাঁটুসমান লম্বা হয়ে যায়, তখন এগুলোকে দুই ফাঁক করে নুইয়ে দিয়ে মাঝখান দিয়ে লোকজন চলাফেরা করে। এই তৃণের নাম 'উরি'— এই নামে একটা চরের নাম হয়েছে, 'উরির চর'। স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম আমরা সবাই। বাসা থেকে মাত্র চার-পাঁচ মিনিটের দূরত্বে স্কুল। আসতে-যেতেও কোনো অসুবিধা নেই। স্কুলের শিক্ষক যারা অন্যান্য স্থান থেকে এসেছেন, তাদের থাকার জায়গার দরকার হতো। তেমন একজনকে গৃহশিক্ষক হিসেবে রাখা হতো আমাদের বাসায়। এ রকম এক গৃহশিক্ষক হয়ে এলেন মিজান স্যার, পুরো নাম মিজানুর রহমান চৌধুরী। পরে যিনি জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদের। স্কুলের সব শিক্ষকের কথা ভালো করে মনে নেই, শুধু আর একজনের কথা মনে পড়ে— আমাদের দাগনভুঞা এলাকা থেকে আগত সেকান্দর পণ্ডিত। হেড পণ্ডিত নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। মোটা শরীর আর দাড়ি মিলিয়ে তাকে মোটামুটি ভীতিপ্রদ মনে হতো। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন হাসিখুশি এবং দিলখোলা।

বাজারের ওপর একটা মাদরাসাও ছিল। বড় মাদরাসা নয়, সম্ভবত আলিম ক্লাস পর্যন্ত। কয়েক মাইল দূরে চাপরাশির হাটে ছিল বড় মাদরাসা, ফাজিল না কামিল পর্যন্ত মনে নেই। এসব মাদরাসার জন্য তেমন কোনো সরকারি সাহায্য বোধহয় মিলত না, জনসাধারণের বদান্যতাই ছিল এদের প্রধান পাথেয়। ফসলের মৌসুমে দলে দলে তালেব এলেমদের (ছাত্রদের) গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। গৃহস্থরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ধান-চাঁদা দিত তাদের। বড় বড় ওয়াজ মাহফিল করেও চাঁদা তোলা হতো। এ থেকে আর কিছু না হোক, একটা কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল তখন।

নতুন পরিবেশেও মানুষ নিজের সমাজ গড়ে নেয়। খুঁজে বের করে আত্মীয় বা বন্ধু-স্বজন। আমরাও তেমন কিছু পেয়ে গেলাম। বাসা থেকে সামান্য দূরেই ছিল কাজীবাড়ি। তারা নাকি দূর সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হন। তাদের দুজন বিবাহোপযোগী মেয়ে দীর্ঘ সময় আমাদের বাসায় কাটাতেন। বড় আপার চেয়ে বয়সে তারা বড় ছিলেন। তবু তার সঙ্গে ভাব ছিল তাদের খুব। তাদের একজনের নাম ছিল লাইলী। কিছুদিন পরে ঢাকা না কোথায় তার বিয়ে হয়ে

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

গেল জাঁকজমকের সঙ্গে। আমরাও সেই বিয়েতে হাজির ছিলাম। কিন্তু আরও নিকটাত্মীয় ছিল মাইলখানেক দূরে— কাদির বক্ত মিয়াদের বাড়ি, আমাদের বাগডুবীর ফুফু আম্মার দেবরের মেয়ে কালাধন বুজানের বিয়ে হয়েছিল সেই বাড়ির বেলায়েত মিয়ার সঙ্গে। লোকে তাকে ডাকত বিল্লাত মিয়া। তাদের বড় ছেলে মিজান বড় দাদার থেকেও বেশ বড় ছিলেন। সম্পর্কে আমাদের ভাগনে হলেও আমরাই বরং উল্টো তাকে মামা ডাকতাম। বুজান অসম্ভব আদর করতেন আমাদের, প্রায়ই দাওয়াত করতেন আর না গেলে নারাজ হতেন খুব। সেই বাড়িতে অবশ্য আমার আকর্ষণ ছিল অন্যত্র। তাদের পাশের ঘর ছিল তার চাচা শ্বশুর মকবুল মিয়ার। তার দুই ছেলে বাহার ও মজনু। বাহার মিয়া বোধহয় তখন জুনিয়র স্কুলের ছাত্র, কিন্তু ছোটভাই মজনু আমার সঙ্গে এক শ্রেণিতেই পড়ত। তাছাড়া আমাদের দুজনের ডাক নামও ছিল প্রায় কাছাকাছি— আমার মনজু, ওর মজনু। ফলে সখ্য সৃষ্টি হয়ে গেল নিবিড়। মনে আছে, দুজনে মিলে আমাদের বাসার দিঘিপাড়ের পেয়ারাগাছের শাখায় শাখায় পাকা টসটসে পেয়ারা পাড়তাম, পাখির ছানা খুঁজে বেড়াতাম আর অর্থহীন গল্পে মেতে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হাতাহাতি আর তর্কাতর্কি এমনকি কথা বন্ধও হতো। কিন্তু আবার কখন সব স্বাভাবিক হয়ে যেত টেরও পেতাম না। শৈশবের হৃদ্যতা ছিল নিখাদ-আন্তরিক। কারণ সেই সহজ-সরল স্মৃতি অন্য কোনোরূপ ভেজালক্লিষ্ট থাকে না।

বামনীতে থাকাকালেই এলো সাধারণ নির্বাচন। মুসলিম লীগ সরকারকে উৎখাত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ হয়েছে সব বিরোধী দল। নতুন এই মোর্চার নাম দেওয়া হয়েছে— যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব পাকিস্তানে এই সর্বদলীয় সংহতির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। চতুর্দিকে সরগরম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। এই নির্বাচনি এলাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর নাম ছিল নুরুজ্জামান। সরকারি প্রার্থীও কেউ নিশ্চয়ই ছিলেন। তাদের ব্যর্থতার একটা প্রমাণ এ-ও যে, আমার শিশুমনে কোনোরূপ রেখাপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রচারণা। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পথঘাট। মাইক লাগিয়ে চলছে প্রচারাভিযান। একটা মস্তবড় জনসভা অনুষ্ঠিত হলো স্কুলের মাঠে। শামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ তৈরি হলো। মাঠের চারপাশে বড় বড় বাঁশের খুঁটি গেড়ে তার মাথায় বাঁধা হলো বড় বড় চুঙ্গা— ভালো নাম 'লাউড স্পিকার', আমরা তাজ্জব হয়ে দেখতে লাগলাম এই অপূর্ব যন্ত্রের আজব কেরামতি। কোথায় বক্তা কথা বলছে আর কত দূরে এসব চুঙ্গা বিকট শব্দে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। অনেক নেতা এলেন বক্তৃতা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করতে। তারমধ্যে একজন মন্ত্রী এলেন— ন্যাপের মাহমুদ আলী সাহেব। খুব ঝাঁজালো বক্তৃতা করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সব বক্তৃতা, স্লোগান পানসে করে দিলো এক ভোটের গান—

'হক সাহেবের নামের জোরে জাগরে কৃষক-শ্রমিক দল

হকই তোদের আশার প্রতীক, হকই তোদের বাহুর বল।'

এই আওয়াজের প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকল গ্রামেগঞ্জে। জিতে গেলেন হক সাহেব আর তার যুক্তফ্রন্ট।

বামনীর দিনগুলো নতুন আনন্দ বয়ে আনল আমাদের পরিবারে। আমার আর এক ছোট বোন জন্ম নিল। নতুন ভাইবোনদের মধ্যে সে প্রথম। জাঁকজমকের সঙ্গে তার আকিকা অনুষ্ঠিত হলো, নাম রাখা হলো গুলসান আরা বেগম চৌধুরানী। তবে আমরা ডাকতাম লীলা। ডাকনাম সে সময় প্রায় একটা অপরিহার্য প্রথায় পরিণত হয়েছিল, ভাইবোন সবারই মস্ত লম্বা ভালো নামের সঙ্গে ছোট, বলতে সহজ ডাকনাম একটা রাখা হতো। বড় দাদার ডাকনাম ছিল হারু, ছোট দা'কে ডাকা হতো চিনু, আমাকে মনজু আর ছোট বোন তাহমিনাকে রিনা। এই শিরোপা থেকে পরে আসা ভাইবোনেরাও বাদ পড়েনি।

আব্বার ইসলামের প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে লাগল। বামনীর বড় সব ওয়াজ মাহফিলে তিনি শুধু হাজিরই হতেন না, উদ্যোগ-আয়োজনেও পালন করতেন সক্রিয় ভূমিকা। ওয়ায়েজ, বক্তা, পির ও আলেম সাহেবরা ছিলেন আমাদের ঘরের নিয়মিত আর সম্মানিত মেহমান। কিন্তু তাই বলে আব্বা অন্যদের মতো নীরব অনুসারী ছিলেন না, বিনা প্রশ্নে বিনা সমালোচনায় কারও বক্তব্য তিনি গ্রহণ করতেন না। আর কোনো প্রথা বা অভ্যাসের সঙ্গে একমত না হলে তাদের মুখের ওপর তা স্পষ্ট বলে দিতে কসুর করতেন না তিনি। খাবার দস্তরখানে এমন অনেক আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছে আমার।

একবার জৈনপুরের পির সাহেবকে দাওয়াত করা হলো আমাদের বাসায়। ওয়াজ শেষ করে পির সাহেব এলেন বিশাল পালকি চড়ে। খাওয়ার পর চা খেতে খেতে প্রশ্ন তুললেন আব্বা— মানুষের কাঁধে চড়ে বেড়ানো কি জায়েজ? বিশেষ করে এই সময়ে যখন বিকল্প যানবাহনের অভাব নেই? পির সাহেব অবশ্য গতানুগতিক জবাব দিয়ে দায় সারতে চাইলেন, শরিয়তে কোথাও এটা নিষেধ করা হয়নি। আব্বা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, বললেন: পালকিতে চড়া যদি প্রয়োজন হতো, তবে রাসুল (স.)-এর সময়ে হতো সবচেয়ে বেশি, যেহেতু অন্য কোনো আধুনিক বাহন তখন ছিল না। তারপরও তিনি মানুষের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কাঁধে চড়েছেন অথবা অন্তত অনুমোদন করেছেন এরতো কোনো প্রমাণ মেলে না। আর কোনো জবাব দিলেন না পির সাহেব।

আর একবার শহীদুল্লাহ কায়সার ভাইয়ের আব্বা মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব রমজান মাসে একরাত কাটালেন আমাদের বাসায়। সেহরিতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। আব্বা মাঝপথে খাওয়া বন্ধ করে দিলেন— বললেন, ফরসা হয়ে উঠেছে, আর খাওয়া যাবে না। প্রাণবন্ত হাসিতে উচ্ছল হয়ে বললেন মাওলানা, আরে থামো তো, সেহরি খাওয়া শুরু করলে শেষ না করে উঠতে নেই। পর্দা টেনে দাও। আব্বার মুখ দেখে মনে হলো না যুক্তিটা তার মনঃপূত হয়েছে। আলেম-ওলামাদের সঙ্গে মেলামেশায় একটা লাভ হলো, আব্বা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অবশ্য আরও কিছু বছর হুক্কা সেবন করতেন তিনি। চমৎকার কারুকার্য করা একটা নলের হুক্কা ছিল তার।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ছয়

বামনী থেকে গ্রামের বাড়ির দূরত্ব বেশি ছিল না, বাসে চড়ে দাগনভূঞা পর্যন্ত আসতে খুব বেশি সময় লাগত না, সেখান থেকে বাকি দেড় দুই মাইল রিকশায় করে সহজেই পৌঁছানো যেত। তাছাড়া নৌকাও ছিল একটা চমৎকার মাধ্যম। তাই মাঝেমধ্যেই বাড়ি আসতাম আমরা। কোনো এক উপলক্ষ্যে, কী তা এখন মনে নেই, বাড়িতে এলাম আমরা। বাড়ির এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, প্রবাসের জীবন ও পরিবেশ যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, তা বাড়ির বিকল্প হতে পারে না। তাই প্রতিদিন অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতাম কখন বাড়ি আসব। যা আমাকে সবচেয়ে বেশি টানত, তা হলো এর প্রাকৃতিক পরিবেশ। গাছপালা, বাগানবাড়ি, অজস্র ফলমূলের সমাহার আর অনেকগুলো পানিঝলমল পুকুর ও দিঘি মিলিয়ে এর অশেষ স্বপ্নময় পরিবেশ।

আমাদের বাড়িটা ৯ কানি (প্রায় এগারো একর) জমির ওপর। সামনের দিক ছাড়া বাকি তিন দিকে প্রশস্ত বেড়ায় ঘেরা। তিন দিকে হলেও চৌবেড়া নামেই পরিচিত ছিল এটা। খালের মতো এই বেড়াটা প্রায় আঠারো গজ চওড়া, সারা বছর পানি ভর্তি থাকত। ফলে সেই তিন দিক থেকে অনধিকার প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাছাড়া এটা ছিল মাছে ভর্তি। প্রতি দু-তিন বছর পর লম্বা কাঠের 'দোন' নামক এক যন্ত্র ঝুলিয়ে দুজন লোক একপ্রান্ত পা দিয়ে পানিতে চেপে ধরত, পানি ভর্তি হয়ে গেলে পা নামিয়ে নিত তারা— যন্ত্রটা ঝুলে পড়ত অন্যদিকে আর জমা পানিটা বের হয়ে যেত অন্য প্রান্ত দিয়ে। এভাবে পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশন করে লেগে যেত মাছ ধরার ধুম। অনেক লোক যোগ দিত এতে। উঠানের ওপর মাছের স্তূপ লেগে যেত। সারা গ্রামে বিলি করা হতো, জেলেরা এসে কিনেও নিয়ে যেত কিছু। তারপরও শোল, কই, মাগুর ও শিঙের মতো 'জিয়ল' মাছগুলো হয় উঠানে গর্ত খুঁড়ে তাতে পানি দিয়ে, নয়তো বড় বড় মাটির কলসিতে জিইয়ে রাখা হতো পরে বেশ কিছুদিন ধরে খাওয়ার জন্য। এ ছাড়া ছিল পুকুর— এক-দুটো নয়, বেশ কয়েকটা। সামনে বিরাট বিরাট দুটো— একটা উত্তর পাশে মসজিদের সামনে মসজিদের পুকুর, অন্য একটা বিশাল দিঘি। এর নামকরণও হয়েছে অবস্থান থেকে— দক্ষিণের পুকুর। দুটো পুকুরেই রয়েছে শান বাঁধানো ঘাট, দক্ষিণের পুকুরের দুপাশেই। নিকট দিকে আমাদের বাড়ির লোকদের ব্যবহারের জন্য আর দূরপ্রান্তে গ্রামবাসীর জন্য। মসজিদের পুকুরের ঘাট মূলত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মুসল্লিদের অজু করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভেতরবাড়িতে রয়েছে মোট চারটা পুকুর। যেহেতু ঘরের ভেতরে গোসলখানার প্রবর্তন তখনো হয়নি, তাই পর্দা বজায় রেখে বাড়ির বিভিন্ন হিস্যার (অংশের) নারীরা স্বচ্ছন্দে গোসল করতে পারে তার জন্য এতগুলো পুকুরের ব্যবস্থা। একটায় শানবাঁধানো ঘাট আর অন্য কয়েকটিতে গাছের কাণ্ড দিয়ে নির্মিত ঘাট ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে একটা দালান আর দুটো টিন ও কাঠের ঘর ছিল, এর মধ্যে একটা ছিল দোতলা। একতলা দালানটা প্রাচীন, কাবিল চৌধুরীর শেষ জীবনে মসজিদ ও শানবাঁধানো পুকুরঘাটগুলোসহ একসঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাহিরবাড়িতে ছিল মসজিদ ছাড়াও দুটো বড় কাছারিঘর, যা অফিস, আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা ও মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়াও ছিল দুটো লম্বা দেউড়িঘর, প্রথমটি কাছারি দুটোর পেছনে— ভেতর ও বাহিরবাড়িকে আলাদা করার জন্য। আর দ্বিতীয়টা কাছারির সামনের ছোট খোলা মাঠটার পরে। দুই দেউড়ির ভেতর দিয়ে ছিল বাড়িতে প্রবেশের পথ। কাছারির দরজা থেকে দ্বিতীয় দেউড়ি দিয়ে বহড়া-বাদামগাছটার পাশে দিয়ে সেই পথটা সোজা চলে গেছে নদীর তীর পর্যন্ত। মাঝামাঝি বিন্দু থেকে বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে সোজা এবং প্রশস্ত আর একটা পথ। চৌকিদারবাড়ির সঙ্গে খালের ওপর পুল পেরিয়ে এই পথটা গিয়ে লেগেছে দাগনভূঞা-ফাজিলের ঘাটের মধ্যকার প্রধান সড়কের সঙ্গে। খালের ওপরকার পুলটার নাম মধুবিবির পুল। আমাদের ছেলেবেলায় সেখানে একটা কাঠের পুল ছিল। কিন্তু নিচে খালের জলস্রোত আছড়ে দুমড়ে পড়ছিল প্রাচীন ইট-সুরকি নির্মিত পাকা এক পুলের ধ্বংসাবশেষের ওপর। সেই ছিল মূল মধুবিবির পুল। কে এই মধুবিবি? আমার কল্পনাপ্রবণ মনের জগতে ছিল অশেষ কৌতূহল এবং অনেক প্রশ্ন। চৌধুরীবাড়ির কোনো নন্দিনী কন্যার কি নাম ছিল মধুবিবি কিংবা কোনো লাজুক পুত্রবধূ? ছেলেবেলায় এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাইনি। আর আমার সব প্রশ্নের, সব জবাবের বিশ্বকোষ আব্বার কাছে এ সম্পর্কে কিছু শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এর জবাব পেয়েছি অবশ্য অনেক পরে পারিবারিক দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে গিয়ে। মধুবিবি এ বাড়িরই দুহিতা এবং ভগিনী বটে। এই বংশের জানা-ইতিহাসের প্রথম পুরুষ মোহাম্মদ তকী চৌধুরীর কন্যা এবং কাবিল চৌধুরীর বোন তিনি। আদরের তনয়াকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন মোহাম্মদ তকী চৌধুরী। তাই আজও খালের স্রোতবাহী ধারা পরম স্নেহে আছড়ে পড়ে মধুবিবির পুলের ভাঙাচোরা স্তম্ভ ও টুকরোগুলোর ওপর। ঠিক যেমন করে বৃদ্ধ পিতা স্নেহভরে হাত বোলাতেন কন্যার চোখেমুখে। এই পুলের ওপর দিয়েই এককালে এই বাড়ির ঘোড়ার গাড়িগুলো চলত। পরে কাঠের পুলটাও

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ভেঙে যায়। চলাচলের জন্য নতুন রাস্তা তৈরি হয়— সামান্য দুরে আমাদের মসজিদের পুকুরের পাড় দিয়ে। সে রাস্তায় তৈরি হয় নতুন পুল। তারপর পুরোনো রাস্তাটা ধীরে ধীরে তার মর্যাদা হারাতে থাকে। কাঠের পুলটা ভেঙে গেলে তা আর পুনর্নির্মাণ না করে সেখানে তৈরি হয় বাঁশের একটা সাঁকো। চৌধুরীবাড়ির ভাগ্যের সঙ্গে এই পুলের ধারাক্রমিক অবনতির কী অপূর্ব সাদৃশ্য!

কাছারিঘরের সামনের মাঠটার উত্তরে পাকা দেওয়ালের ভেতরে ছোট পারিবারিক কবরস্থান, তারপর মসজিদ। মসজিদের চৌহদ্দিতে প্রবেশের প্রধান সিংহদরজাটার এক পাশ দিয়ে ওপরে চড়ার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আজান দিতেন মুয়াজ্জিন। মূল মসজিদ ঘরটা ছিল খুবই ছোট, এর বাইরে একই আকারের একটি টিনের চালওয়ালা আধখোলা এবং তার বাইরে আর একটা ছাদহীন সম্পূর্ণ খোলা বারান্দা— অবশ্য সবগুলোরই ছিল পাকা মেঝে। বাদবাকি বাড়ির সর্বত্র ছিল ফলমূলের গাছে ভরা অনেক বাগান। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল নারকেল আর সুপারিগাছ, তারপর বোধকরি বাংলাদেশে যত রকমের ফলমূল জন্মাতে পারে, তার কোনোটাই বাদ রাখেননি শৌখিন চৌধুরীরা। আম, কাঁঠাল, তাল, কয়েক প্রকারের জাম, কামরাঙা, কমলা, লিচু, লেবু, জলপাই, গাব, ডুমুর, আনারস, সনতারা (জাম্বুরা), বহড়া, আমলকী, হরীতকী, খেজুর, বেল, পেয়ারা, আমরুদ, লুকলুকী, গোলাপ জাম, করমচা এবং আরও অগণিত ফল গাছের সমারোহ ছিল এসব বাগানে। ফলের গাছ ছাড়াও বাঁশ, বেত, কড়ই, মাদার, শিমুল প্রভৃতি ব্যাবহারিক গাছপালারও অভাব ছিল না। ফলের মৌসুমে যেন উৎসবে মেতে উঠত সারা বাড়ি। নিজেরা খাওয়া ছাড়াও বিলিবিতরণ করা হতো অনেক ফলমূল। এই বাগানগুলোতে বিনা চাষে, বিনা যত্নে আরও জন্মাত রকমারি সবজি— এর মধ্যে প্রধান ছিল পটোল, মেটে আলু, করলা, শসা আর অগণিত শাকের সমাহার। এ ছাড়াও ছিল মাঠে ও পানিতে অগুনতি বুনো সবজি। এত সমৃদ্ধি, এত অযাচিত সম্পূর্ণ বিনা শ্রমে অর্জিত প্রাচুর্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কি না, জানি না। ডিএল রায়ের একটা ছত্র কমপক্ষে মিথ্যা নয়— এ দেশ সত্যি ধন ধান্য পুষ্পে ভরা। এ দেশকে যারা দরিদ্র বলে আর দরিদ্র করে রাখে, তাদের মতো অন্ধ-অজ্ঞ আর কে হতে পারে!

পেছনে পশ্চিম-উত্তর কোণে বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে প্রায় দেড় একরজুড়ে একটা মস্তবড় বাগানবাড়ি, বরং ঘনবন বললেই বোধ হয় ভালো। এর নাম মুনাবাড়ি। এই আর এক নাম, যা শিশুকাল থেকেই আমার মনে জন্মিয়েছে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সীমাহীন কৌতূহল। এই বাগানের এই নামের উৎস কী? এই বাড়ির কারও নামে এর নামকরণ যে হয়নি, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কি মুনা নামের অন্য কোনো লোকের বাড়ি ছিল এটা? চৌধুরীদের বসতবাড়ির প্রশস্ততার খাতিরে তাকে কি বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল? রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমির' উপেনের মতো বাবুদের প্রাচুর্যভরা দিনে গড়া 'বাগানখানা' প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান টানা হওয়ার স্বার্থে দুর্ভাগা মুনাকে তার নিজ বসত জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল কি না, কে জানে! যেভাবেই নামকরণ হোক না কেন, এই বাগানবাড়ির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তা কোনোভাবেই ম্লান করেনি আমাদের রহস্য-সন্ধানী শিশু মনে। এমনকি কৈশোর-যৌবনেও অনুসন্ধানের অশেষ প্রেরণা বয়ে আনত এই বন। বাড়ি গেলেই ছুটে যেতাম সেখানে। প্রাচীন-বিশাল মহিরুহসদৃশ বৃক্ষে ভরা এই বাগানবাড়ি সব অর্থেই ছিল একটা ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট। দীর্ঘ বিস্তৃত শাখাগুলো ছাতার মতো মেলে ছায়াঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখত। নিচে গজাত রকমারি লতাগুল্ম আর ফলমূল। কৈশোরে বনভোজন আর লুকোচুরি খেলার লীলাভূমি ছিল এই বন। বড় আমগাছ নামে মালদহ ধরনের বড় এবং মিষ্টি আমের মস্ত বড় এক গাছ ছিল এই বনে। ফলের মৌসুমে রকমারি ফলের মধুময় সুঘ্রাণ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে বাতাস ভারী করে তুলত আর মাতোয়ারা করে তুলত আমাদের।

সেকালে সহায়তার জন্য যথেষ্ট কাজের লোক ছিল। তবে আজকালের মতো বেতনভুক চাকর-চাকরানি নয়, স্থায়ী বংশানুক্রমিক ভৃত্য পরিবার। এ রকমের চারটা পরিবার ছিল তখন। তাদের থাকার জন্য বাড়ির এলাকার প্রায় সঙ্গেই লাখেরাজ বাড়ি করে দেওয়া হতো। একটা পরিবার দেউড়ি ঘরেও বসবাস করত। এদের নিজের বাড়িতে খুব কমই রান্নাবান্নার প্রয়োজন হতো। কারণ তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এ বাড়িতেই হতো বেশির ভাগ সময়। কাজের জন্য কোনো বেতন এরা পেত না। পারিশ্রমিক মূলত নগদ নয়, সুবিধাদির মাধ্যমে দেওয়া হতো। যে নামে তাদের পরিচয় করে দেওয়া হতো, তা ছিল 'খানসামা'। আমাদের একেক পরিবারের জন্য ওদের একেক পরিবার নির্দিষ্ট ছিল। নাম যাই হোক, এরা চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। আপনজনের মতো বিবেচনা করা হতো তাদের। তাদের বয়স্করাও আমাদের বাড়ির শিশুকেও আপনি এবং আমাদের ডাকনামের সঙ্গে মিয়া বা বিয়া আখ্যা করে সম্বোধন করত, আমরাও তাদের জ্যাঠা, পুতু ভাই বলে সম্বোধন করতাম। এদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ যিনি ছিলেন, তাকে আব্বা, কাকারাও জুনু ভাই বলে ডাকতেন আর আমাদের ছিলেন তিনি জুনু জ্যাঠা আর তার স্ত্রীকে ডাকতাম

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ঝি। তাদের বিবাহিত ছেলেমেয়েরাও নাতিপোতা নিয়ে এই সব বাড়িতে থাকত। সবচেয়ে করুণ ব্যাপার ছিল যে তাদের পেশার কারণে গ্রামের সবাই তাদের ছোট করে দেখত। কেউ তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি ছিল না। তাদের সন্তানাদির বিয়েশাদি হতো আমাদের অন্যান্য আত্মীয় বাড়িতে কর্মরত একই ধরনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, তা সেই সব বাড়ি যত দূরেই হোক না কেন। খাওয়াদাওয়া ছাড়াও তাদের কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা, বিয়েশাদির খরচাদি তাদের চৌধুরীবাড়ির নির্দিষ্ট মনিব পরিবারকে বহন করতে হতো। তবে এই বাহ্যিক মানবিক ব্যবহারই যে সব সময় পালিত হতো এমন ধারণা করা ভুল হবে। মানুষের জীবনের ওপর এরকম সীমাহীন কর্তৃত্বের অধিকারকে পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়নীতির সঙ্গে পালন করতে হলে মানুষকে ফেরেশতার মতো হতে হবে— আর চৌধুরীবাড়ির প্রত্যেক ব্যক্তি এমন হবেন, তা আশা করাও বাতুলতা। ফলে এই অসহায়-দুর্ভাগাদের মানবাধিকার কোনো কোনো সময় লঙ্ঘিত হতো। কিন্তু এতে তারা বিচলিত হতো না মোটেই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করত। চৌধুরীরাও প্রত্যেকে এমন বাড়াবাড়ির পর কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্তকে পুরস্কৃত করে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে বিলম্ব করতেন না।

এ ছাড়া আরও অনেক পেশাজীবীর সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে লাখেরাজ (করমুক্ত) বাড়িঘর ও জমিজমা দিয়ে নিয়োগ করে রাখা ছিল, বাড়ির উত্তর পাশেই মসজিদের ইমামতি, আজান, ইকামত ও শিশুদের কোরআন শিক্ষা ইত্যাদি কাজ করার জন্য মৌলবি সাহেবকে একটা ভালো আকারের বাড়ি ও পাঁচ কানি চাষের জমি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হয়েছিল। বংশানুক্রমিকভাবে তারা এই সুবিধা ভোগ করে আসছেন। এ ছাড়া নদীতীরজুড়ে একলাইনে গড়ে দেওয়া হয়েছিল নাপিতবাড়ি, ধোপাবাড়ি, মালীবাড়ি আর পালকি বেহারাদের বাড়ি। বাজারের পর গোবিন্দপুর গ্রামের শুরুতে ছিল জেলেবাড়ি। এরা সবাই বাড়ি এবং কিছু চাষের জমির সুবিধা ভোগ করছিল সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে, বিনা খাজনায়। পরিবর্তে তাদের চৌধুরীবাড়ির কাজ করতে হতো বিনা মূল্যে। তবে নগদ না পেলেও কাজ শেষে বকশিশ পেত প্রচুর। নাপিতেরা চুল কাটতে আসত নিয়মিত এবং সামনের খোলামাঠে কোনো একটা গাছের ছায়ায় অথবা কাছারিঘরে এসে বসত। আমাদের ছেলেবেলায় যে নাপিত আসত, তাকে আমরা ডাকতাম উপেন ভাই বা উপেন দা। একজন একজন করে তার সামনে গিয়ে বসতাম আমরা, আর তিনি চুল কাটতে থাকতেন দুপুর পর্যন্ত। তারপর যাওয়ার সময় বাড়ির সব ঘর থেকে তার জন্য বকশিশ আসত, ধান বা চাল,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নারকেল, সুপারি, কখনো-বা ডাল, শিমের বিচি, অন্য কোনো মৌসুমি ফল এমনকি হাঁস বা মুরগিও। মালিরা আসত মাঠ বা বাগান পরিষ্কার করতে, তবে অবশ্যই রমজান এবং ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার দিন সন্ধ্যায় আর ঈদের সকালে। বাড়ির সামনে বহড়াগাছের নিচে এসে ঢোল বাজাতে থাকত। খুশির খবর বাতাসে-ইথারে ভর করে ছড়িয়ে যেত দূর থেকে দূরান্তরে, বয়ে আনত খুশির ঢেউ। যাওয়ার সময় ঝুড়ি ভর্তি করে তারা নিয়ে যেত বকশিস। একইভাবে ধোপারা কাপড় ধুয়ে, ইস্ত্রি করে দিয়ে যেত, জেলেরা কোনো বড় দাওয়াত-জিয়াফতে মাছ ধরে দেওয়ার জন্য বড় বেড়াজাল নিয়ে আসত। আর পালকি বেহারারা কাঁধে তুলে নিত বিশাল ষোলো বেহারার পালকিটা। শুধু পালকি-বেহারা পরিবারটা ছিল মুসলিম, বাকি সব পেশাজীবী ছিল হিন্দু। জমিদারির গোধূলিবেলায় ঘোড়ার গাড়ি ছিল না। পালকিটাও প্রথম দেউড়িঘরের শোভাবর্ধন করত বেশির ভাগ সময়। সুন্দর রং ও কারুকার্যখচিত এবং রঙিন কাজকরা কাচে সজ্জিত পালকিটা এত বড় ছিল যে, এতে পূর্ণবয়স্করাও সটান হয়ে শুয়ে শুয়ে সফর করতে পারতেন। ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পালকি-বেহারারা অন্যান্য পেশায় মনোযোগ দেয়। কেউ কেউ নিজেরা ছোট পালকি কিনে বিয়েশাদিতে ভাড়া বইতে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

সাত

শিগ্‌গিরই আব্বা বদলি হয়ে গেলেন বামনী থেকে। নতুন কর্মস্থল সদর মহকুমার লক্ষ্মীপুরে। আগের মতোই যানবাহন হিসেবে নির্বাচন করা হলো সাম্পান। বিশাল এক সাম্পানযোগে সমস্ত লটবহর নিয়ে রওনা করলাম আমরা। ধীর-মন্থর বিলাসী গতিতে ভ্রমণ করে সাম্পানটি তিন দিনে আমাদের লক্ষ্মীপুরে পৌঁছানোর কথা। আঁকাবাঁকা নদীপথ ধরে নিরুদ্বেগ রাজহাঁসের মতো হেলেদুলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল আমাদের সাম্পানখানা। নৌকার ছইয়ের ওপর বসে বসে চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকণ্ঠ গিলে যাচ্ছিলাম। সময়টা সম্ভবত শরৎকাল হবে। খাল-বিল নদী-নালা টইটম্বুর। কোথাও বাঁকের কাছে জমা হয়ে ভাসছে কচুরিপানার কম্বল। কোথাও জেলেরা দলে দলে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। তীর দিয়ে কাদামাটি গায়ে মাখা উলঙ্গ শিশুরা ছোটাছুটি আর হাঁকডাক করে সরগরম করে তুলছে চারদিক। কোনো কোনো অংশ আবার নির্জন, নীরব, নিথর। শুধু আমাদের নৌকার মাঝির সহকারীরা লম্বা দড়ির ‘গুন’ টেনে টেনে নৌকার গতি বাড়িয়ে এগিয়ে চলছে। সেই গতি নৌকার নিচে পানির চাদরটাকে দুই ফাঁক করে একটানা ছলছল আওয়াজে ভরে তুলছে পরিবেশ। মাঝে মাঝে আরও দু-একটা নৌকাও এসে যোগ দিচ্ছে আমাদের যাত্রামিছিলে। কিন্তু প্রাকৃতিক এই শোভায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকার ছেদহীন অবসর অবশ্য মিলত না, বিলম্ব হতো না ছন্দপতন ঘটতে। নিচে থেকে মায়ের ডাক আসত খেতে যেতে। তাছাড়া আব্বা, আম্মা দুজনই মাঝেমধ্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন নদীর খোলা হাওয়ায় পাছে আমার ঠান্ডা লেগে যায় কি না— এই আশঙ্কায়। কখনো বড় ভাই-বোনরা হম্বিতম্বি করে জ্বালাতন করতে দ্বিধা করত না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো, বিকাল গড়িয়ে পড়ল সোনালি আভায় ঝলমল গৌরবময় গোধূলি বেলায়, দূরে ছায়ার মতো গাছপালা আর গ্রামের মাঝে নদীর পানিতে লাল টকটকে সূর্যটা ডুব দিলো অনিচ্ছুক ডুবুরির মতো। সন্ধ্যা হয়ে গেল। নদীর সৌন্দর্য শুধু দিনেই সীমিত নয়, আঁধাররাতে নদীর বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেও আছে এক রোমাঞ্চকর আনন্দ। আলোর মধ্যে নৌকার দুই প্রান্তে দুটি হারিকেন জ্বলছে টিমটিম করে। খাওয়া সেরে সবাই আবার ছইয়ের ওপর চড়ে বসলাম। হারিকেন দুটোকে বেশিক্ষণ লড়তে হলো না অন্ধকারের সঙ্গে, দিগন্তে উদয় হলো থালার মতো

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

লালচে চাঁদ। আবছা এক মায়াবী আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠল চারদিক। পাকা গোয়েন্দার মতো সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের চুপিসারে অনুসরণ করে চলল চাঁদটা, কোনোমতেই থামল না। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে আমি আড়চোখে তাকাতে লাগলাম চাঁদের দিকে— কখনো সে লুকিয়ে পড়ে সাদা মেঘের ছোট্ট টুকরার তলায়, মনে হয় আর বেরোবে না, কিন্তু মুহূর্ত না যেতেই ফিক করে দুষ্টুমি হাসিভরে বেরিয়ে আসে আবার। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম আমি, চোখজুড়ে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম।

সকালবেলা চোখ মেলে দেখি ছইয়ের নিচে শুয়ে আছি। কখন আমাকে সেখানে এনে শোয়ানো হয়েছে জানি না। নৌকা আবার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে— মাঝিমাল্লারা তাহলে রাতে খানিকটা ঘুমানোর সুযোগও পেয়েছে। স্নিগ্ধ সেই প্রভাতি সূর্যকিরণ ঝিকমিক করে জ্বলছে নদীর শান্ত জলের ওপর। সে প্রসন্ন ভোরের রক্তিমাভা অপূর্ব আনন্দের দোলা জাগাল সারাটা অন্তর মনে— মনের অজান্তে গুনগুন করে আওড়াতে লাগলাম হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া প্রিয় এক গানের কলি— বামনীতে মজনুদের বাড়িতে কলের গানে শোনা:

'ফুলের মত ফুটল ভোর
ভাঙল মাঝির ঘুমের ঘোর,
যাত্রা শুরু— যাত্রা শুরু হলো এবার
— হলো যে সময়।
ঝিকিমিকি জল, নদী টলমল,
জোয়ার বয় রে— বয়।'

মনে হলো কবি এবং গায়ক দুজনেই বোধ করি আমার মতো কোনো এক প্রভাতবেলায় নৌকাভ্রমণে বেরিয়ে থাকবেন। নাশতা সেরে আবার উঠে বসলাম ছইয়ের ওপর। আজ সূর্যালোক ছেদহীন নয়। আকাশে সূর্যটা হালকা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চলেছে। কখনো রোদ, কখনো ছায়ার পালাবদলে। বেলা হলেও রোদের তীব্রতা লাগছে লঘু করে। ফলে মাঝখান থেকে লাভ হয়ে গেল আমাদের। কড়া রোদের ভয়ে ছইয়ের ভেতরে গিয়ে বসতে পীড়াপীড়ি করল না কেউ। মাল্লা দুজন দাঁড় টেনে যাচ্ছে অবিরাম। তাদের চোখেমুখে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই, শুধু গায়ের ঘামে ভেজা ছেঁড়া-আধময়লা গেঞ্জিগুলো প্রকাশ করছে তাদের পরিশ্রমের পরিমাপ। মাঝে মাঝে মাঝির হুকুমে দাঁড় রেখে দিয়ে লম্বা লগি ধরছে তারা। কখনোবা বাতাসের গতি দেখে মাঝির ইঙ্গিতে খাটাচ্ছে মস্ত বিরাট পাল। এ কাজ বেশ কঠিন, দীর্ঘ মাস্তুলের মাথা পর্যন্ত উঠে যেতে হয়

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তাদের। মাঝির কাজটা বড্ড মজার— শুধু নির্বিকার প্রশান্তির সঙ্গে হাল ধরে বসে থাকা— কখনো বা বাঁক বা অন্য কোনো নৌকা দেখে একটু ডানে একটু বাঁয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। বড়দার মতে, এটাই নাকি নৌকা চালানো কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কী করে? কিছুতেই আমার বুঝে আসল না। কিছুক্ষণের মধ্যে দুটো নদীর মিলনস্থলে পৌঁছে গেল নৌকাটা। পানির পরিধি এখানে প্রশস্ত। চারদিকে বাঁশের মঞ্চ তৈরি করে তার ওপরে থেকে জেলেরাও বাঁশে বাঁধা একধরনের ফাঁদ জালে ছেঁকে ছেঁকে মাছ ধরছে। আমাদের মাঝিরা এক ঝুড়ি তরতাজা মাছ কিনে নিল তাদের কাছ থেকে। দুপুরে আস্ত ডালে পাক করা হলো অনেকখানি চিংড়ি। শুধু ওই একটাই মাত্র তরকারি। অথচ গরম ভাতে মিলিয়ে খেতে অমৃতের স্বাদ পেলাম। দেশ-বিদেশে কতই-না রকমারি খাবার খেয়েছি, কিন্তু সেদিনের সেই অতি সাধারণ খাওয়ার স্বাদ আজ অবধি অন্য কিছুতেই মেলেনি।

লক্ষ্মীপুরের বামনী বা হাতিয়ার মতো ছোট্ট একটা গ্রাম্য বাজার নয়, বরং ছিমছাম এক মফস্বল শহর, সাজানো-গোছানো ছোট ছোট পাকা ঘরবাড়ি, প্রায় প্রতিটির সামনেই ফুলের গাছ সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে। রাস্তাগুলোর অধিকাংশেই হয় পিচঢালা, নয় অন্তত ইট বসানো। শহরটার চারপাশ ঘিরে গ্রাম আর নারকেল, সুপারিসহ রকমারি গাছে ভরা ঘন সবুজ বন। শহরের উত্তর প্রান্তে চমৎকার তিতা খাঁর মসজিদের কাছে আব্বার অফিস ও বাসার মস্তবড় কম্পাউন্ড। তিতা খাঁর মসজিদটা আগাগোড়া নীল চায়না বর্তনভাঙা টাইলে ঢাকা। সেকালে আমাদের দেশে সুন্দর দালান তৈরি করতে এই কৌশল ব্যবহার হতো। তিন গম্বুজ ও মিনারশোভিত সাদা ও নীলে ঝকঝকে মসজিদটা সত্যিই আকর্ষণীয় ছিল। মসজিদের সামনের পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আমাদের কম্পাউন্ড। পুকুরটা আমরাও গোসলের জন্য ব্যবহার করতাম। অফিসে বড় দালানটা ছাড়া বাসার সামনে আরও ছোট ছোট দুটো দালান ছিল— এর একটা আমাদের বৈঠকখানা হিসেবে, অন্যটা আব্বার অফিসের কর্মচারীদের কারও কারও থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার হতো। আমাদের বাসার পাশে আরও একটা ছোট বাসা ছিল— আব্বার সহকারী পরিবারগুলোর থাকার জন্য। বাসার ভেতরে বড় থাকার ঘরটা ছাড়া একটা পাকঘর ও নারীদের ব্যবহারের জন্য ছিল একটা পুকুর। মসজিদটার পরে দায়রাবাড়ি। ওই বাড়ির লোকেরা বংশানুক্রমে পির। তাই বাড়িটা দায়রা শরিফ নামেও পরিচিত ছিল। আমাদের সময়ে যিনি গদিনশিন পির ও পরিবারের প্রধান ছিলেন,তার নাম শাহ মনসুর হক সাহেব। হালকা-পাতলা গড়নের মধ্যবয়সি পির সাহেব মিশুক ও মার্জিত রুচির ভদ্রলোক

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ছিলেন। শিগ্‌গির তার সঙ্গে আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। অন্যপাশে শহরের দিকে যেতে প্রথম দু-চারটা দোকানপাটের পর স্থানীয় মুসলিম লীগ দলীয় এমপি আবদুল হাকিম সাহেবের বাড়ি। রাস্তার অপর পাশে আমাদের কম্পাউন্ডের পরই পরিত্যক্ত ভিটা ও পুকুরসহ ফলফলাদি গাছে ভরা বিরাট এক বাগানবাড়ি। আমার পরবর্তী অভিযান, অভিযাত্রা, বনবিহার ও প্রকৃতির সঙ্গে রাখিবন্ধন স্থাপনের রহস্যঘেরা প্রাণকেন্দ্র।

মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন এক দীর্ঘদেহী ক্বারি সাহেব। নামটা খুব সম্ভবত ছিল কারি আবদুল করিম। শুনেছি, মিশর থেকে তিলাওয়াত শিখে এসেছেন তিনি। তার কোরআন শেখার ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো আমাকে। কায়দা, সিপারা (আমপারা) শেষ করে কোরআন শরিফ শুরু করেছিলাম লক্ষ্মীপুরে। পাঠে ধারাবাহিক অগ্রসর হওয়া ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অংশগুলো মুখস্থ করাতে লাগলেন তিনি। মুখস্থ হওয়ার পর তার মতো মাখরাজ আদায় করে ক্বারিআনা ঢঙে তিলাওয়াত শেখানোর ওপর খুব জোর দিলেন তিনি। কিন্তু এটাই হলো আমার কাল। একে কী পড়ানো হচ্ছে তার একবর্ণও বুঝি না, তার ওপর রুক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হেঁড়ে গলায় তোতাপাখির মতো একই আয়াত বারবার এবং দিনের পর দিন আওড়ে যাওয়াটা মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না আমার কাছে। মনে পড়ে, যে জায়গায় এসে একরকম হাল ছেড়ে দিলাম, সেটা ছিল দ্বিতীয় পারার দ্বিতীয় রুকু, 'ফাজ্ কুরুনি আজ্ কুরুকুম ওয়াশ কুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন...।' ক্বারি সাহেবের পদ্ধতি আমার পছন্দ ছিল না বটে, কিন্তু আমার জীবনে তার অবদান অনস্বীকার্য। দোয়া করি, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন আখেরাতের অন্তহীন জীবনে।

আমার লেখাপড়ার জন্য নির্বাচন করা হলো সেকালের লক্ষ্মীপুরের সবচেয়ে নামকরা প্রাথমিক স্কুল পিটিআই বা প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল। টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞ অধ্যাপক ও ইনস্ট্রাক্টাররা আমাদের পড়াতেন আর নবিশ শিক্ষকেরা একপাশে বসে থাকতেন নীরব দর্শক হিসেবে। কখনো কখনো তাদের মধ্যে যারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, তাদেরও পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হতো। এককথায় আমাদের স্কুলটা ছিল নবিশ শিক্ষকদের ল্যাবরেটরি আর আমরা ছিলাম তাদের গিনিপিগ।

তবে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলে পড়ার পুরস্কারও ছিল অনেক। জ্ঞানার্জনের সিংহদুয়ার দিয়ে সেই প্রথম প্রবেশ মুহূর্তে শহরের সেরা প্রশিক্ষকদের কাছে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া ছাড়াও ছিল প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

উপকরণের উদার সরবরাহ, বিশুদ্ধ বাংলা শেখার সুযোগ আর সর্বোপরি কোনো রকম শারীরিক শাস্তিহীন আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ। যে শাস্তি দেওয়া হতো, তা বড়জোর স্কুলের সিঁড়িতে গিয়ে মিনিট পনেরো এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, যাতে করে গোটা স্কুলের সব ক্লাস থেকে সবাই দেখতে পায়। দৈহিক শাস্তির চেয়ে এটা কোনো অংশে কম লজ্জাকর ছিল না। স্কুলের নবিশ শিক্ষকদের আমাদের মনোরঞ্জন করে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগোতে হতো, ফলে তাদের বানাতে হতো অগণিত খেলনা, আঁকতে হতো অসংখ্য ছবি ও দৃশ্য আর আয়োজন করতে হতো আবৃত্তি, গান, বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটকের আসর। পাঠ্যসূচির সব এলাকায় আমাদের জন্য নির্ধারণ করা ছিল সর্বোচ্চ মান। তবে যে দুটো জিনিস আমাকে উপকৃত করেছে সবচেয়ে বেশি, তা হলো পাঠ্যতালিকার বাইরে পড়ার প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক বাংলা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে প্রমিত বাংলায় কথা বলার অভ্যাস করা।

প্রথম প্রথম বামনীতে ফেলে আসা বন্ধুদের বিশেষ করে মজনুর জন্য মন খারাপ হতো। কিন্তু বেশি দিন নয়। শৈশব সময়টাই এমন যে কোমল মনের ফলকে আঁকা দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না মোটেই। নতুন পরিবেশ এঁকে যায় নতুন রেখা। নতুন নতুন বন্ধু জুটে যেতে বিলম্ব হয় না মোটেই। এমন কিছু বন্ধু মিলে গেল আমার। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকট দুজন ছিল আমার ক্লাসমেট জাফর ও আমজাদ। জাফর পি.টি.আইয়ের প্রিন্সিপাল (সুপারিনটেনডেন্টও বলা হতো) এজাজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের ছেলে। ওরা আবার আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হতো। সেই সুবাদে আমার খালাতো ভাই। আর আমজাদের আব্বা ছিলেন স্থানীয় ইপসিকের (ইস্ট পাকিস্তান স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশান) পরিচালক। ওদের বাড়ি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে। আমজাদের এক ছোটভাইও ছিল— সাখাওয়াত। বয়সে বোধ করি আমজাদের থেকে বছরখানেকের ছোট ছিল সে, তাই সে-ও যোগ হয়ে গেল আমাদের বন্ধু তালিকায়। এ ছাড়া হিন্দু বন্ধুও ছিল বেশ কজন— হারাধন (চক্রবর্তী), প্রণব (সেন) ও বিমল। খেলার সাথিদের মধ্যে আরও ছিল দায়রাবাড়ির পির সাহেবের এক ছেলে, এতদিন পরে নামটা তার মনে পড়ছে না। সে আমাদের চেয়ে বছরখানেক বড় ছিল। আরও যোগ দিত আমার ছোট বোন রিনা আর তার দুই বন্ধু, একজন জাফরের ছোট বোন হেলেন, অন্যজন আব্বার সহকারীর মেয়ে মনোয়ারা।

লক্ষ্মীপুর শহরটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দীর্ঘ একটা রাস্তার দুই দিক ঘিরে গড়ে উঠেছে। রাস্তাঘাট অবশ্য আরও ছিল। তবে সেগুলোও ঘুরেফিরে কোনো না

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কোনো বিন্দুতে এই প্রধান সড়কের সঙ্গে এসে মিলেছে। শহরের মাঝামাঝি বয়ে গেছে নদী, যা শহরটাকে ভাগ করেছে প্রায় সমান দুই ভাগে। নদীটার ওপরে লম্বা একটা কাঠের পুল। ওপারে প্রথমে ডান হাতে চলে গেছে একটা রাস্তা গরুর হাটের দিকে। মূল রাস্তাটা কিছুদুর অগ্রসর হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে প্রথমে হাই মাদরাসা, তারপর আমাদের স্কুলের চমৎকার বিল্ডিংটার সামনে দিয়ে শহরের শেষ প্রান্তের দিকে চলে গেছে। শহরবাসীর অধিকাংশ মুসলমান হলেও হিন্দু অধিবাসীও কম ছিল না। হিন্দুরা প্রধানত ছিল ব্যবসায়ী। তবে অন্যান্য পেশায়ও তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল বেশি। এটা প্রতিফলিত হতো তাদের অপেক্ষাকৃত মার্জিত জীবনযাত্রায়। প্রায় সবকটি হিন্দু বাড়ির সামনে ও পেছনে ফুলের বাগান শোভা পেত। শুধু সৌন্দর্যচর্চাই নয়, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপার্বণেও ফুলের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। শহরে ছিল বেশ কয়েকটা মন্দির, গাছপালায় ঘেরা মন্দিরগুলোয় সাজানো ছিল মাটির গড়া রঙিন প্রতিমার সারিতে। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে চুপিচুপি এগুলো দেখতে যেতাম। চার হাত, দশ হাত এবং হাতির মাথাওয়ালা রকমারি দেবদেবীর মূর্তিগুলো আমাদের কিশোর মনে জাগাত নানা প্রশ্ন। সবচেয়ে ভয়ংকর মনে হতো কালীমূর্তি— দেবতা, বিশেষ করে দেবী কেমন করে অমন হিংস্ররূপী হতে পারে, কিছুতেই বুঝে আসত না। আমাদের ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে বেশ কজন হিন্দুও ছিল। তাদের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা-বিতর্কও কম হতো না। হিন্দুদের বিরাট অবদান ছিল শহরবাসীর মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে। গানবাজনা, নাচ, যাত্রা, নাটক ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন করত তারা। দুর্গাপূজা সম্ভবত ছিল প্রধান ধর্মীয় পার্বণ। শহরের হিন্দু পাড়ায় এ সময় পড়ে যেত উৎসবের ধুম। মনে আছে, পূজামণ্ডপ দেখতে গেছি অনেকবার। বিশাল রঙিন প্রতিমার সেটটি ছিল এক অপূর্ব শিল্পকর্ম— দেবীর নয়, দেবীর স্রষ্টা এই নিপুণ শিল্পীর মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে যেন এটা। সামনে ভক্ত আর পূজারির দলের পেশ করা রকমারি ফলাহার, পুষ্পস্তবকের ঢের লেগে যেত। ভাবতাম, প্রতিমা তো মাটির পুতুল ছাড়া কিছু নয়— খেতে পারার কথা নয়, তাহলে কেন এই সমারোহ, এই অপচয়? চোখ তুলে তাকালাম দুর্গা মূর্তির মুখের দিকে। নিপুণ শিল্পীর গড়া দুর্গামূর্তির ঠোঁটে ফুটে উঠেছে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের হাসি, ভক্তজনের অবোধ অজ্ঞতার প্রতি কি না, কে জানে! কিন্তু সবচেয়ে কৌতূকোদ্দীপক ছিল এই পূজা পর্বের সমাপ্তি। সপ্তাহখানেকের পূজাদান পর্ব শেষ করে বিরাট মিছিলসহ প্রতিমার সেটটি বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো নদীর তীরে, সেখানে তুলে নেওয়া হতো নৌকায়, তারপর

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নদী ও স্থানীয় খালের মোহনায়, যেখানে পানির বিস্তার বিপুল, সেখানে নিয়ে ফেলে দেওয়া হতো উপুড় করে। শুধু ফেলে দিয়েই শেষ নয়, এত দিনের ভক্তি— পরিণতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিমার সেটটির পিঠে লাথি মারতে থাকত সবাই অবিরাম— পাছে আবার দুর্গাদেবী মাথা তুলে না দাঁড়ায়— কী অদ্ভুত এই প্রথা!

দুর্গোৎসবের যে অংশ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল, তা হলো যাত্রাগান। মন্দিরের সামনের বিরাট ময়দানে রাতের বেলায় হতো এর আয়োজন। থিয়েটারের মতো দর্শকদের সামনে নয়; বরং মাঝখানে অনেকটা কুস্তি খেলার মঞ্চের মতো তৈরি হতো খোলা মঞ্চ। চারকোণে চলাচলের পথ রেখে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা হতো মঞ্চের চারপাশে। প্রথমে কিছু থাকত সমুদ্রতীরের ওগলা নামের একপ্রকার চওড়া খড়ের মাদুর, তার পেছনে চেয়ার ও বেঞ্চের সারি। অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাদের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বা দ্রৌপদীর কারুকাজ করা পোশাক পরে পেছন থেকে দর্শকদের মধ্য দিয়ে এসে আরোহণ করত মঞ্চে। যাত্রার ভাষা-গান ঠিক না হলেও এতে ছিল ছন্দবদ্ধ কাব্যিক কথকতা। নারী চরিত্রগুলোতে প্রায়ই পুরুষেরা নারী সেজে আবির্ভূত হতো। হিন্দু পুরাতন্ত্রের এসব কাহিনি হতো কখনো বীররসে, কখনো বিয়োগান্তিক বা মিলনান্তিক রসে সমৃদ্ধ। রস যাই হোক, সাধারণ দর্শকের জন্য এ ছিল আনন্দলাভের সহজ ও সস্তা উছিলা।

যাত্রাগান ছাড়াও অন্যান্য উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নাটক আর বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনও হতো। নাটকগুলোর অধিকাংশই হতো ঐতিহাসিক ধরনের— বিশেষ করে সিরাজুদ্দৌলা, উদয়নালা, টিপু সুলতান ইত্যাদি। বিদ্যুতের ব্যাপক প্রচলন তখনো শুরু হয়নি। নাট্যমঞ্চগুলোর আলোকায়ন করা হতো মূলত পাম্প লাইটের সাহায্যে। হিন্দুরা সপরিবারেই এসব অনুষ্ঠানে হাজির হতো, মুসলমানরাও যেত বটে, তবে মূলত পুরুষেরাই। পরে শুনেছি এসব অনুষ্ঠানে দুষ্কৃতিকারীরা অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য ওত পেতে থাকত।

স্কুলে বেশ আনন্দঘন সময় কাটছিল। বোধকরি পড়াশোনায়ও বেশ ভালোই এগোচ্ছিলাম, অন্তত শিক্ষকদের এবং আব্বা-আম্মার সন্তুষ্টি দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল। তবে দুষ্টুমিতেও পিছিয়ে ছিলাম না মোটেই। আমার নিকট বন্ধুদের সব কজন যেমন পড়াশোনায়, তেমন দুষ্টুমিতে ছিল চৌকশ। এর জন্য মুশকিলে পড়তে হতো বারবার। ইনস্টিটিউটের নবিশ শিক্ষকদের মাটি, কাঠ, বেত, দড়ি, খড় ইত্যাদি দিয়ে অনেক খেলনা তৈরি করতে হতো তাদের শিক্ষাসূচির

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অপরিহার্য অংশ হিসেবে। এসবের দিকে আমাদের লোভ ছিল প্রচণ্ড, বিশেষ করে সেকালে যখন আজকালের মতো খেলনা বিক্রির কোনো দোকান ছিল না। কখনো-সখনো হয়তো-বা মেলা প্রদর্শনীতে ছিটেফোঁটা কিছু কিনতে পাওয়া যেত। একদিন আমাদের নিয়মিত অনুসন্ধান-অভিযানে তিন বন্ধু মিলে পেয়ে গেলাম এসব খেলনার এক গোপন ভান্ডার। আগেই বলেছি, লক্ষ্মীপুর শহরের চারপাশ ঘিরে রয়েছে নারকেল-সুপারি আর অন্যসব গাছগাছড়ার ঘন বাগান। বাগানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ছোট ছোট রাস্তা, কোথাও-বা দু-একটা ঘরবাড়ি। এক ছুটির সকালে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম এধরনের বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিনের ঘর, বেড়াও টিনের। বারান্দায় দুটো জানালা, একটা কবাট আধখোলা। ছুটে গিয়ে সেই আধখোলা জানালার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম তা ঠিক রূপকথার গুপ্ত ধনভান্ডারের মতো অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় মনে হলো। সেই কৈশোরে সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা আমাদের কাম্য ছিল না, বরং আমাদের কাম্য ছিল খেলার সরঞ্জাম। আর আলিবাবার গোপন গুহার মতো এতে সাজান রয়েছে খেলনা— রংবেরঙের, রকমারি, অগুনতি খেলনার বিপুল সমারোহ। মোহগ্রস্তের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম আমরা। হঠাৎ বোধোদয় হলো, যত সুন্দরই হোক না কেন, জানালার মোটা লোহার শিক আর দরজার তালাটা বাঁধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আর এসব খেলনার ভান্ডারের মধ্যে। ইতোমধ্যে আমার মনে ভয়ের কাঁপন শুরু হয়ে গেছে। বললাম, 'চলো এবার ফিরে যাই।' কেউ ভ্রুক্ষেপও করল না আমার অনুরোধের দিকে। ছুটে গেল দরজার দিকে। আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। জাফর নানান কিছু ব্যবহার করে তালাটা খোলার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত তার কঠোর সংকল্পের সামনে হার মানল জংধরা বর্ষীয়ান তালাটা। সাফল্যের গৌরবে আলোকিত হয়ে উঠল ওর চোখমুখ। ভেতরে ঢুকলাম আমরা— পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ধরতে লাগলাম এটা-ওটা, মনস্থির করা মুশকিল। এভাবে কতক্ষণ কাটল জানি না। সাব্যস্ত করলাম, যার যা পছন্দ নিয়ে এবার আমরা ফিরে যাব। আমি পছন্দ করলাম একটা কাঠের তৈরি মোটরগাড়ি। অন্য দুজনও পছন্দমতো খেলনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজাটা আলতো করে লাগিয়ে। রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত চলতে লাগলাম। ক্রমেই ভয় পেয়ে বসতে লাগল আমাদের মনে। যদি কেউ দেখে ফেলে? তাছাড়া এগুলো রাখবই-বা কোথায়, বাসায় নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, আব্বা জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলবেন। অন্যদের অবস্থাও তাই। ভাবছিলাম স্কুলে নেওয়া যাবে কি না, কিন্তু জাফরের মুখে যা শুনলাম, তাতে ভয় আতঙ্কে রূপ নিল।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বিজ্ঞের মতো হেসে সে ঘোষণা দিলো— এসব জিনিস আসলে স্কুলেরই সম্পত্তি, নবিশ শিক্ষকদের গড়া অতিরিক্ত খেলনার ভান্ডার এই ঘর। প্রমাদ গুনলাম, তাহলে কী হবে? শেষে সাব্যস্ত হলো, আমাদের বাসার পাশের সেই পতিত বাগানবাড়িটায় নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হবে। সেখান থেকে নিয়ে মাঝেমধ্যে খেলব আমরা। প্রস্তাবটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক মনে হলো না। পুরো ব্যাপারটাই একটা অহেতুক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো। মনে, মুখে তিক্ত এক স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

শিগ্‌গিরই খেলনা হারানোর ব্যাপারটা শিক্ষকদের নজরে পড়ল। তাদের ধারণা জন্মাল, ছাত্রদের মধ্যে দুষ্ট কোনো দল এটা ঘটিয়ে থাকবে। ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব কড়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। তবে একটা সুরাহার পথও বাতলে দিলেন। বললেন, যে-ই নিয়ে থাকুক, যদি আবার যথাস্থানে ফেরত দিয়ে আসে, তাহলে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। আমি চাপ দিলাম যে এই সুযোগ নিতে হবে। অন্য দুজনের আপত্তি হলো যে ফেরত দিতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। তবু শেষ পর্যন্ত ফেরত দেওয়াই ঠিক হলো। বাহ্যত ধরা ঠিক পড়লাম না। বীরের মতো দুই বন্ধুর ওপর মাতব্বরি করলাম খানিকটা— কেমন, বলছিলাম না, এখন দেখলে কি বাঁচাটাই বেঁচে গেছি! কিন্তু কদিন পরে টের পেলাম যে আসলে বাঁচিনি। এক এক করে আমাদের তিনজনের ডাক পড়ল প্রিন্সিপাল সাহেবের কামরায়। নিয়েছি কি না— এ প্রশ্ন উঠলই না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, কেন আমরা এ কাজ করতে গেলাম। শেষ পর্যন্ত যে সবক দিয়ে আমাদের বিদায় করলেন তা হলো, ছোট হোক কি বড়, না বলে কোনো জিনিস নেওয়ার নামই চুরি এবং শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি শুভ হয় না। মনের ভেতরে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল কথাটা।

পরে একদিন কুল পাকার দিনে আমাদের বাসার কুলগাছটায় চড়েছিলাম। গাছটা বাসার চারপাশে পর্দার জন্য দেওয়া বাঁশের বেড়াটার পাশেই। অনেকগুলো কুল পাড়ার পর একটু দূরের শাখায় নজরে পড়ল একগোছা টকটকে হলুদ পাকা কুল, কিন্তু তার কাছে পৌঁছানো বড্ড কঠিন। ছোট্ট একটা শাখায় পা দিয়ে ওপরের আর এক শাখা ধরে ওগুলোর কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করলাম। চট করে পায়ের নিচের শাখাটা ভেঙে গেল, ওপরেরটায় ঝুলে কোনোমতে বড় কোনো শাখায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতেই সেটাও ভেঙে গেল মড় মড় করে। নিচে নতুন বাঁশের তৈরি বেড়ার ওপর গিয়ে পড়লাম উপুড় হয়ে। শরীরের দুই অংশ ঝুলে আছে দুপাশে। বাঁশের খোঁচায় পেট খানিকটা কেটে রক্ত ঝরল।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আমার চিৎকারে এবং গাছের নিচে ছোট বোন রিনার চিৎকারে হন্যে হয়ে ছুটে এলো সবাই। কোনো রকম নামিয়ে ওষুধপত্তর লাগিয়ে নিয়ে শোয়ানো হলো আমাকে। বকুনি ও আদর দুটোই চলল পালাক্রমে। কিছুদিন পরে আব্বা গেলেন প্রিন্সিপাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। অভিযোগ করলেন, আপনার স্কুলে ছেলে দিলাম এই আশায় যে সে শান্তশিষ্ট হয়ে তৈরি হবে। কিন্তু সে তো দিনে দিনেই দুরন্ত হয়ে উঠছে। বর্ণনা দিলেন তিনি আমার দুষ্টুমির বিভিন্ন ঘটনার। প্রিন্সিপাল সাহেব শান্ত স্বরে জবাব দিলেন— দুষ্টুমি করলে আরও দুষ্টুমির সরঞ্জাম কিনে দিন। অবাক হয়ে আব্বা বললেন, এটা কেমন কথা, ভালোর জন্য এলাম আপনার কাছে অভিযোগ করতে, আর আপনি কিনা উল্টো দুষ্টুমি যাতে বাড়ে, তাতে সহায়তা করতে বলছেন! জবাবে প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, দেখুন ভাই সাহেব, আমি এজাজ উদ্দিনও ডবল এমএ গোল্ড মেডেলিস্ট, আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তাই। কিন্তু দুরন্ত ছিল বলে সে আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী, আর শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষ বলে আমি হয়ে আছি এই প্রাইমারি স্কুলের গুরু ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল। আব্বা ফিরে এসে সবাইকে খাওয়ার টেবিলে এই গল্প শোনালেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আট

লক্ষ্মীপুরের অনতিদূরে ভবানীগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা। এটা নদীর মোহনা, তাই এর বিস্তৃতি এখানে বিপুল। নদীর মূল ধারার পাশে গজিয়ে উঠেছে ছোট-বড় নতুন পলির চর। বছরে একদিন আষাঢ়ের অমাবস্যার দিনে ভবানীগঞ্জে বসে বিরাট মেলা। কিন্তু মনি অমাবস্যার মূল আকর্ষণ মেলা নয়—মেঘনা। নদীতে এই দিনে আসে পাহাড়সমান উঁচু হয়ে জোয়ার, জলোচ্ছ্বাস বললেও ভুল হবে না। এই মহাপ্লাবন নদীর মূল ধারা ও পার্শ্ববর্তী নতুন চরগুলো প্লাবিত করে ফেলে মুহূর্তে। শিগ্‌গিরই স্ফীত নদীটা অন্তহীন সাগরে পরিণত হয়। আশপাশের এলাকায় মনি অমাবস্যা একটা উৎসবের দিন। এমনকি স্কুলগুলোও বন্ধ থাকে এই দিনে। এক মনি অমাবস্যায় আমরা ভবানীগঞ্জে গেলাম জোয়ার ও মেলা দেখতে। বাজার ও মেলা পার হয়ে পৌঁছালাম মূল নদীর তীরে। সামনে নতুন কাঁচা চরের বিস্তৃত সীমানার শেষে জোয়ার-পূর্ব মেঘনার পোষমানা প্রবাহ। সেখানে পৌঁছার জন্য আরও হাজারো মানুষের সঙ্গে পলিঢাকা কাঁচা চরে নেমে পড়লাম আমরাও। কিছু পরে দুখণ্ড চরের মাঝখানে নালার মতো খানিকটা নিচু জায়গা। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সেই শুকনো নালায় আটকা পড়ে আছে বড় বড় দুটি নৌকা। ওগুলো কী করছে এখানটায় কিছুতেই বুঝে এলো না। নালাটার পরও বিশাল চর। ফেরিওয়ালারা রকমারি খেলনা ও খাবার বিক্রি করছে। তবে স্থায়ী তো দূরে থাকুক, কোনো আধা স্থায়ী দোকানও নজরে পড়ল না। সবাই যার যার পণ্য-পসরা নিজের গায়ে ঝোলানো বাক্স বা থালায় বহন করে চলেছে। নদীর পাড়ের জনতার ভিড়ে গিয়ে যোগ দিলাম। কীসের যেন উন্মুখ প্রতীক্ষায় মেঘনার বিস্তৃত জলধারার দিকে চেয়ে আছে সবাই। একটু পরে প্রতীক্ষার অবসান হলো, জনতার মাঝ দিয়ে বয়ে গেল উত্তেজিত-আনন্দের তীক্ষ্ণ এক হিল্লোল। তর্জনী তুলে দূরে নদীর দিকে ইশারা করতে লাগল সবাই, চেয়ে দেখলাম তরতর করে এগিয়ে আসছে স্ফীত জলধারা। বুঝলাম, এটাই মনি অমাবস্যার জোয়ার। কিন্তু দূর থেকে খুব একটা বড় কিছু মনে হলো না। অথচ লোকজনকে দেখলাম চর ছেড়ে নদীতীরের দিকে ছুটে যেতে। বড়রা আমাদেরও ছুটতে নির্দেশ দিলেন। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোগ দিলাম। কিন্তু জোয়ার ধাওয়া করে এলো প্রচণ্ড বেগে। চরের উঁচু অংশ ছেড়ে তীরের নিকটের নিচু নালাটার কাছে আসতেই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। নালার চিহ্নমাত্র নেই, পরিবর্তে আমরা মুখোমুখি হলাম মস্তবড় এক স্রোতস্বতী নদীর। একটু আগের কাদামাটিতে আটকে থাকা নৌকা দুটো এখন সেই নদীর ধারায় সানন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। পেছনে প্রমত্তা মেঘনার বিপুল জলধারা ততক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে সারাটা চর। প্রমাদ গুনলাম, হেঁটে যাওয়া দূরে থাক, সাঁতার কেটেও এই তীক্ষ্ণ স্রোতা নদী পার হওয়া অসম্ভব মনে হলো। কিন্তু ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে স্ফীত হতে স্ফীততর করে তুলছে নদীটাকে। বড়রা নির্দেশ দিলেন তিলমাত্র বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাই করলাম, ঝাঁপিয়ে পড়ল জাফর আর আমজাদও। সাঁতার মোটামুটি ভালোই জানতাম, কিন্তু আমার যা কিছু ট্রেনিং, তা স্বচ্ছ-স্তব্ধ পুকুরে, এ ধরনের খরস্রোতা নদীতে নয়। দীর্ঘক্ষণ তাল সামলানো সম্ভব হলো না, স্রোত আমাদের উড়িয়ে-ডুবিয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে লাগল। তীর আর নৌকার ওপর থেকে লোকেরা প্রাণপণে চিৎকার করে আমাদের দিতে থাকল নির্দেশ-উপদেশ। বেশ কয়েকবার ডুবে-ভেসে শ্বাসরোধ হয়ে এলো প্রায়—গলাধঃকরণ করলাম রাজ্যের পানি। শেষ যখন ডুবলাম, তখন মনে হলো আর রক্ষা নেই। কিন্তু আমার বিদ্রোহী মন এত শিগ্গির পরাজয় মেনে নিতে সম্মত হলো না। আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের শেষ শক্তিবিন্দুটিও জড়ো করে পানির ওপরে ভেসে উঠে দেখি নদীতীরের কাছেই এসে গেছি। দু-তিনজন হাঁটুপানিতে নেমে হাত ধরে টেনে তুলল আমাদের তিন বন্ধুকে। রহমানুর রহিম আমাকে আজরাইলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে সহজে অব্যাহতি দিলেন।

স্কুলের পড়ার একটা প্রধান দিক ছিল আমাদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। আর এ ব্যাপারে স্কুল সত্যিই সফল হচ্ছিল পুরোপুরি। স্কুলের লাইব্রেরিতে ভরা ছিল আমাদের বয়সিদের পাঠোপযোগী অজস্র গল্পের বই, উপন্যাস আর ম্যাগাজিন। শুরুতে অবশ্য রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনি, জাদুকর, রাজা-রানি, রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প পড়তাম পাগল হয়ে। শিগ্গিরই পছন্দ পাল্টালাম—গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম গোয়েন্দাকাহিনির গল্প। কলকাতা থেকে প্রকাশিত চটি ডিটেকটিভ বইয়ের সিরিজ ছিল অনেকগুলো। এর একটি হলো *ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জির* সিরিজ, এর কত বই যে পড়েছি, তার সীমা নেই। তারপর পড়তে লাগলাম কিছুটা বড় কলেবরের *দস্যু মোহন*, *দস্যু বাহারাম* সিরিজ। এ ছাড়া ছিল ম্যাগাজিন। কলকাতা থেকে আসা শিশু-কিশোর পত্রিকা *শুকতারা* আর *মাসিক বসুমতী*। ঢাকার *সওগাত* এবং আম্মা ও আপার জন্য *বেগম* অবশ্য আমাদের বাসাতেই রাখা হতো। এর সবই পড়তাম। এ ছাড়া অন্যান্য উপন্যাস

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এমনকি বড়দার ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য বিদেশি বইয়ের অনুবাদ *আংকল টম'স কেবিন* এবং *দ্য ভিকার অব ওয়েকফিল্ড* ইত্যাদি কিছুই ছাড়তাম না।

এ পাঠ্যসূচিবহির্ভূত পড়ার নেশার কোনো তাৎক্ষণিক মুনাফা অবশ্য দেখা যেত না। তবে এতে মূল পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হতো সন্দেহ নেই। সুতরাং মুরুব্বিরা দুশ্চিন্তা করতেন আর এসব ছেড়ে স্কুলের পড়াশোনায় মন দিতে চাপ দিতেন নিয়মিত। আমি এতে একমত হতে পারতাম না বটে তবে এর সপক্ষে কোনো ভালো যুক্তিও দিতে পারতাম না। তাই লড়াইতে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা— সহায়হীন।

শিগ্‌গিরই এক পরিবর্তন এলো— শুভ পরিবর্তন বলা চলে। আব্বার অফিসের কাঠামোতে সংযোজন করা হলো নতুন এক পদ সৃষ্টি করে— রেভিনিউ সার্কেল অফিসার। একগোছা রাজস্ব অফিসের তদারক করবেন এই নতুন পদাধিকারী। আব্বা জানালেন, যিনি নতুন এই পদ নিয়ে আসছেন, তার নাম আবদুল মান্নান। অফিসের শেষ অংশে মেহমানদের জন্য রাখা বড় কামরাটা তৈরি করা হলো তার জন্য। এটা হবে একসঙ্গে তার অফিস ও আবাস। যে ভদ্রলোক এলেন, তিনি এক ছিমছাম আনকোরা যুবক— বয়স ২৬-২৭-এর বেশি নয়। দীর্ঘদেহী, আধুনিক পোশাক পরা অমায়িক এক মানুষ। আচার-আচরণে মান্নান সাহেব ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক, নামাজ-কালেমার ধার ধারতেন না— গান গাইতেন, গলা ছিল বেশ সুরেলা-মধুর। তার নিজের একটা হারমোনিয়ামও ছিল। অল্প দিনেই আমাদের সবাইকে আপন করে নিলেন তিনি। আব্বা তাকে মান্নান সাহেব ডাকতেন, তিনি ডাকতেন আব্বাকে ভাই সাহেব। আব্বাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখতেন তিনি। ফলে অনায়াসে তিনি হয়ে গেলেন আমাদের মান্নান কাকা। মান্নান কাকা আমার পড়াশোনারও তদারকি শুরু করলেন। তিনিই প্রথম আমার বিদ্যাসূচিবহির্ভূত, আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় পাঠের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিলেন। এ ধরনের পাঠে উৎসাহই শুধু জোগালেন না, বরং আরও বইপত্র জোগাড় করে দিতে লাগলেন, আর পঠিত গল্প বা বিষয় নিয়ে আলোচনায়ও উৎসাহভরে অংশ নিতেন। আব্বাকেও তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে এ ধরনের অতিরিক্ত পঠন ভাষা-দক্ষতা, চিন্তার বিকাশ ও জ্ঞানের উন্মেষে বিরাট ভূমিকা রাখে। মান্নান কাকার বুদ্ধিবৃত্তিকে শ্রদ্ধা করতেন আব্বা, তিনি আর আপত্তি করলেন না। শুদ্ধ-মার্জিত বাংলা কথোপকথনের যে অনায়াস দক্ষতা আমি অর্জন করেছিলাম, এটার দারুণ কদর করতেন মান্নান কাকা। বিশেষত পরিবারের অন্য কেউ যখন আমাদের আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করতেন, এমনকি চেষ্টা করলেও তারা উচ্চারণ থেকে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ এড়াতে পারতেন না, তখন তার চোখে আমার এই দক্ষতা অনন্য-ব্যতিক্রমী ছিল। বড় ভাইবোনদের তিনি লজ্জা দিতে ছাড়তেন না। বলতেন, দেখো মনজু কেমন সুন্দর রেডিওর মতো বাংলা বলে, তোমরা ওর মতো বাংলা বলতে পার না? রেগেমেগে তারা বলতেন, নিশ্চয়ই পারি। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। মান্নান কাকা বললেন, ঠিক আছে, আগামীকাল সারা দিন আমি তোমাদের সব কজনের কথাবার্তা খেয়াল করে শুনব এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ড রাখব, যে সারা দিনে একটা নোয়াখালীর আঞ্চলিক শব্দ বা উচ্চারণ ব্যবহার করা ছাড়া কথোপকথন চালাতে পারবে, সে প্রথম পুরস্কার পাবে। পরদিন আমার অন্তত সারা দিন প্রতিযোগিতার কথা মনে ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে আমাদের সবাইকে নিয়ে বসলেন মান্নান কাকা। একে একে সবার ফলাফল শোনালেন। বড় ভাইবোনরা বেশ আশাহত হলেন তাদের অশুদ্ধ শব্দ ও উচ্চারণ ব্যবহারের সংখ্যা শুনে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, মনজুর কিন্তু একটাও ভুল হয়নি। বড়দের তিনি অবশ্য আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, মনজুর সুবিধা হলো তার স্কুল এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেয়। তা ছাড়া তার বইপড়ার বাতিক আছে, এটা তাকে প্রচুর সাহায্য করছে। তোমরাও বই পড় আর অভ্যাস করতে থাক, ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।

মান্নান কাকার বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়। তার দুটো সুন্দর ফুটফুটে ছেলে ছিল— আলম আর সালেহীন। চাচির আর তাদের দুজনের ফটো দেখাতেন তিনি আর তাদের অনেক গল্প করতেন। একবারও না দেখে শুধু বর্ণনা শুনেই যে মানুষ মানুষকে চিনতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ আলম আর সালেহীন। তাদের সম্বন্ধে আমি যতটা জানতাম, তাদের আপনজনেরাও বোধকরি অতটা জানত না। মান্নান কাকা প্রায়ই পরিবার-পরিজন দেখতে বাড়ি যেতেন। একবার এরকম এক ছুটিতে গেলেন তিনি দিন দশেকের জন্য, কিন্তু দশদিন পার হয়ে পনেরো এবং পনেরোর পর বিশ পার হয়ে গেল— তার কোনো খোঁজ নেই। আব্বা চিন্তিত হলেন, আমিও অস্বস্তি বোধ করলাম। হঠাৎ একদিন তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো— 'সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে, শিগগিরই আসছি।' সপ্তাহ ছয়েক পর এলেন তিনি। তার দিকে তাকানো যায় না— সেই আন্তরিকতায় উচ্ছল সদাহাস্যময় চমৎকার মানুষটা যেন রাতারাতি রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এক দুমড়ে-থ্যাঁতলে যাওয়া বিধ্বস্ত মানুষে। স্তব্ধ-বিষণ্ণতার এমন বাস্তব প্রতিকৃতি আমি আগে কোনোদিন দেখেনি। মুখ খোলার আগেই তার চোখে নামছিল বাঁধনহীন অশ্রুধারা। পুরুষ মানুষকে এভাবে আর শুধু একবার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কাঁদতে দেখেছি— তা হলো আমাদের নতুন বাড়ির সুরুজ কাকাকে (কাজী নুরুল হুদা চৌধুরী)। তার বড় ছেলে বাবু ভাইজানের মৃত্যুর পর চোখের জল মুছতে তিনি ডজন ডজন রুমাল ভিজিয়েছিলেন। অশ্রুভেজা চোখে মান্নান কাকা জানালেন যে তিনি তার বড় ছেলে আলমের জন্মদিন পালন করতে দেশে গিয়েছিলেন। উৎসব অনুষ্ঠানের পর হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্রমাগত দাস্ত-বমিতে মৃতবৎ হয়ে গেল সে। পরদিন সালেহীনেরও শুরু হলো একই অবস্থা। ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন— কলেরা। বরিশালের প্রত্যন্ত পল্লিতে সেকালে কীই-বা চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল! তাছাড়া সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা যা, ঘটবে তো তা-ই। তিন দিনের ভেতরেই পাঁচ ও ছয় বছরের নয়নজুড়ানো দুটি শিশু ছেড়ে চলে গেল এই সুন্দর ধরাতল। সর্বোপরি শোকসাগরে ভাসিয়ে গেল তাদের স্নেহময় মা-বাবাকে। মান্নান কাকাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হলো না, যে কোনো প্রচেষ্টাই তার অন্তরের অর্ধ-প্রচ্ছন্ন বেদনার আগ্নেয়গিরিটা যেন নতুন করে উচকিয়ে দিচ্ছিল মাত্র। কথায় আছে— সময় সর্বোত্তম উপশমকারী। হলোও তাই, ধীরে অতি ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন মান্নান কাকা। কিন্তু তারপরও সেই পুরাতন উচ্ছল-প্রাণবন্ত মানুষটা যেন চিরতরে গেল হারিয়ে। বিষাদভরা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হলো তার সারা জীবন। এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্য পরে শুনেছি। দুই পুত্রের জন্মের পর প্রগতিবাদী এই মানুষটি সানন্দে প্রগতির মন্ত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ বরণ করে নতুন কোনো সন্তানের জনক হওয়ার পথ রোধ করে দিয়েছিলেন চিরতরে। কী দারুণ, কী কঠোর এই বোধোদয় যে— জন্ম-মৃত্যুর পরিকল্পনার ভার সৃষ্টিকর্তার ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত— দুর্বল মানুষের এসব ক্ষেত্রে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মান্নান কাকা নামাজ-রোজা ধরলেন।

মান্নান কাকার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল অনেক দিন পর— আমার কলেজজীবনের শুরুতে। আব্বা খবর দিলেন, মান্নান কাকা ফেনীতে বদলি হয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম বিশাল দুর্গের মতো নির্মিত পাদরি কুঠিতে, যা তখন ব্যবহৃত হচ্ছিল ফেনী মহকুমা রেভিনিউ অফিস হিসেবে। মান্নান কাকাকে দেখে চেনাই মুশকিল। সেই সাহেবি পোশাক পরা স্মার্ট লোকটার জায়গায় বসে আছেন লম্বা পাঞ্জাবি-পাজামা ও গোলটুপি আর দীর্ঘদাড়িশোভিত প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষ। আমিও বদলে গেছি অনেক— লক্ষ্মীপুরে দেখা সেই বালক-মনজুর জায়গায় লম্বা-ঢেঙ্গা এক যুবককে দেখে তারও চিনতে কষ্ট হলো কি না, জানি না। যা-ই হোক, কথাবার্তা শুরু হলো প্রচণ্ড উৎসাহে। অনেক কিছু জানতে চাইলেন মান্নান কাকা। আমি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অনর্গল বক্ বক্ করে চললাম। হঠাৎ মনে হলো মান্নান কাকা শুধু চুপ করে শুনছেন— বলছেন না কিছুই। আমি উৎকণ্ঠিত চোখে তাকালাম তার দিকে। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মান্নান কাকা বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! এমন সুন্দর বাংলা তুমি কেমন করে হারিয়ে ফেললে?' মনে পড়ল লক্ষ্মীপুরের কথা। আমার বাংলা বলা যে বদলে গেছে, এই প্রথম তা টের পেলাম। দারুণ লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

লক্ষ্মীপুরে আমাদের পরিবারে নতুন আরও সংযোজন হলো— প্রথম বছরে জন্ম নিল বোন বিজু (কামরুননাহার বেগম চৌধুরানী)। দুই বছর পর ভাই হেলাল (মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী)। এ ছাড়া খুশির উৎসব এলো আরও, হাতিয়া থেকে আমাদের সঙ্গে আসা কাজের মেয়ে বুক্কি তখন বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। আব্বা খুঁজে পেতে তার জন্য বিয়ের এক সম্বন্ধ স্থির করলেন। হাতিয়ায় লোক পাঠিয়ে বুক্কির মা-বাবাকেও আনা হলো। বিয়ে হয়ে গেল তার। বুক্কি চলে যাওয়ার পর ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্য দেশের বাড়ি থেকে আনা হলো মছুদাকে। সে আমাদের পরিবারের কাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিবারের জুনু জ্যাঠার ছেলে মুন্নাফের স্ত্রী আর জইদা বু'জার ননদ। দীর্ঘদেহী সুন্দরী এই যুবতীকে চৌধুরীবাড়ির মেয়ে বলেও চালিয়ে দেওয়া যেত অতিসহজে। মছুদার কাজে পরিবারের সবাই সন্তুষ্ট হলো।

কিছুদিন পরে এলো বড় আপার বিয়ের প্রস্তাব। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে— ভবানীগঞ্জের পথে ছোট্ট এক গ্রাম পেয়ারাপুর। এই গ্রামের মওলানা আব্দুর রব সাহেবের প্রথম পুত্র মোহাম্মদ মোহসিন করাচিতে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরি করতেন। সব দিক থেকে আব্বা এই সম্বন্ধ (আব্বা পারিবারিক অভ্যাসগত ব্যবহার করতেন ফারসি শব্দ 'খেশি') অত্যন্ত উপযোগী বলে সাব্যস্ত করলেন। অন্তত আমার পরির মতো সুন্দরী বড় আপার সঙ্গে এই ফরসা সুদর্শন যুবক চমৎকার মানাবে— এ ব্যাপারে পরিবারের কারোর কোনো সন্দেহ রইল না। আপার দিকে অবশ্য আরও লোকের নজর থেকে থাকবে। ফলে সমাজের তৎকালীন হীনম্মন্যতা অনুযায়ী কেউ বেনামি চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল। তবে উভয় পক্ষই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়ে সংশয়ের ধূম্রজাল পেরিয়ে এগিয়ে গেল। ধুম লেগে গেল উৎসব-আয়োজনের। আব্বা বড় করে জিয়াফতের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটা গরু ও ছাগল কেনা হলো, আব্বার অফিসের স্ট্রং রুমে পাটের শিকায় ঝোলানো হলো বিরাট বিরাট কয়েকটা মাটির হাঁড়ি। এগুলোর তলায় সরু ছিদ্র করে তাতে এক

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

খণ্ড খড়ের চুঙ্গি লাগিয়ে দেওয়া হলো। তারপর এক টুকরো তাজা দই রেখে তার ওপর প্রতিদিন কিছু কিছু করে ঢালা হলো মোষের দুধ। এই প্রক্রিয়ায় দই জমে গিয়ে খড়ের চুঙ্গি দিয়ে নিষ্কাশন হয়ে যেত পানিটুকু। শেষ পর্যন্ত মিলত হাঁড়িভর্তি ঘনবদ্ধ সুস্বাদু দই। এ দই উপুড় করে ঢেলে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় বয়ে নেওয়া সম্ভব। 'গামছা বাঁধা দই' নামটা বোধহয় এখান থেকেই এসেছে। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আপার। এই আনন্দঘন মুহূর্তেও পরোক্ষ একটা করুণ সুর বাজছিল বড়দের মনে। আমার জান্নাতবাসী মায়ের অভাব বোধকরি প্রকট হয়ে উঠছিল আব্বার এবং আপার মনে। আম্মার রেখে যাওয়া একসেট গয়নায় সাজানো হলো বড় আপাকে। আপার বিয়ের পর আমরা পেয়ারাপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে গেলাম। আপার শ্বশুর একজন নামকরা আলেম, অবশ্য অবস্থাপন্ন পরিবারের প্রধান হিসেবে তাকে জীবিকার্জনের জন্য তার শিক্ষা ব্যবহার করতে হতো না। প্রধানত বাড়িতেই থাকতেন তিনি। নিকটবর্তী দ্বীপ টুমচরের প্রখ্যাত মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো ডেকে নিতেন তাকে— আলোচনা-পরামর্শের জন্য।

লক্ষ্মীপুরের আশপাশে দর্শনীয় স্থান ছিল কিছু। পূর্ব-উত্তর দিকে শহরের মাইল দুয়েক দূরে গ্রামের ভেতরে ছিল একটা মস্তবড় বটগাছ। প্রচুর লোক আসত চারদিক থেকে এই গাছটা দেখতে। তবে দর্শনীয় বস্তু গাছটা নয়, মূল আকর্ষণ ছিল এর আশ্চর্য শিকড়গুলো। পাতলা কাঠের তক্তার মতো চ্যাপ্টা হয়ে চারদিকে এই শিকড়গুলো টিলার মতো উঁচু হয়ে গাছের কাণ্ডটা প্রায় গ্রাস করে আছে। কোনো গাছের শিকড় অমন অদ্ভুতভাবে গজাতে দেখা দূরে থাক, কেউ কোনোদিন বোধহয় শোনেওনি। উদ্ভিদতত্ত্বের তেমন কোনো বিশেষজ্ঞ তখন দেশে সম্ভবত ছিলও না, আর থাকলেও অমন প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ে তারা হয়তো তখনো পৌঁছায়নি। ফলে ব্যাপারটার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো তখনো মেলেনি। তবে এ ধরনের বিস্ময়ের মুখোমুখি হলে সরল মানবমনে সৃষ্টি হয় এক অব্যক্ত অনুভূতি। নিজের ক্ষুদ্রতার স্বীকৃতি হিসেবে সে শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়ায়— হয় গাছের সৃষ্টিকর্তার কাছে, নয়তো গাছটার কাছে। স্থানীয় হিন্দুরা এই গাছের অদ্ভুত শিকড়গুলোতে নিবেদন করত ভক্তিপূর্ণ পূজার অর্ঘ্য। তেমন এক হিন্দু তিথিতে এই গাছের কাছে বসত মেলা। এমনি এক মেলার দিনে আমরা গিয়ে হাজির হয়েছিলাম গাছটা দেখতে।

উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর থেকে রায়পুরে যাওয়ার আধাআধি রাস্তায় ছিল আর এক ছোট্ট জনপদ— দালালবাজার। বাজারটাতে ঢোকার আগেই পড়ত এক

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পতিত জমিদারবাড়ি, দালালবাড়ি বা দালালবাজার জমিদারবাড়ি নামেই পরিচিত ছিল। সরকারি রাস্তা থেকে সোজা এক পথ চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত। পথের শেষে বিশাল এক দিঘি। স্বচ্ছ পানিতে কানায় কানায় ভরা সে দিঘির প্রায় তীর ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদতুল্য মনোরম এক দালান। কাছে এলে বোঝা যায় দালানটা পরিত্যক্ত। কোথাও কোথাও পুড়ে যাওয়া কালো চিহ্ন, কোনো কোনো জানালা-দরজা ভাঙা। কথিত আছে, এ বাড়ির জমিদার শুরুতে গরুর দালালি করেই সম্পদশালী হয়েছিলেন। পরে প্রচুর উন্নতি করেন শিক্ষা-দীক্ষায়। এমনকি দু-একজন বিলাতফেরতও গেলেন এই বাড়িতে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ হিসেবে উদারচেতা ছিলেন তারা। কিন্তু স্বাধীনতার ক্রান্তিকালে এসব পরিচয়ও কাজে আসেনি। কলকাতা ও বিহারে মুসলিম নিধনযজ্ঞের প্রতিবাদে অন্যদের মতো এই জমিদারেরাও পাল্টা দাঙ্গার অন্ধ উন্মত্ততার শিকার হয়ে শেষ নাগাদ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে একের দোষে অন্যকে হননের এই প্রাচীন পাশবিকতাকে অনেকে ধর্মীয় রং দেন। কিন্তু ধর্ম তো এসেছে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটাতে।— এই হিংস্রতার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কোথায়?

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নয়

মনের অজান্তেই কখন জানি লক্ষ্মীপুর আপন করে নিয়েছিল আমাদের। বাল্যজীবনের সরলতায় আমরাও আপন করে নিয়েছিলাম সুন্দর এই মফস্বল শহরটাকে। আপন করে নিয়েছিলাম খেলার সাথি-সহপাঠীদের। এটা যে প্রবাস, আর একদিন যে এর মায়াও ছাড়তে হবে— এই বোধ পুরোপুরি লোপ পেয়ে গিয়েছিল আমার। ভুলে গিয়েছিলাম হাতিয়া, গ্রামের বাড়ি আর বামনী ছেড়ে আমার বেদনাবিধুর অনুভূতি। এভাবে ক্ষণিকের পারিপার্শ্বিকতার মোহজালে জড়িয়ে পড়ে বৃহৎ চিত্র ভুলে যাওয়াই বোধ হয় মানুষের বিধিলিপি— এর নামই বোধ করি সংসার। স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হলো না— আবার এসে হাজির হলো আব্বার বদলির ফরমান। এবার অন্যদিকে— ফেনী শহর আর ছাগলনাইয়া পেরিয়ে, সীমান্তের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের কাছাকাছি— পাহাড়ের পাদদেশে— চাঁদগাজীতে।

চাঁদগাজী আমার এক পূর্বপুরুষের নামও ছিল। কিন্তু এই স্থান নাম নিয়েছে অন্য এক ঐতিহাসিক নায়কের নাম থেকে।— এই অঞ্চলের বীর জমিদার শমশের গাজীর দুর্বার সেনাপতি চাঁদগাজীর নামে। শমশের গাজী, চাঁদগাজী ও সোনাগাজী মিলে ত্রিপুরার মুঘল দস্তাবেজে ত্রিপুরা রাজ্যের নাম হলো পরগনা চাকলা-রওশনাবাদ। আব্বার অফিসের পুরোনো কাগজপত্রে তখনো মহারাজার এবং পরগনার নাম ছিল। এই নামেরও এক ইতিহাস আছে। মগ মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের আগ্রাসী হামলার বিরুদ্ধে যেসব বীর গাজী গোটা ফেনী অঞ্চল পরিণত করেছিলেন এক অপরাজেয় দুর্গে, আজও ফেনীর বিভিন্ন এলাকা এসব প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম বহন করছে। ফেনীর দক্ষিণে সোনাগাজী আর এই উত্তরে চাঁদগাজী, এখান থেকে কিছু মাইল দূরে চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তে জমিদার শমসের গাজীর এক কালের রাজধানী শমসেরনগর সেই ইতিহাসের স্বাক্ষর আজও বহন করে চলেছে। মা কৈয়ারা বিবির নামে শমশের গাজী এখানে কেটেছেন স্ফটিক স্বচ্ছ জলের বিশাল কৈয়ারা দিঘি। মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আগ্রাসী হামলার বিরুদ্ধে এক বাহিনী গঠন করে শমসের গাজী বীরদর্পে প্রথমে প্রতিরোধ, তারপর প্রচণ্ড পাল্টা হামলা চালিয়ে মহারাজাকে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর প্রান্তে ‘উদয়পুর’ পার করে দেন। তাই ফেনী অঞ্চলে যেকোনো পাল্টা হামলা বোঝানোর জনপ্রিয় অভিব্যক্তি হলো— ‘পিডি উদুপুর পার করি দিমু’ অথবা ‘পিটিয়ে উদয়পুর পার করে দেবো’।

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

চাঁদগাজী হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাজারটার একপ্রান্তে আব্বার অফিসের বিরাট কম্পাউন্ড। মস্ত একটা দিঘির পাড়ে মাঠের শেষে একতলা বাংলো ধরনের দালানে অফিস, তারপর আমাদের বাসা। আর একটা ছোট বাইরের ঘর অন্য কর্মচারীদের ও আমাদের গৃহশিক্ষকের থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। স্কুলের এক শিক্ষক আবু তাহের সাহেব ছিলেন আমাদের গৃহশিক্ষক। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ছয় মাইল দূরের ছিলনিয়ার প্রখ্যাত মাওলানা ইদ্রিস সাহেবের ছেলে তিনি। মাওলানার ছেলে হিসেবে ইসলামের প্রতি যেমন অনুরাগ থাকার কথা, তেমনটা তার ছিল না, তবে শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন চমৎকার। সমতলভূমির শেষে যেখানে পাহাড় ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করে, তেমন এক জায়গা এই চাঁদগাজী। ছোট পাহাড়ের স্থানীয় নাম টিলা, চারদিকে এমনি অসংখ্য টিলা ক্রমশ উঁচু হতে হতে মাইল কয়েক দূরে পাহাড়ে গিয়ে মিলেছে। টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে এখানে-ওখানে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ-সরু জলধারা, নদীও নয়, খালও নয়— এরও একটা স্থানীয় নাম আছে— তা হলো ছরা, আরবি ভাষায় বোধ করি একেই বলা হয় নহর। এগুলোর পানি এতই স্বচ্ছ যে তলায় পড়ে থাকা নুড়িগুলো ওপর থেকেই গোনা যায়, উপভোগ করা যায় রংবেরঙের রকমারি মাছের চঞ্চল সন্তরণ। পানির স্বচ্ছতা অবশ্য মাছের জন্য বিপজ্জনক— ওপর থেকে পাখির দল তাক মেরে থাকে প্রথম সুযোগেই ছোঁ মেরে শিকার করে নেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাই তার অন্তহীন করুণায় পারিপার্শ্বিক আসবাব, যেমন— শেওলা-গুল্ম বা নুড়ি পাথরের সঙ্গে সংগতি রেখে মাছগুলোর দেহ-সংগঠন আর রং নির্বাচন করেছেন, যাতে তারা শিকারি পাখির শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে জীবন নির্বাহ করে যেতে পারে। মূল পাহাড়টা কিন্তু এ দেশে নয়— পাহাড়ের ঠিক পাদদেশেই— চাঁদগাজী থেকে মাইল তিনেক দূরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত। পাহাড়টা পড়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরার এক অংশ অবশ্য পাকিস্তানেও পড়েছে। বর্তমান কুমিল্লা জেলাও ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত ত্রিপুরা নামেই অভিহিত ছিল। ভারতীয় ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য হলো— পাক-ত্রিপুরার মতো এটা সমতল নয়, এর প্রায় সবটুকুই পাহাড়-পর্বতে ভরা। তাই এর আর এক নাম পার্বত্য ত্রিপুরা।

এত কাছে অথচ এত দূরে, রাজনৈতিক সীমানা তাই চাঁদগাজীর মানুষের কাছে পাহাড়টাকে করে রেখেছে এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ। বন-বনানীঢাকা পাহাড়টা রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের নিচে মনে হতো এক আবছা মেঘের সারির মতো। আগন্তুক আমি। আমার কিশোর মনকেও হাতছানি দিয়ে ডাকত এই পাহাড়। যারা এর গা ঘেঁষে জন্মেছে, তাদের মনে কেমন আলোড়ন হতো তা সহজেই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অনুমেয়। এই এলাকার ভূগোল, এই পরিবেশের ওপর পাহাড়ের প্রভাব অপরিসীম। এর মাটি, গাছপালা, লতাগুল্ম, তরকারি-আনাজ, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ— সবকিছুতেই কয়েক মাইল দূরের সমতল ফেনীর সঙ্গে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য নজরে পড়ে। সীমান্তের বাধা সৌন্দর্যসন্ধানীদের ঠেকাতে পারলেও উপার্জনসন্ধানীদের পারত না। দলে দলে কাঠুরিয়া আর কাঠ ব্যবসায়ীরা নিত্যদিন ওপার থেকে কেটে নিয়ে আসত কাঠের পসরা, পরিবর্তে এপার থেকে তারা বয়ে নিয়ে যেত মূল্যবান শস্যসম্ভার। এ ছাড়া নিয়মিত উৎকোচ দিতে হতো ভারতীয় ও পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীদের। চোরাচালানে অংশগ্রহণকারী চোরের পার্টি একাধিক।

লক্ষ্মীপুরে যে উঁচু মানের শিক্ষা পেয়েছি, সেই তুলনায় চাঁদগাজী ছিল যথেষ্ট পিছিয়ে তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাযোগ্যতায় সব শিক্ষক লক্ষ্মীপুরের সমমানের ছিলেন না, তবে ছাত্রদের যথাসম্ভব উপাদেয় বিদ্যার্জনে সাহায্য করার অপরিসীম আগ্রহ দিয়ে এই অভাব পূরণ করার ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে যেতেন তারা। ক্লাসের পড়ার বাইরে পড়াশোনার যে অভ্যাস লক্ষ্মীপুরে সৃষ্টি হয়েছিল, তা পুরোপুরি বজায় ছিল চাঁদগাজীতে। এখানে অবশ্য স্কুলের পড়ার চাপ তুলনামূলক কম থাকায় এসব অতিরিক্ত পাঠের সুযোগ মিলত প্রচুর। শিগ্‌গিরই পাঠ্যসূচির বাইরে পড়ার অভ্যাসটা যেন এক নেশায় পরিণত হলো। সেকালের রেডিও-টেলিভিশনের উপদ্রবমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন অবসর মুহূর্তগুলো এই পাঠের অভ্যাস ভরিয়ে রাখত। মুরুব্বিদের পূর্ণ অনুমোদন এতে ছিল বলা চলে না, তবে মন্দের ভালো হিসেবে একটা সীমা পর্যন্ত এটা বরদাশত করতে আপত্তি ছিল না তাদের। অসন্তুষ্টির কারণ ঘটত শুধু তখন, যখন সাধারণ অভ্যাসের সীমা ছড়িয়ে এই নেশা স্কুলের পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। মনে আছে, সারা রাত জেগে পড়ছি দেখে আব্বা প্রচণ্ড খুশি হতেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি সন্দিহান হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, এই বিনিদ্র তিতিক্ষা সম্ভবত সর্বাংশে পাঠ্যসূচিভুক্ত জ্ঞান সাধনা নয়। তাই মাঝেমধ্যে তিনি তদন্তে বেরোতে শুরু করলেন। গরমের দেশ, তাই দরজা খোলা রেখেই টেবিলে হারিকেনের আলো উঁচু করে দিয়ে পড়তে বসতাম। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে সময় এত কম লাগত যে, গল্পের বই লুকিয়ে পাঠ্যবই খোলার সুযোগ মিলত না। কিন্তু প্রয়োজন উদ্ভাবনের জন্ম দেয়— কিছু নতুন সৃষ্টিধর্মী চিন্তার সাহায্য নিতে হলো আমাকে। সামনের আধখোলা ড্রয়ারে পাঠের বইটা খুলে রাখতাম আর মগ্ন থাকতাম সামনে খোলা গল্প-উপন্যাসের ভেতর। আব্বার খড়মের আওয়াজ শুনতেই বই পরিবর্তন হয়ে যেত নিমেষে, সন্তুষ্ট হয়ে বিছানায় ফিরে যেতেন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তিনি। বই পড়ার নেশা এমনই পেয়ে বসল যে আমার বয়সের পাঠোপযোগী প্রায় সব বই পড়ে শেষ করে ফেললাম স্কুল লাইব্রেরির। বাড়তি বিপদ দেখা দিলো লাইব্রেরিয়ানকে নিয়ে। পৃথক একজন লাইব্রেরিয়ান রাখার ক্ষমতা ছিল না স্কুলের, তাই সামান্য বাড়তি মাসোহারা দিয়ে স্কুলের এক শিক্ষক মৌলবি আবুল বাশার সাহেবকে এ কাজ দেওয়া হয়েছিল। বিরতির সময় অথবা ছুটির পরে বই বিতরণ করতেন। তিনি নিজেও বই পড়তেন খুব। ফলে বিষয়বস্তুর ওপর তার সামগ্রিক ধারণা ছিল। একদিন বই চাইতে গেলে তিনি জানালেন যে আমার উপযোগী আর কোনো বই বাকি নেই। আমি দেখালাম অন্যান্য বই, যা আমি এখনো পড়িনি। বাশার সাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, এসব পড়ে তুমি বুঝবে কি? আমি জোর দিয়ে বললাম, বুঝব ঠিকই, আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে রাজি হলেন তিনি। আমাকে অনুমতি দিলেন বই নির্বাচন করার জন্য। নির্বাচন করলাম অনুবাদ— ফরাসি লেখক রোঁমা রোলার *জাঁ ক্রিসতফ*।[৩] তিন কারণে এই সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমত, আমার সোজা সামনেই *জাঁ ক্রিসতফ*-এর ছয় খণ্ড অনুবাদ শোভা পাচ্ছিল— বেশি খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। দ্বিতীয়ত, দেশি বড়দের উপন্যাস পড়তে চাইলে মৌলবি সাহেব রাজি হন কি না— এ ব্যাপারেও সন্দেহ ছিল। সর্বোপরি এ বইয়ের ছয় খণ্ড, একটা পড়তে দিলে বাকি পাঁচ খণ্ড পড়তে দিতে তিনি মানা করতে পারবেন না— এই আশাও ছিল। ভ্রূ কুঁচকে খানিকটা অনিশ্চয়তার সুরে অনুমতি দিলেন বাশার সাহেব। বললেন, 'ঠিক আছে, দু-সপ্তাহ সময় দিলাম, যদি প্রথম খণ্ড শেষ করে এসে আমাকে এর সারাংশ শোনাতে পারো, তবে বাকিগুলো পড়তে দেবো।' আনন্দে নেচে উঠল মনটা, গলায় খানিকটা বিনয় ঠেলে বললাম— দু-সপ্তাহ লাগবে না ইনশাআল্লাহ। সেদিন রাতেই মহা-উৎসাহে পড়তে শুরু করলাম, শেষ হয়ে গেল পরদিন। ঠিক করলাম, এত জলদি ফেরত দেবো না, পাছে স্যার স্কুলের পড়ার ক্ষতি করে গল্পের বই পড়ছি বলে দোষ দেন! চতুর্থ দিনে ফেরত নিয়ে গেলাম। আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'এত জলদি নিয়ে এসেছ? পড়েছ তো সবটা?' মাথা নেড়ে ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন করলেন কিছু। অনায়াসে জবাব দিয়ে দিলাম সব কটির। এবার তিনি শুধু আশ্বস্তই নন, বরং দারুণ উৎসাহিত হলেন এই ভেবে যে, আমি শুধু যে বইটা পড়েছি তা-ই নয়, বরং এই মানের বা এর থেকে উঁচু মানের বই পড়েও হজম করার যোগ্যতা

৩. Romain Rollan (১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ১৯১৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রাখি। দ্বিতীয় খণ্ড *জাঁ ক্রিসতফ* আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এখন থেকে লাইব্রেরির যেকোনো বই নিতে তোমাকে কেউ আর মানা করবে না।' মনে আছে, স্কুল লাইব্রেরির সমস্ত সংগ্রহ পড়ে শেষ করতে আমার বেশি দিন লাগেনি।

স্কুলে বন্ধুও জোগাড় হয়ে গেল অনেক। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল দুজন— বাশার স্যারের ছোট ভাই লম্বা-ঢেঙ্গা আবদুস সোবহান ও ক্লাসের ফার্স্ট বয় কুচকুচে কালো আবু তৈয়ব। কালো মানুষের গায়ের রং ভেদ করেও যে প্রতিভার দীপ্তি চেহারায় ফুটে উঠতে পারে, তা প্রথমবারের মতো লক্ষ করেছিলাম এই আবু তৈয়বের মধ্যে, আর এর পূর্ণ বিকিরণ দেখেছি অনেক পরে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে শহিদ আবদুল মালেকের প্রাতঃস্মরণীয় অবয়বে। সেই প্রসঙ্গ অবশ্য পরে আসবে। এই দুজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের মুখ্যকারণ ছিল ভিন্ন— তাদের অফুরন্ত রসবোধ— ইংরেজিতে বললে 'হিউমার'। আমার লক্ষ্মীপুরের বন্ধু জাফর, আমজাদ ও হারাধন চক্রবর্তীর মতো এরা দুজনও হাসত প্রচুর। পরে অবশ্য লক্ষ করেছি, অনেকটা অজান্তেই এই রসবোধটা সারা জীবন আমার বন্ধু নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষ্মীপুরের মতো চাঁদগাজীতে কয়েকজন হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রফুল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ভট্টাচার্য হিসেবে হারাধনের মতো সে-ও পৈতা পরত। সাদা ধবধবে ধুতি পরে খালি গায়ে পৈতা গাছা পরে সে যখন পূজার জন্য মন্দিরে যেত, চমৎকার লাগত তখন তাকে। স্বকীয়তাবোধের মধ্য দিয়েই কেমন করে মানুষের সহজ-স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে— এ যেন তারই উত্তম উদাহরণ। অবশ্য সবকিছুরই একটা স্থানকালের বিচার আছে, পরিবেশ বদলে গেলে তার সঙ্গে উপস্থাপনাও বদলাতে হয়। না হলে এক আঙ্গিকে যাকে স্বাভাবিক মনে হয়, অন্য আঙ্গিকে তা দৃষ্টিকটু এমনকি হাস্যকরও মনে হতে পারে।

ছোট হলেও লক্ষ্মীপুর ছিল এক শহর। সেই তুলনায় চাঁদগাজীকে সীমান্তবর্তী এক নিভৃত পল্লি অঞ্চল বলা যেতে পারে। শহুরে ব্যস্ততার বদলে এখানে আছে ধীর-মন্থর গ্রামীণ অলস প্রশান্তির আমেজ। সাড়া জাগানো কোনো কিছু এখানে ঘটত নিতান্ত কালেভদ্রে। এমন কিছুর প্রথম প্রতিশ্রুতিতেই অধীর প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম আমরা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক যা কিছু ঘটত, তার প্রায় সবই ঘটত আমাদের স্কুলকে কেন্দ্র করে— হোক তা স্বাধীনতা দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী অথবা কোনো হিন্দু পার্বণ উদ্‌যাপন বা স্কুল ইনসপেকশন উপলক্ষ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী বা নাট্যানুষ্ঠান। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে গঠিত হতো বিশেষ কমিটি আর প্রাণপণে কাজ করে যেত তারা। এই

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

রাখি। দ্বিতীয় খণ্ড *জাঁ ক্রিসতফ* আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এখন থেকে লাইব্রেরির যেকোনো বই নিতে তোমাকে কেউ আর মানা করবে না।' মনে আছে, স্কুল লাইব্রেরির সমস্ত সংগ্রহ পড়ে শেষ করতে আমার বেশি দিন লাগেনি।

স্কুলে বন্ধুও জোগাড় হয়ে গেল অনেক। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল দুজন— বাশার স্যারের ছোট ভাই লম্বা-ঢেঙ্গা আবদুস সোবহান ও ক্লাসের ফার্স্ট বয় কুচকুচে কালো আবু তৈয়ব। কালো মানুষের গায়ের রং ভেদ করেও যে প্রতিভার দীপ্তি চেহারায় ফুটে উঠতে পারে, তা প্রথমবারের মতো লক্ষ করেছিলাম এই আবু তৈয়বের মধ্যে, আর এর পূর্ণ বিকিরণ দেখেছি অনেক পরে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে শহিদ আবদুল মালেকের প্রাতঃস্মরণীয় অবয়বে। সেই প্রসঙ্গ অবশ্য পরে আসবে। এই দুজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের মুখ্যকারণ ছিল ভিন্ন— তাদের অফুরন্ত রসবোধ— ইংরেজিতে বললে 'হিউমার'। আমার লক্ষ্মীপুরের বন্ধু জাফর, আমজাদ ও হারাধন চক্রবর্তীর মতো এরা দুজনও হাসত প্রচুর। পরে অবশ্য লক্ষ করেছি, অনেকটা অজান্তেই এই রসবোধটা সারা জীবন আমার বন্ধু নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষ্মীপুরের মতো চাঁদগাজীতে কয়েকজন হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রফুল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ভট্টাচার্য হিসেবে হারাধনের মতো সে-ও পৈতা পরত। সাদা ধবধবে ধুতি পরে খালি গায়ে পৈতা গাছা পরে সে যখন পূজার জন্য মন্দিরে যেত, চমৎকার লাগত তখন তাকে। স্বকীয়তাবোধের মধ্য দিয়েই কেমন করে মানুষের সহজ-স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে— এ যেন তারই উত্তম উদাহরণ। অবশ্য সবকিছুরই একটা স্থানকালের বিচার আছে, পরিবেশ বদলে গেলে তার সঙ্গে উপস্থাপনাও বদলাতে হয়। না হলে এক আঙ্গিকে যাকে স্বাভাবিক মনে হয়, অন্য আঙ্গিকে তা দৃষ্টিকটু এমনকি হাস্যকরও মনে হতে পারে।

ছোট হলেও লক্ষ্মীপুর ছিল এক শহর। সেই তুলনায় চাঁদগাজীকে সীমান্তবর্তী এক নিভৃত পল্লি অঞ্চল বলা যেতে পারে। শহুরে ব্যস্ততার বদলে এখানে আছে ধীর-মন্থর গ্রামীণ অলস প্রশান্তির আমেজ। সাড়া জাগানো কোনো কিছু এখানে ঘটত নিতান্ত কালেভদ্রে। এমন কিছুর প্রথম প্রতিশ্রুতিতেই অধীর প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম আমরা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক যা কিছু ঘটত, তার প্রায় সবই ঘটত আমাদের স্কুলকে কেন্দ্র করে— হোক তা স্বাধীনতা দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী অথবা কোনো হিন্দু পার্বণ উদ্‌যাপন বা স্কুল ইনসপেকশন উপলক্ষ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী বা নাট্যানুষ্ঠান। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে গঠিত হতো বিশেষ কমিটি আর প্রাণপণে কাজ করে যেত তারা। এই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

স্বেচ্ছাশ্রমের উপহার উপভোগ করত সবাই মিলে অনুষ্ঠানের দিনে। পাঠ্যসূচির ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম উসকে দেওয়ারও কর্মসূচি ছিল অনেক। বয়স্কাউট হিসেবে স্বাধীনতা (তখন ছিল ১৪ আগস্ট) দিবসে চাঁদ-তারা শোভিত সবুজ পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতাম আমরা। আর গাইতাম 'ওড়াও ওড়াও আজি কওমি নিশান'। তখনো কোনো অফিশিয়াল জাতীয় সংগীত ছিল না পাকিস্তানের। গানটার কথায় পাকিস্তানি জাতিবোধের উজ্জীবনের সঙ্গে পতাকার চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই 'খাইবার দ্বারে তার পতাকাবাহী, মেঘনাকূলের যত বীর সিপাহি,' অথবা 'সবুজ সে জীবনের কল সংগীত' ইত্যাদি অপূর্ব এক দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিত আমাদের কিশোর মনে। বিচিত্রানুষ্ঠানে ক্লাস টেনের বছরের পরের বছর ফেল করা ইঁচড়ে পাকা প্রবীণ ছাত্র উদাত্ত ভাটিয়ালী সুরে গান ধরত:

'বাঁশিটি বা-জা-ব যখন গাঙ্গের কূলে বইয়া—
তুমি জলের ছলে আইস তখন কলসি কাঁখে লইয়া—'

পরম বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকাতেন শিক্ষকেরা। পুলকিত চমকে লজ্জা-লাল হয়ে উঠত ছাত্রদের চোখ-মুখ।

চাঁদগাজীতে আমার আর এক ছোট ভাইয়ের জন্ম হলো— সাইফ উদ্দিন। দেশ বিভাগ-পূর্ব ভারতের সমনামা এক ব্যক্তিত্বের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে তার ডাকনাম রাখা হলো— কিচলু। কিছুদিন পর আমাদের বৈচিত্র্যহীন গৎবাঁধা পরিবারজীবনে এলো এক বিপুল বিপর্যয়। দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন আব্বা। এমনিতে চোখে না পড়লেও এই অসুখ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো— এই পরিবার-তরণির প্রধান কর্ণধার হিসেবে আব্বা কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। নিউমোনিয়া না টাইফয়েড এখন মনে নেই, তবে খুবই সাংঘাতিক রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। দারুণ জ্বরে ভুগতেন, তাপ এত বেশি হতো যে, আধভেজা ঠান্ডা যে তোয়ালা ভাঁজ করে আমরা তার কপালে রাখতাম, শিগগিরই তা সম্পূর্ণ না শুকালেও বেশ গরম হয়ে যেত। বড়দা ডাক্তার ডাকতেন, থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপ মেপে লিখে রাখতেন। আম্মা আর আমি বালতি করে ঠান্ডা পানি এনে তার বালিশের ওপর অয়েলক্লথ বিছিয়ে তার ওপর আব্বাকে শুইয়ে দিতাম। ঘাড়ের নিচে শুকনা তোয়ালে ভাঁজ করে রাখা হতো, পাছে পানি গায়ের দিকে গড়িয়ে না যায়। তারপর ছোট এক মগ দিয়ে পানি তুলে তা অবিরত ঢালতে থাকতাম আব্বার মাথায়। দীর্ঘক্ষণ পানি ঢালার পর তোয়ালে দিয়ে চুলগুলো ভালো করে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রগড়ে মুছে দিয়ে আব্বাকে শুইয়ে দেওয়া হতো। আস্তে চোখ বুজে আসত তার, আম্মার ইশারায় কামরা ছেড়ে চলে আসতাম সবাই, যাতে তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত না হয়ে যায়। কখনো-বা আম্মা তার গা মুছিয়ে দিতেন ভেজা তোয়ালে দিয়ে। আব্বার প্রচুর মাথাব্যথা হতো। আমি, ছোট বোন রিনু, ছোটদা এবং শিরি পালা করে করে তার মাথা টিপে, চুল টেনে দিতাম। আমার বাড়তি দায়িত্ব ছিল তার পা টিপে দেওয়ার, ঘণ্টাভর বসে বসে পা টিপতে থাকতাম। কখনো ঘুম এসে যেত টিপতে টিপতে— তার নয়, আমার। পরম স্নেহে আব্বা মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'যাও শুয়ে পড়ো।'

কয়েক মাস ধরে রোগে ভুগলেন আব্বা। শুকিয়ে তার শরীর আধখানা হয়ে গেল। সারা পরিবারের সবাই দিবারাত্রি সেবা-শুশ্রূষায় লেগে থাকল। তার বিছানার পাশে একজন না এজন সর্বক্ষণ পাহারায় নিয়োজিত থাকত, পরিবারের বন্ধু-স্বজন নিয়মিত আসতেন তাকে দেখার জন্য। যদিও তাদের অনেকেই রকমারি খাবারদাবার নিয়ে আসতেন, তবু তাদের যত্ন-আত্তিতে সময় লাগত প্রচুর। এসব মিলিয়ে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। প্রায় তিন মাস স্কুল কামাই করতে হলো আমাকে। অথচ তিক্ততার চিহ্নমাত্র ছিল না কারও চেহারায়-আচরণে। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জনের জন্য এই ত্যাগ, এই পরিশ্রম উল্টো আমাদের অন্তর-মন এক অনবদ্য সার্থকতার তৃপ্তিময় প্রশান্তিতে দিলো ভরিয়ে। আম্মা প্রতি সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের পর সবাইকে বসিয়ে দিতেন, কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দরুদ পড়তে। এরপর সবাই মিলে মোনাজাত করতাম আব্বার আশু রোগমুক্তির জন্য।

বিপদে-আপদে যোগাযোগের ব্যবস্থা সে সময়ে ছিল অত্যন্ত শ্লথগতি ও আয়াসসাধ্য। দূরের আপনজনদের খবর দিতে হলে চিঠি বা টেলিগ্রামের সাহায্য নিতে হতো। কিন্তু দশ-বিশ মাইল পরিধির ভেতরে লোক মারফত খবর দেওয়াই ছিল দ্রুত ও নিশ্চিত। আব্বার অসুখের সময় দশ-বারো মাইল দূরে আমার তখনকার মামার বাড়ি হরিপুরে যেতে হতো মিয়ন মামাকে (আম্মার একমাত্র ভাই) ডেকে আনার জন্য। লোকাভাবে আমার ওপরই এ দায়িত্ব পড়ত বারবার। আমিও উৎসাহভরে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব চেয়ে নিতাম দু-কারণে— প্রথমত বয়ঃসন্ধির সেই সময়ে অতদূর পথ একলা চলার স্বাধীনতাটা বয়ঃপ্রাপ্তদের সারিতে শুমার হওয়ার ছাড়পত্র বলে বিবেচনা করতাম, দ্বিতীয়ত গৎবাঁধা জীবনের রুটিন থেকে পালিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে একান্তে আপন হওয়ার এই ছিল এক মহাসুযোগ। একবার যেতে হলো ভরদুপুরে। প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

গ্রীষ্মের দিন, নিথর-নির্জন গ্রাম্য পথ। কখনো-সখনো পুকুরপাড়ে দুষ্ট ছেলেরা পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, একাকী চাষি গরু খেদিয়ে নিয়ে চলছে, কোথাও রাস্তাঘেঁষা কোনো বাড়ির কাছারিঘরের সামনে ছায়ায় বসে হুক্কা ফুঁকছেন প্রবীণ কজন গ্রামবাসী। কিন্তু অধিকাংশ পথই জনমানবহীন। কোলাহলমুক্ত নিস্তব্ধতায় শুধু মাঝে মাঝে ছেদ টানছে ঘুঘু-কোয়েলের ডাক। গ্রীষ্মের খররোদে ঘামসিক্ত পথিক কিশোর আমি একাকী পথ চলছি— কতটা এলাম আর কতদূর যেতে হবে, তা মেপে মেপে। মাইলফলকহীন সেই গেঁয়ো পথে দূরত্বের পরিমাপ হয় শুধু বিভিন্ন নিশানা ধরে। কোন পুলটার পর কোন মসজিদ, তারপর বটগাছ, গোরস্তান, মন্দির-শ্মশান ইত্যাদি দেখে দেখে। তারপর পাকিস্তান বাজারে পৌঁছালে বুঝতাম মামাবাড়ি আর দূরে নয়।

আর একবার আব্বার শরীর বেশি খারাপ হয়ে গেল, বড়দা-ছোটদা দুজনের একজনও সেদিন চাঁদগাজী ছিলেন না। সন্ধ্যা থেকেই আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু আশা করছিলাম অবস্থার হয়তো উন্নতি হতে দেরি হবে না। তবু আম্মা বললেন, অবস্থা এ রকম চললে কাল তোমার মামাকে খবর দিতে হবে। কিন্তু ক্রমেই অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হতে থাকল। রাত সাড়ে নটার দিকে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন এতরাতে হরিপুর যাওয়ার সাহস করব কি না। স্বভাবসুলভ সাহসিকতায় বললাম, কোনো অসুবিধা হবে না, আমি যেতে প্রস্তুত। তবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন আম্মা। আমি তৈরি হয়ে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে হলো। দোয়া-দরুদ পড়ে হাতে একটা টর্চলাইট গুঁজে দিয়ে বাসার গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে বারবার হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলার তাগিদ করে কসম দিয়ে বিদায় করলেন। মনে মনে হাসলাম— চন্দ্রালোক ভরা দ্বাদশীর রাত, টর্চ দিয়ে কী হবে? কিন্তু তাকে একথা বলতে পারলাম না। পথে বেরিয়ে পড়লাম।

চেনা পথ, চাঁদের আলো আর রোগাক্রান্ত পিতা এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্ধেক পথ নিরুদ্বেগেই পার হয়ে গেলাম। কিন্তু শেষের দিকে পথও ক্রমেই অচেনা হয়ে উঠছিল, রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়ে চলছিল এক স্তব্ধ নিথর নির্জনতা। বুকের ভেতরে সাহসের তাপমান যন্ত্রটায় পারদকণা দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল নিচের দিকে। আদর্শ বোধের প্রেরণার জোর ক্রমেই হারাতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সামনের পুলটা পার হলেই পথের পাশে শ্মশান। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে উঠল। আস্তে চলি না জোরে ভেবে পেলাম না। শেষে জোরেই চলতে লাগলাম এই ভেবে যে শ্মশানটা জলদি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পার হয়ে যাব। কিন্তু ঠিক দৌড়াচ্ছিলাম না— খানিকটা ভয়ে, খানিকটা আত্মসম্মানবোধের চেতনায়। কপালে হাত দিয়ে দেখি আমি ঘেমে উঠছি। আম্মা হাতে টর্চ গুঁজে দিয়েছিলেন আসার পথে, তখন চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল রাতের ওপর ভরসা করছিলাম। কিন্তু কে জানত যে যতই উজ্জ্বল হোক, চাঁদের আলো দিবালোকের মতো স্পষ্টতা নয়; বরং বয়ে আনে এক অস্পষ্ট, রহস্যময় মোহনীয়তা, এতে অন্ধকারের অজ্ঞতা ঘুচলেও সূর্যালোকের মতো স্বচ্ছ-প্রত্যয় আসে না। তাই গা ছমছমটা বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের রাতের চেয়ে শুক্লপক্ষের রাতগুলোতেই বেশি করে। যাই হোক, রহস্যঘেরা শঙ্কার রাতেরও অবসান আছে— শিগ্‌গিরই পাকিস্তান বাজার হয়ে হরিপুর কাজীবাড়িতে নানাদের ঘরের দরজায় এসে হাজির হলাম। আওয়াজ শুনেই তড়িঘড়ি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে সামনে আমাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন নানি আম্মা। রাতেই ফেরত যাওয়ার জন্য চাপ দিলাম, কিন্তু নানিকে রাজি করানো গেল না কিছুতেই। খাইয়ে-দাইয়ে শুয়ে যেতে বাধ্য করলেন তিনি আমাকে। ঠিক হলো, পরদিন প্রথম সকালেই মামা-ভাগ্নে দুজন রওনা করব।

ধীরে ধীরে আব্বার রোগের প্রকোপ কমতে শুরু করল। স্বস্তি ফিরে এলো আমাদের সংসারে। আব্বা তার কৃশকায়-দুর্বল শরীরেই অফিসে যেতে শুরু করলেন আর আমার এবার ফুরসত হলো স্কুলে ফিরে যাওয়ার। দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন নেতিবাচক প্রভাব পড়ল আমার শিক্ষায়। বাকিরা তত দিনে এগিয়ে গেছে অনেকগুণ। প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে গেলাম ক্ষতিপূরণের। শিক্ষকেরা এগিয়ে এলেন সহৃদয় সাহায্য নিয়ে, সহযোগিতা করল সহপাঠী বন্ধুরাও। কোনো রকম তাল সামলে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দিলাম। পরীক্ষা শেষে এক স্বস্তিভরা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল সারা অন্তরমনে— আহা মুক্তি। বাঁধন ছাড়ার মতো ছুটে গেলাম হরিপুরে নানাবাড়ি। আকণ্ঠ উপভোগ করলাম নানি আম্মার অফুরন্ত আদর, খাওয়াদাওয়া, ঘুম, বইপড়া আর অন্যান্য ঘরের মামাতো ও খালাতো ভাইবোনদের সঙ্গে দুরন্তপনা করে বেড়ানো ছাড়া কোনো কাজ নেই। খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল এক খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে— তার নাম আজাদ। তার বড় দুই বোন আরু ও পারু আপা এবং ছোট বোন শিউলীসহ চলল অন্তহীন আড্ডা, লুডু ও কেরাম খেলার আসর আর বনভোজন— আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় যার নাম 'জোলাভাতি'।

আজাদের আব্বা ছিলেন মোক্তার, ফেনীতে থাকত তারা— গুদাম কোয়ার্টারে তাদের বাসা ছিল। কদিন পর তাদের ফেনী ফিরে যাওয়ার সময় এলো। আজাদ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

খুব ধরে বসল তাদের সঙ্গে ফেনীতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। তিন বোনও হই হই করে সমর্থন জোগাল। খালা আম্মাও চাপ দিলেন খুব। শেষে নানি আম্মার অনুমতি নিয়ে ফেনী রওনা হয়ে গেলাম। আজাদদের গ্রামের বাড়িও ফেনী শহর থেকে বেশি দূরে নয়। সোনাপুর মজুমদারবাড়ির দূরত্ব তাদের গুদাম কোয়ার্টার থেকে মাত্র তিন মাইল। হেঁটেও যাওয়া যায়, তবে সাধারণত রিকশায়ই যাতায়াত চলে।

ছোট শহর ফেনী। বড় জনাকীর্ণ নগরের প্রাণচাঞ্চল্য নেই, নেই বহুতল দালানকোঠা আর দামি গাড়ি-ঘোড়ার জৌলুস। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে ফেনীর ছিল একটা নির্ভুল স্বাতন্ত্র্য, মফস্বল হলেও এর শহুরে কৌলীন্য নজরে পড়ত সহজেই। খানিকটা পাড়াগাঁয়ের বর্ধিষ্ণু পরিবারের প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যের মতো। পরিকল্পিত পথঘাট, কিছু পাকা বা পিচঢালা, কিছু কিছু শুধু ইট বসানো, বাদবাকি মাটির সড়ক, তবে ছিমছাম পরিষ্কার। রাস্তার পাশের বাসাগুলো হয় একতলা বা দোতলা দালান, নয়তো কাঠের কাঠামোর ওপর বাঁশের বা টিনের বেড়ায় ঘেরা টিনের চালের ঘর। দালানগুলোর অধিকাংশই পুরোনো, সদ্য বানানোর সংখ্যা খুবই কম। বাসাগুলোতে গোসলখানায় তখনো পানি সরবরাহ কেন্দ্রীয়ভাবে ছিল না, চাকররা টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে বালতি ভরে দিত। বালতি থেকে টিনের মগ দিয়ে গায়ে পানি ঢেলে গোসল করতে হতো। থাকার ঘরের বাইরে আলাদা ছোট একটা পাকঘর এবং খানিকটা দূরে থাকত ছোট্ট পায়খানা— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকা অথবা ভিটে পাকা। তখনো স্যানিটারি পায়খানার প্রবর্তন হয়নি। পায়খানাগুলোর মাঝখানে একটা গর্তের নিচে বসানো থাকত একটা বালতি। সপ্তাহে দুবার মিউনিসিপ্যালেটির মেথররা ময়লাবাহী গাড়ি নিয়ে আসত বালতি সাফ করে দিয়ে যাওয়ার জন্য।

মোটামুটি বিত্তশালী যারা, তাদের গ্রামের মতোই বাইরে আলাদা বৈঠকখানা ছিল। বাদবাকিরা বাসার এক কামরাকেই বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করত। প্রায় পরিবারই হয় স্কুলের কোনো প্রবাসী শিক্ষক বা নিদেনপক্ষে কলেজের একজন ছাত্রকে গৃহশিক্ষক হিসেবে 'লজিং' রাখত। বেতন দিতে হতো না তাদের, তবে থাকা ওখাওয়া নিখরচায় মিলত। ব্যবস্থাটা উভয় পক্ষের জন্যই ছিল উপকারী। অন্যরা ঘণ্টা হিসাবে বেতন দিয়ে গৃহশিক্ষক রাখত।

শহরের মাঝখানে ছিল উঁচু পাড়ওয়ালা 'রাজার ঝি'র দিঘি, যার চারপাশে ছিল সার্কিট হাউজ, এসডিওর অফিস ও বাসা, থানা, কোর্ট, মুনসেফি আদালত ইত্যাদি— শহরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কেন্দ্র। দিঘির পূর্বে বিরাট মাঠের দুপাশে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সুন্দর দুটি লাল ইটের দোতলায় হাইস্কুল ও ফেনী কলেজ। আজাদদের শহরের বাসায় ও তাদের সোনাপুরের বাড়ি মিলিয়ে মহানন্দে কেটে গেল বেশ কদিন। সোনাপুরের বাড়িতে আজাদের চাচাতো ভাই ও ভাতিজা মিলিয়ে বেশ কজন বন্ধুও জুটে গেল। এর মধ্যে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল বেশ। ওর নাম ছিল শাহজাহান বিন আলম— ডাকনাম 'সাজু'।

ফেনীর উল্লসিত দিনগুলোর স্বপ্নভঙ্গ হলো আব্বার এক চিঠি পেয়ে। চিঠির কড়া-রুক্ষ সুর যেন বেত্রাঘাতের তীব্রতার মতো হকচকিয়ে দিল আমাকে। প্রমাদ গুনলাম, আব্বা খুব কমই এমন রাগ করেন। পরদিনই রওনা হলাম চাঁদগাজী অভিমুখে।

আবার ফিরে এলাম নিত্যদিনের রুটিন বাঁধা বাস্তব জীবনে। শয্যাত্যাগ, নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, নাশতা, ক্লাসের বই পড়া, গোসল ও খাওয়ার পর স্কুলের দিকে রওনা করা, বিকেলে ফিরে এসে নাশতা ও নামাজ সেরে কিছুটা খেলাধুলায় সময় ব্যয়, মাগরিবের পরে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে বসা। এশার পর খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের কামরায় কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে (প্রায়ই অবশ্য পাঠ্যসূচিবহির্ভূত বইপত্র) শুতে যাওয়া। গৎবাঁধা বটে, তবে সম্পূর্ণ আনন্দহীন নয়। মানুষ এমন এক উপাদানে গড়া, সব প্রতিকূলতা জয় করে চরম বৈচিত্র্যহীনতার মধ্য থেকেও বৈচিত্র্য খুঁজে বের করতে পারে। সাদামাটা গদ্যময় জীবনেও সে আবিষ্কার করে কবিতার ছন্দোময় লালিত্য— পরিমাণে তা যত সামান্যই হোক না কেন। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। ছুটির দিনে বাসার চারপাশের বনবাদাড়ে বুনো ফলমূল আর পাখির ছানার সন্ধান করে, দিঘিটায় সাঁতার কেটে, বন্ধুদের সঙ্গে অবিরাম বকবক করে, পরিচিতদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আর সর্বোপরি গল্প-উপন্যাসের বই পড়ে আনন্দ খুঁজে পেতাম আমি। তাছাড়া সময় পেলেই বেড়াতে যেতাম দুই নানাবাড়ির কোনো একটায়। চাঁদগাজীর সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল এর অবস্থান, আমার দুই নানাবাড়ির ঠিক মাঝামাঝি। আমার আপন মায়ের বাবার বাড়ি মুনশীর হাটের বসিকপুরও ছিল হরিপুরের মতো সমান দূরত্বে, তবে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। আম্মা মারা গেছেন বলেই হয়তো নানা-নানি দুজনই দারুণ আদর করতেন আমাদের।

আমরা চাঁদগাজীতে থাকতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে এলো বিরাট পরিবর্তন। গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সামরিক বিপ্লবের নেতাদের মতো আইয়ুব খানও দিলেন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ক্ষমতাচ্যুতদের কুশাসন, দুর্নীতি এবং আরও অনেক অযোগ্যতা-অপকর্মের মস্ত লম্বা ফিরিস্তি। এর কিছু কিছু হয়তো সত্যও ছিল, কিন্তু তখন পুরোপুরি না বুঝলেও পরে ঠিকই বুঝেছি যে বিপ্লবের আসল কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর সে কারণটা ছিল দেশে ইসলামি শাসনের সম্ভাবনা নির্মূল করা। ইসলামের নামে অর্জিত এই দেশটার জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার যাবতীয় চেষ্টা চালানো হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বিলম্বিত হয়েছে শুধু ইসলামি শাসনতন্ত্রের সর্বজনীন দাবি এড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টায়। বাদামি চামড়ার নামমাত্র মুসলমান নতুন শাসকগোষ্ঠী মনে-মগজে তাদের সাদা চামড়ার বিলাতি পূর্বসূরিদের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন ছিলেন না। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল দুই মেরুতে অবস্থিত। এসব নেতা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি বহিষ্কার করে রাখতে বদ্ধপরিকর। মুসলিম লীগের নেতারা ইসলামকে ব্যবহার করতেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে শাসনযন্ত্রের ওপর নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে জনতার দাবিমতো ইসলাম কায়েম হলে ক্ষমতার মসনদ চিরতরে তাদের হাত থেকে ছিটকে পড়বে। তাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এই অন্তহীন গড়িমসি। কিন্তু জনতা ও আলেমসমাজ মিলে অনিচ্ছুক রাজনৈতিকদের শেষ পর্যন্ত ঢেঁকি গিলতে বাধ্য করল। সব মত ও মাজহাবের আলেমরা করাচি সম্মেলনে প্রণয়ন করলেন ঐতিহাসিক ২২ দফা। এরই আলোকে গণপরিষদকে পাশ করতে হলো আদর্শ প্রস্তাব— নতুন শাসনতন্ত্রের কাঠামো ও ভূমিকা। ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণীত হলো এর আলোকে। নেজামে ইসলামী দলের নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত হলো নয়া সরকার। তারা নতুন শাসনতন্ত্র কার্যকর করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তার আগেই ঘটল বিপ্লব। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদে আসীন রেখে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও তার সরকারকে। ইসলামি শাসনতন্ত্র বাতিল করে প্রথম চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে বসলেন আইয়ুব খান। কয়েক মাস পরে ইস্কান্দার মির্জাকেও ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট পদও দখল করলেন তিনি। সমস্ত রাজনৈতিক দল বাতিল করা হলো। বহু রাজনৈতিক নেতাদের পোরা হলো জেলে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘনিয়ে এলো অন্ধকারের অমাবস্যা। বরং পাকিস্তানের পরবর্তী পতন ও ভাঙনের যাত্রা শুরু হলো সেদিন থেকে। আর আমার রাজনীতিসচেতন আগামী জীবনের হলো প্রথম সূচনা।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

দশ

আবার সেই দিন এলো, যখন পুরোনো দিনগুলো পেছনে ফেলে নতুন দিনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আব্বা বদলি হলেন কবিরহাটে। নতুন জায়গাটা আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। বসুরহাট থেকে বামনী যতটা দূরে, কবিরহাটও ঠিক ততটা দূরে, তবে অন্যদিকে। কবিরহাটেও আব্বার থাকার জন্য বড় একটা ঘর ছিল, তবে আগের তিন-চার জায়গার মতো বিরাট ও বিস্তৃত কম্পাউন্ড ছিল না। এ ছাড়া বারবার স্থান পরিবর্তনের স্থিতিহীনতা এড়ানোর জন্য ঠিক হলো এবার আব্বা একাই যাবেন কবিরহাটে, আর আমরা সবাই থাকব গ্রামের বাড়িতে। বাস চলাচল ছিল, বাড়ি আসতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগত না। একটা চাকর ছেলে আব্বার রান্নাবান্না করত। তবু চাকরিজীবনের এই শেষ পর্বে অনভ্যস্ত এই একাকী অবস্থানটা আব্বার জন্য কষ্টকর ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তিনি কাউকে তা বুঝতে দিতেন না।

আমি ভর্তি হয়ে গেলাম দাগনভূঞার আতাতুর্ক হাই স্কুলে। চাচাতো-জ্যাঠাতো ভাইদের আরও কজন যেত একই স্কুলে। সুতরাং বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে অবস্থিত হলেও আসা-যাওয়ায় অসুবিধা হতো না তেমন। স্কুলটার আতাতুর্ক নামকরণটা এলাকার নেতৃস্থানীয়দের ভাবাবেগ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতার অভাবই প্রমাণ করে। যারা খেলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তারাই ব্রিটেনের সঙ্গে চক্রান্ত করে খেলাফতের মূলোৎপাটনের অগ্রনায়ক কামাল পাশার নামেই নামকরণ করলেন নিজেদের শ্রেষ্ঠ স্কুলটার। উপনিবেশোত্তর মুসলিম জাহানে ইসলামকে জাতীয় জীবন থেকে নির্বাসিত করার ব্যাপারে কামালের ভূমিকা একক ও অনন্য। দেশে দেশে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের যে সয়লাব পরের দিকে ঘটেছে, তার প্রথম পতাকাবাহীও মোস্তফা কামাল। যদিও অধুনা তুর্কির অর্থসাহায্যে স্কুলটার বাহ্যিক উন্নতি শুরু হয়েছে, তবু আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নামকরণটা ছিল নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। নাম যাই হোক, পড়ালেখার দিক দিয়ে ভালোই ছিল স্কুলটা। স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আমাদের গ্রামের জালাল উদ্দিন সাহেবের সময়েই স্কুলটা মানগত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। স্বল্পবাক, কঠোর পরিশ্রমী জালাল সাহেব শিগ্‌গিরই সবার নজরে পড়ে যান। তৎকালীন মহকুমা সদর ফেনীর প্রধান স্কুল পাইলট স্কুলে উন্নীত হলে তারা জালাল সাহেবকে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হেডমাস্টার করে নিয়ে যান। পরে যারা দায়িত্ব নেন, তারা জালাল সাহেবের সমমান বজায় রাখতে পারবেন এমনটা আশা করাও বাতুলতা। তবু জালাল সাহেবের আরম্ভ করা গতি সহজে শ্লথ হয়ে যায়নি। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডেও যোগ দিতাম। ছেলেবেলা থেকে বাংলা চর্চা করে করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছিলাম। লেখা ছাড়াও কবিতা আবৃত্তি মোটামুটি ভালোই করতাম। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় নিয়মিতই কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নিতাম। সে বছর গোটা জেলার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হলো। আতাতুর্ক স্কুলে প্রতিটি বিভাগে নিজস্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত কবিতা ছিল নজরুলের 'উমর ফারুক'। স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হলাম। পরে নির্দিষ্ট দিনে নোয়াখালী জিলা স্কুলে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা হলো। প্রতি বিভাগে একজন করে নির্বাচিত হলো প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য। আবৃত্তিতে আমি দ্বিতীয় হলাম, প্রথম স্থান অধিকার করে প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হলো জিলা স্কুলের একজন ছাত্র, নাম তার খুব সম্ভবত ফরহাদ মজহার।

ছোটবেলায় যখন দেশে ছিলাম, তখন পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার বয়স ছিল না। এবার অবশ্য বোধ ও বুদ্ধি দুটোরই এতটা উন্মেষ ঘটেছে যে বিস্তারিত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। প্রথমে আসে আমাদের পরিবারের ঐতিহাসিক পটভূমি। আব্বা এবং পরিবার ও গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বির মুখ থেকে শোনা এই ইতিহাস অলিখিত হলেও নেহাত গল্পকাহিনি বলে অগ্রাহ্য করার মতো ছিল না। সত্যতা না থাকলে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বক্তব্যে এত সংগতি মেলার কথা নয়। তাছাড়া বাড়ির পুরাতন দলিল-দস্তাবেজেও মেলে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য। বিশেষ করে কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত এক বিশাল 'কেইস-হিস্ট্রি' (যার এক কপি আব্বার কাছ থেকে আমি পেয়েছি) তো বিপুল তথ্যসম্ভারে ভরপুর। ইতিহাসটা অনেকটা এরকম। চৌদ্দশ খ্রিষ্ট শতকের মাঝামাঝি (খ্রি. ১৩৩৮-১৩৪৯; হি: ৭৩৯-৭৫০) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন। ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁয়ে ছিল তার রাজধানী। তার রাজত্বকালে অগণিত সুফি-সাধক ও পির-ফকির বাগদাদ, ইয়ামেন, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে বাংলাদেশে তবলিগের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। ইসলাম প্রচারের এই প্রচণ্ড প্রাণবন্যার পেছনে অবশ্য বাস্তব কিছু কারণও ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি রাষ্ট্রশক্তির অবক্ষয়ে এবং মোঙ্গল হামলার মুখে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বাগদাদে খেলাফতের শোচনীয় পরাজয় ইসলামের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভঙ্গুর রাজনৈতিক শক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তুলেছিল অনেকের মনে। আর আধ্যাত্মিকতা ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রান্তেই ইসলামের চিরন্তন বাণী পৌঁছে দেওয়ার তীব্র আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে তুলছিল তাদের। প্রখ্যাত মরক্কোবাসী মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা এই সময়ে বাংলা সফরে আসেন এবং এ ধরনের এক খ্যাতিমান সুফি সাধক শায়খ শাহজালালের (বতুতার গ্রন্থে তার নাম শায়খ জালাল-আল-দ্বীন তাবরিজি) সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ইবনে বতুতা লিখেছেন, 'বাগদাদে মোঙ্গলদের হাতে খলিফা মোতসিম বিল্লাহর নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন শায়খ শাহজালাল। এরপর তিনি আসামে এসে দ্বীন প্রচারে ব্রতী হন এবং সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন।' শুধু হজরত শাহজালালই নন, ইবনে বতুতার মতে, 'বহুসংখ্যক সুফি, ফকির-দরবেশ এই সময়ে বাংলাদেশে আসেন আর সুলতান ফখরুদ্দীন তাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের সর্ববিধ সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করেন।' ইসলাম প্রচারের জন্য বাঙালাকে নির্বাচন করার অপর কারণ হচ্ছে এই প্রাচুর্য ও নেয়ামতভরা দেশ ইসলামের আলো থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে— এই বেদনাবোধ বতুতা লিখেছেন, 'খোরাসানবাসীর ভাষায় বাঙলাহ্ হলো, 'দোজখপুর নিয়ামত' অর্থাৎ 'নেয়ামতভরা নরক।' ইবনে বতুতা এবং সম্ভবত অধিকাংশ সুফি-সাধকেরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তখনকার এবং এখনকার বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর, যাকে বতুতা বর্ণনা করেছেন 'সাদকাওয়ান' নামে। পরবর্তী সময়ে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে চাটগাঁও, চাটি গাঁ এবং চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয়, আর আজও এই নামে পরিচিত। এসব ফকির-দরবেশ দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন।[৪]

আমাদের অঞ্চল ফেনী, চট্টগ্রামের সঙ্গেই। সেকালের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নদীপথেও সমৃদ্ধ। তাই এমন এক পির শায়খ চান্দশাহ ফকির এসে আস্তানা স্থাপন করেন আমাদের এলাকায়। নদীতীরের বন-বাঁদাড় ঘেরা অঞ্চল আর সরল-সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষকে কেন্দ্র করে তিনি ইসলাম প্রচারের মিশন চালিয়ে যান। অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে থাকেন এবাদত-বন্দেগি, ধ্যান ও তপস্যায়। জনশ্রুতি আছে, এমন এক মৌন নিথর মোরাকাবা-মগ্ন মুহূর্তে বনের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করে ভূমিজরিপ ও আবাদের জন্য প্রেরিত

৪. ইবনে বতুতা, *রেহলা* (আরবি), বৈরুত, পৃ: ৬১২।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সুলতানের কর্মচারীরা। ফকির-দরবেশদের প্রতি সুলতানের উদার অভ্যর্থনার নীতি মোতাবেক তারা সবিনয়ে ফকির চান্দশাহের কাছে তার অভিপ্রায় জানতে চান। ত্যাগী শায়খ ভূমিতে গ্রামবাসীর অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার দাবি জানালে সঙ্গে সঙ্গেই তা গৃহীত হয়। কর্মচারীরা ফকিরকে অনুনয় করতে থাকেন নিজের জন্য একটা জায়গা নির্বাচন করতে। নিরুপায় সাধক অঙ্গুলি ঘুরিয়ে ছোট্ট একটা এলাকার দিকে ইশারা করেন। জরিপকারীরা তাই লিপিবদ্ধ করে দেন শায়খের জন্য। সেই থেকে সেটুকু জায়গার নাম হয়ে যায় চান্দপুর। আজও আমাদের গ্রামটা চান্দপুর নামে, আর আমাদের বাড়িটা চান্দপুর চৌধুরীবাড়ি নামে পরিচিত। সংসারবিবর্জিত বৈরাগ্য সাধনার স্থান নেই ইসলামে; সমাজের, সংসারের কণ্টকময় জটিলতার মধ্যেই তাদের খুঁজতে হয় রুহানী উৎকর্ষ আর মুক্তি। শায়খ চান্দ শাহও রচনা করলেন পরিবারের ভিত্তি। সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জনদের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের অনুশীলন চলত ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বিধান মোতাবেক। নিয়মিত রোজা, তাহাজ্জুদ, রাত জেগে এবাদত, তিলাওয়াত, জিকির-আজকারে এক নেকির খোশবুভরা আখেরাতমুখী সংসারজীবন ছিল তার, সংসারবাসী সাধকের এই পুণ্য-পূতঃ জীবন প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করল এলাকাবাসী অমুসলিমদের। দলে দলে ইসলাম কবুল করল তারা।

দীর্ঘ ও সফল জীবন শেষে পরপারের ডাক এলো একদিন। ফকিরের জীবনের মতোই তার মৃত্যুর ঘটনা ঘিরেও কিংবদন্তি, পুরাকাহিনির অন্ত নেই। এক বর্ণনামতে মৃত্যুর আগে সাধকের এবাদত-বন্দেগির হার বেড়ে যায় অনেক গুণে। চলে সুদীর্ঘ সিয়াম-সাধনা আর রাত্রিভর এবাদতে-এতেকাফে মশগুল জিন্দেগি। একপর্যায়ে নাকি মাটির নিচে খোঁড়া একটা কক্ষে খাবারদাবার নিয়ে চলে যেতেন তিনি, আর কাটাতেন অনেক দিন। পুত্র-পরিজন আর মুরিদ-অনুচরদের বলে যেতেন কবে তাকে তুলে আনতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে শীর্ণ-কংকালসার ফকিরকে আনা হতো তুলে। কিছুকাল পর আবারও ফিরে যেতেন সেই ধ্যানমগ্ন মোরাকাবার এতেকাফের একান্তবাসে। এভাবে একবার নাকি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সেই ভূগর্ভের অধিবাসে। বলে গেলেন, এবার যেন তাকে আর তুলে আনা না হয়। সেখানেই নাকি চিরসমাহিত হয়ে আছেন ফকির চান্দশাহ। যদিও তার পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনোরূপ ফলক বা মাজার-গৃহ তুলে চিহ্নিত করা হয়নি কবরটা, তবু গ্রামের সবাই এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অনায়াসে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেবে জায়গাটা। জীবন্ত সমাহিত হওয়ার ঘটনাটা বোধ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হয় নেহাতই কিংবদন্তি। কারণ, চিহ্নহীন কবরের ওপর তার আরোপিত গুরুত্ব থেকেই বোঝা যায় চান্দশাহ শরিয়ত অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন, এমন কাজ তিনি কেন করবেন, যা শরিয়তসম্মত নয়? কবরটা আমাদের বর্তমান বাড়ির পেছনের চৌবেড়ীর পর যে ছাড়া ভিটাটা আছে, তার ঠিক পরেই। আমাদের বাড়ির পশ্চিমে আর মুয়াদার বাড়ির লাগা দক্ষিণে। ছোট্ট একটা গাছপালা ঘেরা বনের মতো জায়গাটা। কেউ ভুলেও গাছপালা কাটার সাহস করে না। আমাদের ছেলেবেলায়ও গ্রামের মুরুব্বিরা বলতেন, সেখানে গাছের গায়ে কোপ দিলে রক্ত ঝরে। কেউ পরীক্ষা করে দেখার সাহস কোনোদিন করেছেন এমনটা শুনিনি। আমাদের পরিবার যখন পার্থিব উন্নতির শীর্ষে, আর বাড়িতে দালানকোঠা বানানো হচ্ছিল, তখন নাকি তরুণ জমিদার 'মেজ চৌধুরী', মানে কাবিল চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র মুজাফফর আলী চৌধুরী গোঁ ধরেছিলেন যে তিনি কবরটার ওপর পাকা করে মাজার বানিয়ে দেবেন। তিনি বললেন, আমরা, তার অধস্তন বংশধররা আরাম করে দালান-কোঠায় থাকব আর যার উছিলায় এত সব, তিনি গাছতলায় পড়ে থাকবেন, এটা হতে পারে না। তিনি বললেও বলেছেন, আমি পাকাকরা মাজারঘর বানিয়েই ছাড়ব— কাল থেকে কাজ শুরু করো। পরদিন লোকজন কাজ করতে এলে স্তব্ধপ্রায় মেজ চৌধুরী তাদের নিষেধ করলেন। বললেন, সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন চান্দশাহ হুজুরকে। ফকির তাকে বলেছেন, 'তোমরা থাকো দালানকোঠায় অসুবিধা নাই, কিন্তু খবরদার, আমার কবরের ওপর পাকা তো দূরে থাক, কোনো কাঁচা মাজারঘরও বানাতে চেষ্টা কোরো না।' সেই থেকে জায়গাটা আজও তেমনই পড়ে আছে।

ছোটবেলা থেকে দুটো প্রশ্ন বারবার মনে জাগত, সেটা হলো চান্দশাহ ফকিরের উত্তর পুরুষ যদি আমরা হই, তাহলে তার পর থেকে মোহাম্মদ তকী চৌধুরী পর্যন্ত পরিবারের লুপ্ত বংশধারার বিবরণ কী? আর তার কবরটা আমাদের বাড়ির পেছনে কেন? পরিবারের ও গ্রামের মুরুব্বিদের কাছ থেকে শোনা খণ্ড খণ্ড কাহিনির সঙ্গে আমার ভাবপ্রবণ মনের বোনা কল্পনার জাল যোগ করে এই প্রশ্ন দুটোর জবাব খুঁজে পেয়েছি। তবে থিওরিটা একান্তই আমার একার, অন্য কেউ এর সঙ্গে একমত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার মতে, আমাদের বর্তমান বাড়িটা সম্ভবত তালুকদারি, জমিদারির প্রথম উন্মেষলগ্নে প্রতিষ্ঠিত। আগের বসতবাড়িতে জমিদারদের বাসোপযোগী বিশাল বাড়ি তৈরির স্থানাভাবেই সম্ভবত এই স্থান পরিবর্তন। তাছাড়া যাতায়াতের নদী ও সড়কপথ মুখো করে বাড়ি তৈরি করাটাও সদ্যলব্ধ সম্ভ্রমের দাবি ছিল। তবু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বহু শতাব্দীর বাস্তুভিটা থেকে, বিশেষ করে বংশের প্রতিষ্ঠাতাপুরুষ চান্দশাহ ফকিরের ভিটা ও কবর থেকে বেশি দূরে সরে যেতেও হয়তো রাজি ছিলেন না তারা। খুব সম্ভবত বর্তমান বাড়ির পেছনের (পশ্চিমে) চৌবেড়িটার পরই যে উঁচু ছাড়াভিটাটা চান্দশাহ হুজুরের মাজারের সামনে নিয়ে পড়ে আছে শুরু থেকে, সেটাই হয়তো ছিল আমাদের প্রথম বাস্তুভিটা। তাছাড়া আমাদের স্বত্বাধীন এই জমিটার নামটাও তাৎপর্যপূর্ণ। 'ছাড়াবাড়ি' নামেই আমরা এখনো এই বাড়ির উল্লেখ করি, 'ছেড়ে আসা বাড়ি' বলেই হয়তো এই নাম। বংশধারার বিবরণ রাখার রীতি হয়তো জমিদারির জৌলুসের আগে কেউ প্রয়োজন মনে করেননি। তাই অজানা থেকে গেছে অনেক অগ্রপুরুষের নাম।

আধ্যাত্মিকতা ও দ্বীনদারিনির্ভর অস্তিত্ব থেকে পার্থিব-বৈভব, তালুকদারি জমিদারিতে উত্তরণ হলেও এই পরিবারের জীবনের মূলধারা ধর্মনির্ভরই থেকে যায়। নতুন পাওয়া সমৃদ্ধি কল্যাণ-কর্মে নিয়োগ করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের আকুতি প্রবল হয়ে ওঠে জমিদারদের মনে। যার আমলে সম্পত্তির বিস্তার বিপুল আকার ধারণ করে, সেই কাবিল চৌধুরী মৃত্যুর মাত্র মাসখানেক আগে রেজিস্ট্রি করে যান এক বিস্তারিত ওয়াক্ফ নামা। বাংলায় লেখা মূল ওয়াক্ফনামাটা এখন আর পরিবারের কাছে নেই। হয়তো কোনো না কোনো আদালতের রেকর্ডরুমে ফাইল চাপা পড়ে আছে। তবে কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৩৬ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত এই পরিবারের এক দীর্ঘস্থায়ী মোকদ্দমার কেইস ল বুকে এর ইংরেজি তর্জমা পাওয়া যায়। বইটির এক কপি আব্বার কাছ থেকে আমি পেয়েছি আর আজও সংরক্ষণ করছি সযত্নে। দলিলটা দীর্ঘ এবং বিস্তারিত বটে, তবে রচনাকালের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিত্রায়ণ। পরিবারের ও সময়ের ইতিহাসের স্মারক হিসেবে পুরো দলিলটার পুনঃতরজমা (আমার নিজের) এখানে যোগ করলাম (পরিশিষ্ট: ১)। দলিলটির লেখক ছিলেন ধর্মপুর গ্রামের জনৈক কালি কিংকর দাস মজুমদার। সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মালেকপুরের মোহাম্মদ জালিশ, অভিরামপুরের বশিরউল্লা ও মুরাদ জামা, পরগনা বদরাবাদের (কুমিল্লা) নেয়ামতপুরের ঈশান চন্দ্র মজুমদার, মমরাজপুরের নবকৃষ্ট মজুমদার, চন্দ্র মজুমদার, আলিয়ারপুরের মোহাম্মদ আকরাম, নারায়ণপুরের মোহাম্মদ সায়ন, চান্দপুরের আসগর আলী ও রামকুমার নাথ এবং জগৎপুরের আমান উদ্দিনের নাম।

কী বিচিত্র এই পৃথিবী। যে অঢেল অপরিমিত সম্পদ-সম্পত্তির তালিকা পর্যন্ত তৈরি করতে মালিক নিজেই হিমশিম খেয়ে গেছেন, তিনি কি জানতেন তারও

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

শেষ আছে? ঝানু জমিদার চারদিকে সযত্নে আটঘাট বেঁধে যে পাকা দলিলের রক্ষাকবচে এসমস্ত বাঁচাতে চাইলেন, তিনি কেমন করে জানবেন সম্পত্তির নৌকা দলিলের নোঙরে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়? কেমন করে তিনি জানবেন যে সরকারের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবেনা বলে তিনি যে বিধান বেঁধে দিয়ে গেলেন— অন্য এক যুগে অন্য এক সরকার এসে তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না— গিলে বসবে সব। সত্যি মানুষ পরিকল্পনা করে এক, কিন্তু হয় আর এক।

কাবিল চৌধুরী সমুদয় সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভুক্ত করে তা থেকে পরিজনদের জন্য মাসোহারা নির্ধারণ করে দ্বীন-দুনিয়া একত্রে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই অবশেষে কাল হয়ে দাঁড়াল। পঞ্চাশের দশকে যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে পাশ করা হলো 'প্রজাস্বত্ব আইন'। জমির স্বত্ব লাভ করে কৃষকেরা হলো সরাসরি সরকারের প্রজা। বারোটা বাজল মাঝখানের জমিদারদের, তাই এ আইনের প্রচলিত নাম হলো 'জমিদারি উচ্ছেদ' আইন। মুহূর্তে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল তারা, যৎসামান্য 'ক্ষতিপূরণ' যা মিলল, তাও শিগ্‌গিরই ফুরিয়ে গেল পুরোনো ঠাট বজায় রেখে পোলাও-কোর্মানির্ভর জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে। তারপর সীমাহীন শূন্যতা, রিক্ত-নিঃস্ব পতনের মোহভঙ্গ, দুপুরের কড়া রোদ্দুরের মতো নিষ্করুণ বাস্তবতা। কাবিল চৌধুরীর উত্তর পুরুষেরাও শিকার হলো এই বাস্তবতার, বরং তাদের ওপর আঘাতের চোটটা আরও কঠিন হতে লাগল। একই ওয়াকফে ধর্মীয় ও পারিবারিক উভয় সম্পত্তি যোগ করে দেওয়ায় ধর্মীয় অংশও রেহাই পেল না। সরকার অবশ্য দয়া করে জানালেন ধর্মীয় কাজের জন্য কাবিল চৌধুরীর জামানায় যে কয় টাকা পাওয়া যেত, সেই কয় টাকা এখনো তারা দিয়ে যাবেন। আরও কিছু বছর চলল বাদবাকি ভূসম্পত্তি বিক্রি-বন্ধক দিয়ে। তারপর সবাই মুখোমুখি হলেন অন্ধকার ভবিষ্যতের। যারা এককালে গোটা এলাকাবাসীকে করুণা করতেন, তারাই হয়ে গেলেন করুণার পাত্র।

মানবতাবোধটা মানুষের সহজাত, তা অঢেল পরিমাণে এলো চৌধুরীদের দিকে। করুণা করতে গিয়ে তাদের পুরোনো সম্ভ্রম-মর্যাদাটাও যাতে করে মোটামুটি বজায় থাকে, সেই দিকে নজর রাখতেও ভুল করল না তারা। একথা কারও অজানা থাকার কথা নয় যে চৌধুরীদের পুরোনো দিন আর ফিরে আসছেনা শিগ্‌গির। এখন তাদের সঙ্গে সুব্যবহার করলে সুদিনে আবার এর বদলা মিলবে— এমন অবাস্তব কল্পনা কারও মনে যে জাগেনি, তার প্রমাণও

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অনেকে দিতে কসুর করেনি। অধুনা-শিক্ষিত অথবা সদ্য-বর্ধিষ্ণু শ্রেণির জনাকতক যত্রতত্র অশোভন ও অসৌজন্যমূলক মন্তব্যও করত দেদার। এসব সময়ে সমর্থন, সহমর্মিতার পরশ নিয়ে পাশে দাঁড়াত বাদবাকিরা, যাদের কাছে নগদ বস্তুবাদী স্বার্থের চেয়েও মানবতাবোধটা ছিল বেশি মূল্যবান। সমাজের যারা অতি সাধারণ কাতারের, তাদের মধ্যেও যে অসাধারণ মানুষের মতো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, তার পরিচয় দিয়েছেন এঁরা। এদের অন্তত জনকয়েকের নাম এখানে উল্লেখ করা আমি জরুরি মনে করছি। এদের মধ্যে আমাদের বাড়ির কাজের লোকরা তো ছিলেনই, কিন্তু এর বাইরে গ্রামেরও ছিলেন অনেক। যেমন মুয়াদার বাড়ির সোবহানের বাপ কাকু, পুলের পাশের মোল্লাবাড়ির ক্বারি পুতু, পাশের বাড়ির ছিদুর বাপ, রাবিয়ার বাপ ও তাদের ছোট ভাই সালাম পুতু, আছিয়ার বাপদের বাড়ির কালা ভাই (আছান উল্লাহর বাপ) ও হকু ভাই (রহিমুল্লাহর বাপ), ফাজিলের ঘাটের কালু ব্যাপারী ও শফি দর্জিসহ আরও অনেকজন। তাদের অনাবিল মানবতার বদলা দেওয়ার ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীদের ছিল না— এর প্রতিদান তারা একদিন অবশ্যই পাবেন আল্লাহর দরবারে।

সহজ-সরল মানুষ ছিলেন সোবহানের বাপ কাকু। চেহারার মধ্যে ছিল খানিকটা কৌলিন্যের ছাপ। আমাদের বাড়িতে এসে সময় কাটাতে বেশ ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন চৌধুরীবাড়ির লুপ্ত বিষয়-বৈভব আর জাঁকজমকের গল্প শোনাতে। আমাদের কাছারিঘরের দরজায় বড় গাছটার আবার কখনো দক্ষিণের পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটলায় বসে তামাক টানতে টানতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প শোনাতেন। আমাদের পরিবারের ইতিহাসের অর্ধেকটা জেনেছি তার মুখে থেকেই। তিনি বলতেন, কেমন করে বিত্ত-বৈভবের শীর্ষে পৌঁছেও এই বাড়ির মুরুব্বিরা চাঁনশাহ ফকিরের তাকওয়ার উত্তরাধিকার বহাল রেখেছেন। বজায় রেখেছেন দরদভরা মানবতাবোধ। এদের পরাক্রম-প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। সাধারণ মানুষ হিন্দু হোক কি মুসলমান, এই বাড়ির সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় পায়ে জুতা থাকলে তা খুলে হাতে নিয়ে যেত, অন্য পাশে গিয়ে আবার পায়ে দিত। কিন্তু এটা ছিল জনগণের এক স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভ্রমবোধ। কখনো কেউ জোর-জুলুম করে এই নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। তার মতে, যখন অন্যান্য জমিদারবাড়িতে বকেয়া খাজনার জন্য প্রজাদের ওপর জুলুম করা হতো, তখন এই বাড়ির জমিদারদের কাছে বার্ষিক পুণ্যাহের দিনে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে খাজনা হয় পুরো মওকুফ অথবা অন্তত সহজ কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ পাওয়া যেত। আমাদের বাড়ির

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ক্ষীয়মাণ প্রভাবের এই ক্রান্তিকালে এতকাল যারা সুযোগ পায়নি, নতুন করে প্রভাব ও নেতৃত্বের দাবি নিয়ে সামনে এলো তারা। মধুবিবির পুলের পাশের পাটোয়ারীবাড়ির মমতাজ উদ্দিন ছিলেন এমন একজন। তার চেহারার সঙ্গে (অনেক পরে টের পেয়েছি) মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের চেহারার ছিল অপূর্ব মিল। তবে গায়ের রংটা ছিল শ্যামলা। এলাকার লোক তাকে কমিউনিস্ট বলে জানত। পাড়াগাঁ হলেও আমাদের পাশের হিন্দু গ্রামের কিছু বিদগ্ধজনের কারণে এলাকায় কমিউনিজমের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। শুনেছি, দেশ বিভাগের (১৯৪৭) আগে আমাদের ফাজিলের ঘাট বাজারে ১৪ দিনব্যাপী নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মমতাজ ছাড়াও মনি বাবু, ইন্তু মিয়াসহ বেশ কজন কমিউনিস্ট ছিলেন এই এলাকায়। তবু কয়েকবার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার পুরো নাম খুব কম লোকই জানত, সবাই তাকে 'মন্তা' বা 'মন্তা পাগলা' বলে ডাকত। বিভিন্ন কারণে কয়েকবার জেলও খেটেছেন তিনি। তাই একবার ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনের সময় গ্রামের এক কবির (সম্ভবত মুয়াদারবাড়ি রাজ্জাক মেস্তরির) লেখা এক কবিতা তার নির্বাচনি স্লোগানে পরিণত হয়। এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ছিল—

'মন্তাকে প্রেসিডেন্ট করল
গ্রাম্য সবাকায়—
এখন বিপার্টিরা কোন কারণে
জেলখানায় পাঠায়—।' ইত্যাদি

কিন্তু এক মমতাজ (মন্তা) উদ্দিন চৌধুরীদের আধিপত্যের ইতি টানার জন্য যথেষ্ট ছিল না। জমিদারির অবসান হলেও গ্রাম্য রাজনীতিতে তারা শিগ্‌গিরই তাদের স্থান করে নিলেন। ঠিক আমাদের বাড়ি থেকে না হলেও মাইল দেড়েক দূরের বাগডুবি চৌধুরীবাড়ির শফিউল্লাহ চৌধুরী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে গেলেন। শফি চৌধুরী ছিলেন আমাদের বাড়ির জামাই। বিয়ে করেছিলেন মনোয়ার আলী চৌধুরীর নাতনি। তাই সম্পর্কে আমার ফুফা। দীর্ঘদিন আমাদের ৬ নম্বর উদরাজপুর ইউনিয়নের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে আইয়ুব আমলে ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়ন কাউন্সিলে পরিণত হলে তিনি তারও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তার সৌম্য চেহারায় ভুঁড়ি দূরে থাকুক, মেদের লেশমাত্রও ছিল না। শেরওয়ানি ও রুমী টুপি (ফেজ) পরে তিনি আসতেন তার প্রিয় লাল ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়ার কদমে কদমে রুমী

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

টুপির পেছনের কালো গুচ্ছটা নাচতে থাকত। গ্রামের ছেলেমেয়েরা দৌড়ে বের হয়ে দেখতে আসত। আর দুষ্টরা মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বলত— 'ঘোড়া চৌধুরী' যায়।

দীর্ঘদিন পরে তাকে পরাজিত করে চেয়ারম্যান পদ দখল করেন এ বাড়িরই আর একজন। আমাদের নতুন বাড়ির সুরুজ কাকা (কাজী নুরুল হুদা চৌধুরী)। উত্তরাধিকারের দিক থেকে তিনি ছিলেন মুজাফফর আলী চৌধুরীর নাতি। চেহারা-সুরতে সুপুরুষ ছিলেন সুরুজ কাকা। গায়ের রং লালচে হলুদ— সুরুজ নামের সার্থক প্রতিচ্ছবি। এরপর থেকে চেয়ারম্যান পদের পালাবদল হতে লাগল এ দুই নিকটাত্মীয়ের মধ্যে। চুটিয়ে শত্রুতা চলল দুজনের মধ্যে। এলাকাবাসী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুজনের পক্ষ নিল। ব্যবস্থা হতে লাগল বড় বড় দাওয়াত-আপ্যায়নের। আইয়ুব আমলের মৌলিক গণতন্ত্রের সময় যেহেতু মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন, সেজন্য মেম্বারদের 'হর্স-ট্রেডিং' চলল সমানে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত মেম্বারদের কদর বেড়ে যেত দারুণভাবে। উভয়পক্ষ যে কজনকে পারেন বাড়িতে এনে মেহেমানদারির নামে একরকম বন্দি করে রাখতেন। পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, কোফতা আর রোস্ট-বিরিয়ানির অন্তহীন আয়োজন চলতে থাকত দিনের পর দিন। শুধু বাড়ি যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হতো না তাদের। পাছে অন্যপক্ষ তাকে ধরে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে চলতে থাকত অন্যপক্ষের এক-আধজন মেম্বার ফুসলিয়ে নিয়ে আসার রকমারি তদবির। গণতন্ত্রের এই মৌলিক অপপ্রয়োগ দুনিয়ার অন্য দেশেও যে ঘটে না, তা নয়। তবে এমন প্রকাশ্য লাঞ্ছনার ঘটনা খুব একটা শোনা যায় না। এসব নীতিবিবর্জিত সময়ে সুনীতি ও শিষ্টাচারের ঝলক মুহূর্তের জন্য হলেও পরিবেশটা প্রীতিপ্রদ করে তুলত। এ ধরনের এক নির্বাচনের সময় আমাদের পুরো পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ আমার জ্যাঠাজান (আব্বার জ্যাঠাতো ভাই) মোহাম্মদ ইসরাইল চৌধুরীও (চোকধন মিয়া) মেম্বার নির্বাচিত হলেন। এটা আমার কাকা কাজী নুরুল হুদা চৌধুরীর জন্য এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করল। পরিবারের এ দুই অংশের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। উভয়ের পিতার সময় থেকেই ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি হওয়ায় প্রকৃত হকদার কে তা নিয়ে উভয় পক্ষের দীর্ঘ ও তিক্ত মোকদ্দমা চলে আসছে। তা ছাড়া সুরুজ কাকা উভয় বাড়ির চাচাতো-জ্যাঠাতো ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আর চিকন জ্যাঠা সর্বজ্যেষ্ঠ। আমাদের দুই বাড়ি (পুরাতন ও নতুন) যদিও খুবই কাছাকাছি, তবু ডিটেনশন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ক্যাম্প কাকাদের নতুন বাড়িতে করলে জ্যাঠার চলাচলের ওপর চোখ রাখা বা তার সমর্থন কোনোভাবে আদায় করা সম্ভব হবে না মনে করে সুরুজ কাকা আমাদের পুরোনো বাড়িতেই শিবির গড়তে মনস্থ করলেন।

কাকার সমর্থক অথবা সমর্থন আদায়ের জন্য একরকম জোর করে আটক করে রাখা মেম্বারদের 'মেহমান' হিসেবে বিবেচনা করে প্রথম শ্রেণির খাতির-যত্ন প্রদান করা হলো। তাদের বাড়িতে গ্রামের দলীয় কর্মী আমাদের চাকর-খাদেম পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় আনিয়ে নেওয়া হলো। বিপদ হলো পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ইসরাইল চৌধুরীকে নিয়ে। তাকে এভাবে বন্দি করে রাখা দূরে থাকু, আলোচনায় শামিল করাও সহজ কাজ নয়। ফলে ঠিক হলো কয়েকজন মেম্বার তার উপদেশ-পরামর্শ নেওয়ার নাম করে বাহির বাড়িতে ডেকে আনবেন। শীতকালের সুন্দর দিন, তাই কাছারিঘরের ভেতরে না বসে বাইরে কলতলায় একটা চেয়ারে বসানো হলো তাকে, বাকিরা মোড়া-পিড়া নিয়ে বসলেন। সুরুজ কাকা এসে জ্যাঠার পায়ের কাছে বসে জ্যাঠার দুই পা ধরে কাকুতি-মিনতি করতে থাকলেন। জ্যাঠা এমনিতেই স্বল্পভাষী, কিন্তু তখন তার অবস্থা দেখে মনে হলো জীবনেও তার বাক্যস্ফুটন হয়নি। তিনিও বসে রইলেন নির্বাক-নির্বিকার। নাছোড়বান্দা সুরুজ কাকাও পড়ে রইলেন দুই পা আঁকড়ে ধরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনভাবে কাটতে লাগল। একসময় আব্বা সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরোলেন। তিনি জ্যাঠার সামনে বসে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুচি করে বিদায় নিলেন। তার পাকা দাড়ি প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছিল। গ্রামের দর্শক ফিসফিসিয়ে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখলে তো চৌধুরীবাড়ির নিয়ম-তাহজিব। বাসু মিয়ার (আব্বার ডাকনাম বাদশা মিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ) দাড়ি প্রায় মাটি ছোঁয়ার উপক্রম, তারপরও এই বয়সে বড় ভাইকে কদমবুচি না করে বাড়ি থেকে বেরোবার রেওয়াজ নাই।'

গ্রাম ও ইউনিয়নের নেতৃত্ব অভিজাত শ্রেণির হাতে থাকলে সরকারি আমলারাও খুশি হতো বেশ। সদ্য হারানো প্রাধান্যের খানিকটা অভাব পূরণ করত এই স্বীকৃতি। আর এটা তাদের খানদানি দাওয়াত-জিয়াফতের পুনরাবৃত্তি করার অজুহাত করে দিত। কাকা চেয়ারম্যান থাকার সময় তাকে দেখেছি এরকম বিরাট বিরাট পার্টি দিতে। এসব অনুষ্ঠান তিনি করতেন সম্পূর্ণ নিজ খরচে। এত লোক দাওয়াত করা হতো যে বাড়ির বিরাট কাছারিঘরেও এর স্থান সংকুলান হতো না, ফলে প্রায়ই ফাজিলের ঘাট স্কুলে এর ব্যবস্থা করা হতো। এতে দাওয়াত পেতেন থানা, মহকুমা ও জেলা সদরের সব পদস্থ অফিসার।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সব রকমের খানদানি খাবারের আয়োজন ছাড়াও কাকা মুখরোচক হাসি-মশকরায় খাবারের টেবিল মাতিয়ে রাখতেন। একবার এ ধরনের মজলিশে তার কাছাকাছি বসেছিলেন 'ডিস্ট্রিক্ট ফ্লাড-কন্ট্রোল অফিসার'। ভদ্রলোকেরও নসিব মন্দ, তরকারির পেয়ালাটা নিতে যাবেন, এমন সময় তার হাত লেগে উলটে পড়ল কাচের পানির জাগটা। পানিতে ভেসে গেল টেবিলটা। কাকাও রসিকতা করতে ছাড়লেন না— বললেন, 'এখন বোঝা গেল আপনি আপনার কাজে সফল হচ্ছেন না কেন! বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন কী, আপনি তো এখানেই বন্যা বয়ে আনছেন।'

আমাদের অঞ্চলের আদিতম ঐতিহাসিক দলিল মেলে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত প্যারিমোহন সেনের *নোয়াখালীর ইতিহাস* গ্রন্থে। প্যারিমোহন সেনের মতে, বাংলা ৬১০ সালে বঙ্গাধিপতি আদিশুরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভর শুর এই অঞ্চলের নামকরণ করেন 'ভুলুয়া'। কোনো সময় ভুলুয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বেগমগঞ্জ ও ফেনী থানার ৩৭.৩৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 'বাবুপুর' স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হয়। ভুলুয়া বা নোয়াখালীর মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি বলেন,

'বঙ্গের মুসলমান রাজধানী হইতে এই দূরবর্তী জেলায় অধুনা বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস দৃষ্ট হয়। এই সুদূর পূর্বাঞ্চলে মুসলমান ধর্মের এই রূপ বিস্তৃতির বিষয় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে মুসলমান বিজেতাগণের বাহুবল অপেক্ষা অন্য কোন শক্তি মুসলমান ধর্ম বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। এই দেশের স্থানে স্থানে পির ফকিরদের সম্মানার্থে প্রতি বৎসর তাহাদের বাসস্থানে মেলা হইয়া থাকে। এই রূপ মেলা এই দেশে দরগা নামে অভিহিত। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান পির ও ফকিরগণ মুসলমান ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তাদের প্রভাবে অনেক নীচ জাতীয় হিন্দুই অধিক পরিমাণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।'

আমাদের পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাও এমন এক পির ছিলেন বলে কথিত আছে।

প্যারিমোহন সেনের নোয়াখালীর ইতিহাসে আমাদের পরিবারেরও উল্লেখ মেলে। যেমন— ৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'বাবুপুরের দুই আনী অংশের পরলোকগত জমিদার কাবিল মিঞার পরিবার এতদাঞ্চলে সম্মানিত।' এরপর বাবুপুর পরগনার গঙ্গাচন্দ্র চৌধুরীর মূল জমিদারি খরিদ করা সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'গঙ্গাচন্দ্র চৌধুরী জমিদারিসংক্রান্ত কার্যে একজন সুদক্ষ লোক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার সময়ে দেনার দায়ে এই জমিদারি নিলাম

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হইলে পূর্ব বাবুপুর নিবাসী মোহাম্মদ কাবিল মিঞা ইহা খরিদ করেন, ইহার দুই পুত্র ছিল। অল্পদিন হইল ইহারা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছেন।' কীভাবে কাবিল চৌধুরীর পুত্ররা পিতার জমিদারি আরও বিস্তৃত করেন, সে সম্পর্কে তিনি লিখেন, 'সদর খাজনার দায়ে শস্টদী নিবাসী মোহাম্মদ ফয়েজ চৌধুরীর চারি আনা অংশ নিলাম হইলে পূর্ব বাবুপুর নিবাসী মনোহর আলী চৌধুরী (কাবিল চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোয়ার আলী চৌধুরী) ইহা ক্রয় করেন।'

চান শাহ ফকির অথবা নামান্তরে শাহ চান্দ আউলিয়া নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ, যিনি প্রকৃতই আনুমানিক ৬০০ বছর আগে বাংলার এই পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নদীপথই যেহেতু সেকালে ভ্রমণের প্রধান মাধ্যম ছিল, সুতরাং নদীপথেই তিনি ঘুরে বেড়াবেন এমনটাই স্বাভাবিক। সেই যুগের নিয়মমতো পথে পথে থেমে, দু-চার বছর কাটিয়ে আবার নতুন করে রওনা করেছেন। তারপর হয়তো যে জায়গাটা বেশি পছন্দ হয়েছে, সেখানে ফিরে এসে বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়ে থাকবেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের গবেষণামূলক গ্রন্থ *A History of Sufism in Bengal*-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি যেখানেই অবস্থান করেছেন, সেই জায়গাকেই তার নাম উপহার দিয়ে ধন্য করেছেন। মেঘনাতীরের কুমিল্লা জেলার চানপুর, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার শ্রীমতী নদীতীরের চান্দখালী এবং সাতকানিয়া থানার শঙ্খ নদীর তীরের চানপুর এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য প্রফেসর এনামুল হক আর এক এবং হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরামস্থল তৎকালীন সুধারাম (নোয়াখালী) জেলার ছোট ফেনী নদীতীরের চানপুরের সন্ধান পাননি। পেলে নিশ্চয়ই এর উল্লেখ করতে ভুল করতেন না। ড. এনামুল হক ধারণা করেন, চতুর্দশ খ্রিষ্টীয় শতকে হজরত চান্দশাহ দিল্লি থেকে বাংলায় আসেন।

ড. এনামুল হক সুফিদের বসত ও বিচরণস্থলকে যে চারভাগে বিভক্ত (পৃষ্ঠা: ১৫৮) করেছেন। তার ভেতরের চট্টলা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি কোথাও সাময়িক, কোথাও স্থায়ী আবাস স্থাপন করেছিলেন। তার বর্ণনায় রয়েছে আর এক কাহিনি।

এই বর্ণনায় হজরত চান্দশাহ ছিলেন অবিবাহিত সিদ্ধ পুরুষ। তিনি দিল্লিতে ছদ্মবেশে অবস্থান করছিলেন। রাজপরিবারের এক নারী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে চাইলেন। সুফি সাধকের অনীহা মানতে রাজি হলেন না রাজকন্যা। প্রমাদ গুনলেন চান্দশাহ, দিল্লি থেকে পালিয়ে এলেন দুর

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বাংলার পূর্বপ্রান্তে— চট্টলায়। স্থান বদল করলেন বারবার। কিন্তু যখন তিনি পটিয়ায় আবাস স্থাপন করলেন, জেদি রাজকন্যা সেখানেও ধাওয়া করলেন তাকে। ড. এনামুল হকের বর্ণনায়, রাজকন্যা হাজির হওয়ার পরপরই চান্দশাহ আউলিয়া ইন্তেকাল করলেন। মাজার তৈরি হলো। রাজদুহিতা মাজারের খাদেম হয়ে থাকলেন। সেখানে আজও নাকি এক প্রাচীন পরিবার আছে, যারা 'চিকন কাজী' পরিবার নামে পরিচিত। কথিত আছে, এরা মাজারের খাদেম পরিবারের উত্তরাধিকারী। যে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই রাজকন্যা। চান্দশাহ আউলিয়া চট্টগ্রামে বহু কথিত বারো আউলিয়ার একজন হিসেবেও প্রসিদ্ধ। অবশ্য এই তালিকায় এমন অনেকের নামও যোগ করা হয়েছে, যারা হয় কখনো চট্টগ্রামে আসেনইনি। আর এমনও রয়েছেন, যারা চট্টগ্রামে স্বল্পকাল থাকলেও পরে অন্যত্র গিয়ে বসতি স্থাপন করে সেখানেই ইন্তেকাল করেছেন। এরকম অন্তত দুজনের প্রমাণ ড. এনামুল হক সাহেবের পুস্তকেও পাওয়া যায়। যেমন বায়েজিদ বোস্তামী। তিনি লিখেছেন, 'Under the circumstances, we can not believe in the tradition of Sultan Bayizid Bostami's arrival in Chittagong before the beginning of tenth century A.D.' (পৃষ্ঠা: ২৯৩)। একইভাবে বারো আউলিয়ার অন্য একজন শাহ ওমরও আসলে নোয়াখালী জেলার ওমরাবাদের (যে এলাকা আজও তার নাম বহন করে) শাহ ওমর, যিনি মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের আমলে নোয়াখালীর এই অঞ্চলে এসে নিজের 'বজরা'য় অবস্থান করে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বাদশার নির্দেশে তিনি এই পরগণাকে তার আবাস হিসেবে নির্বাচন করেন। এমনকি হিন্দু ঐতিহাসিকদের মতে, অসংখ্য লোক তার হাতে ইসলাম ধর্ম কবুল করে।

ঠিক একইভাবে চান্দ শাহ আউলিয়াও হয়তো জেদি শাহজাদির খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য হঠাৎ মৃত্যুর ভান করে পাড়ি জমান অপেক্ষাকৃত অজানা-অচেনা নোয়াখালীর ভুলুয়া পরগণার ছোট ফেনী নদীর তীরে। আর এখানে নির্ধারণ করলেন স্থায়ী ঠিকানা। নতুন অবস্থিতিতে নামেরও ঈষৎ পরিবর্তন হয়— চান্দ শাহ আউলিয়ার বদলে চান শাহ ফকির।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এগারো

স্কুলজীবনের শেষ দুই বছর কাটল অন্যত্র। ফেনীর অদূরে কালিদহের লস্করহাট সতীশচরণ লাহা স্কুলে। এখানে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম পরিবার থেকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা হলো। বাজারের পাশেই ভূঞাবাড়ির জনৈক মমতাজ উদ্দিন ভূঞার গৃহে। তাদের বাড়িটা বেশ বড়, দশ-পনরোটি পরিবারের বসতি। বাইরে কাছারিঘর, পুকুর সবই ছিল, কিন্তু আমার থাকার ব্যবস্থা হলো বাড়ির ভেতরে পরিবারের সঙ্গে। ভূঞা সাহেবের বয়স ষাটের উর্ধ্বে। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তিনি ও তার স্ত্রী একটা ছোট শিশুকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। নাম রাখেন বোধহয় আদর করে 'মিয়া'। সেই ছেলের তখন বয়স ১০-১১। আমার দায়িত্ব হলো তাকে পড়ানো। তাদের ভিতরবাড়ির ঘরে সামনের লম্বা অভ্যর্থনাকক্ষের বাঁ পাশের কামরাটা নির্দিষ্ট করা হলো আমার জন্য। ভূঞা সাহেবের স্ত্রীও চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের হবেন। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অপূর্ণ পুত্রবাৎসল্য উদারভাবে আমার ওপরেও বর্ষণ করলেন। হয়তো এই আনন্দে যে এক পালকপুত্রের পাঠে সহায়তার উসিলায় লাভ করলেন পুত্রসম আরেকজন। সুতরাং আমার সুযোগ-সুবিধা ও আরামের কোনো অভাবই রইল না। পরিবার ছেড়ে এসেও স্থান পেয়ে গেলাম নতুন পরিবারে। সারা জীবন যেভাবে রব্বুল আলামিন পরম করুণাভরে প্রতিটি সংকটকে আমার জন্য সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করে এসেছেন, তার যাত্রা শুরু হলো এখান থেকেই।

লস্করহাট বাজারটার অপর পাশে অবশ্য আমাদের এক আত্মীয়বাড়িও ছিল— মোটবী চৌধুরীবাড়ি। বাগডুবী বাড়ির ফুফাতো বোন নেরু বুজানের স্বামীর বাড়ি। কিন্তু তাদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে আব্বা সেই বাড়িতে আমার থাকা ঠিক মনে করেননি।

স্কুলে আমার অভ্যর্থনা মন্দ হলো না। শিক্ষকদের সবাই সদয়-সস্নেহ ব্যবহার করলেন। স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন অঙ্কের মাস্টার। এতকাল পরে তার আসল নামটা মনে নেই। তবে তার আসল নাম তখনো জানতাম এমন কথা হলপ করে বলতে পারব না। কারণ স্কুলে তার নাম ছিল 'আইএসসি স্যার'। হয়তো বিএসসিও পড়েছেন। পরীক্ষা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ অঙ্কে তিনি যেমন 'তুখোড়' ছিলেন— ফেল করার কোনো সংগত কারণ

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

নেই। লম্বা-ঢেঙা মানুষটার একটু দাড়িও ছিল। প্রায় হাঁটুর ওপর পর্যন্ত লম্বা শার্ট এবং কখনো পাজামা বা প্যান্ট এবং কখনো লুঙ্গি পরে ক্লাসে আসতেন। আমাকে তিনি ডাকতেন 'মিস্টার নিউম্যান।'

অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকেরা আমার মেধা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার অভাবের মান নির্ণয় করে ফেললেন। সাব্যস্ত করলেন যে শুধু অঙ্ক ছাড়া বাদবাকি সব বিষয়ে আমার অবস্থান বেশ ভালো। কিন্তু অঙ্কের অবস্থা এত খারাপ যে, অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেও ম্যাট্রিক পাশটা ফসকে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। উপনিবেশি আমলের 'এক ফেল মানে সব ফেলের' হতচ্ছাড়া নিয়ম হলো এর মূল কারণ। পরে বিলেতে এসে দেখলাম এখানে সিস্টেম পুরো ভিন্ন রকমের। 'ও' লেভেল, জিসিএসই বা 'এ' লেভেলে ছাত্ররা যেসব বিষয়ে পাশ করে, সেগুলোতে পাশের স্বীকৃতি লাভ করে, অন্য কোনো দুর্বল বিষয়ে ফেল করলে সবগুলো খোয়াতে হয় না।

মাস্টাররা প্রমাদ গুনলেন, আইএসসি স্যারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার সঙ্গে আলোচনা করে এর কারণ নির্ণয় ও সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য। আলোচনায় বসে আইএসসি স্যার এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। বললেন, যদিও সবাই একসঙ্গে সব বিষয়ে ভালো হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু সাধারণত ভালো ছাত্র যারা, তারা তাদের দুর্বল বিষয়ে অন্তত মাঝামাঝি ফল অর্জন করে। এটা সম্ভব হয় তাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও দুর্বল বিষয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার কারণে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ভিন্ন, আমার অবস্থা দেখে মনে হয় অংকটা আমি দারুণভাবে অপছন্দ করি আর এতে সামান্যও মনোযোগ দিতে প্রস্তুত নই। এর কারণ কী তিনি জানতে চাইলেন। অংকের প্রতি অনীহাটা কখন আমার মনে প্রথম জাগে, তা অবশ্য আমার মনে অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। বললাম, লক্ষ্মীপুরে প্রাইমারি স্কুলে আমার অবস্থান অংকসহ সব বিষয়ে একই রকমের ভালো ছিল। ফলে ক্লাস ফাইভে বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে কজন ছাত্রকে নির্বাচন করা হলো, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষার আগে স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও রেজাল্ট করেছিলাম চমৎকার। সাহসী গর্বিত মনে হাজির হলাম পরীক্ষার হলে। প্রশ্নপত্র হাতে এলো, একই প্রশ্নপত্রে সব কয়টা বিষয়ে তিনটা করে প্রশ্ন রয়েছে। এর মধ্যে একাধিকের জবাব দিতে পারলে কৃতিত্ব। তবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটা জবাবই যথেষ্ট। সব বিষয়ের প্রশ্নই বেশ সহজ মনে হলো। অংকের প্রশ্ন তিনটা প্রথমে। এর মধ্যে দুটো তো মুখেমুখেই করে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ফেলা সম্ভব মনে হলো। প্রথমটা সরল অংক। ওটাও সহজ, তবে কাগজ-কলম লাগবে। ঠিক করলাম প্রতি বিষয়ে সব কটা প্রশ্নেরই জবাব দেব। প্রথমে বাংলা, ইংরেজি, ভুগোল ও ইতিহাসের জবাব লিখে শেষ করলাম। দুই ঘণ্টার সামান্য বেশি সময় লাগল এতে। পরিদর্শক ভদ্রলোকের প্রিয় ছাত্র ছিলাম। তিনি আমার অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বললেন, এবার অন্তত একটা অঙ্কের জবাব দিয়ে দাও। ভাবলাম, বাকি সোজা দুটো পরে জবাব দেব, আগে সরলটা শেষ করি। অঙ্ক করি— অঙ্ক মেলে না, একবার, দুবার, তিনবার। ভাবলাম, তাড়াহুড়ো করে বোধকরি কোথাও ছোটখাটো ভুল করে ফেলছি। শান্ত হয়ে আবার চেষ্টা করলাম— একই অবস্থা। পাতার পর পাতা শেষ হয়ে গেল। নতুন করে কাগজ চেয়ে নিলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে স্যার বোঝাতে লাগলেন— ছেড়ে দাও ওটা, অন্য একটা করে ফেল, সময় প্রায় শেষ। তখন আমার জেদ চেপে বসেছে, কেন হবে না, হতেই হবে। বাকি দুটো করতে তো মোটেই সময় লাগবে না। এটা আগে করে নিই। সর্বোত্তম ফল লাভ করতে হলে অন্য বিষয়গুলোর মতো অঙ্কও তিনটারই জবাব দিতে হবে। স্যারের অনুরোধ, উপরোধ, ধমকি-হুমকি সব বৃথা গেল। একসময় ঘণ্টা বেজে গেল। হুকুম হলো— 'লেখা বন্ধ করো'। একজন ইনভেজিলেটার এসে খাতাটা টেনে নিয়ে গেলেন। আমি আসমান থেকে পড়লাম যেন। বৃত্তি পেলাম না। সেই থেকে অঙ্ক আমার দুশমন। অন্যান্য বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও অঙ্কে হয় ফেল অথবা প্রায় ফেল করতাম। তা সত্ত্বেও মোট নম্বর বেশি থাকত বলে ক্লাসে আমাকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হতো। আইএসসি স্যার সহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে বললেন— অন্য পরীক্ষা যাই হোক, ম্যাট্রিকুলেশান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এতে তোমায় যেমন করেই হোক অঙ্কে পাশ করতে হবে। হেডমাস্টার হুকুম দিয়েছেন, সুতরাং স্কুল এবং আমি তোমাকে সব সহায়তা দিতে প্রস্তুত। শুধু তোমাকে নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে বেশ পরিশ্রম করতে হবে। তাদের ঐকান্তিক দয়া, দোয়া ও পরিশ্রম সফল হয়েছিল, ৪০ নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোনো রকম অঙ্কে পাশ করে তাদের ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম।

ছুটিছাঁটায় বাড়ি যেতাম। লস্করহাট থেকে পায়ে হেঁটে মাইল দেড়েক দূরের কালীদহ স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে ফেনী। কালীদহ থেকে ফেনী শুধু এক স্টেশন— দূরত্ব তিন মাইল। মাঝেমধ্যে ট্রেন না পেলে হেঁটেও চলে যেতাম। 'দহ' শব্দটার অর্থ হলো নিচু জলাভূমি। জলাশয় নয়, তাই সারা বছর পানি থাকে না, তবে বছরে অন্তত ছয় মাস পানি থাকে এতে। কয়েক মাইল পরিধির বিশাল জলাভূমি, এখানে ফসল ফলে শুধু শীতকালে। বর্ষায় মাছই এর প্রধান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

উৎপন্ন দ্রব্য, আর মাছ মেলেও অনেক। একপাশে বেড়িবাঁধের মতো বিরাট উঁচু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা চলে গেছে কালীদহ থেকে লস্করহাট এবং তারপরেও। এই দহটাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ তাদের যুদ্ধকৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফেনী ছিল মিত্রশক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এখনো পরিত্যক্ত বিশাল সামরিক বিমানঘাঁটি এর প্রমাণ বহন করে। এ কারণে অক্ষশক্তির, বিশেষ করে জাপানের এটা ছিল একটা বিশেষ টার্গেট। বিমানঘাঁটিটা অকেজো করার জন্য দারুণ ব্যস্ত ছিল জাপান। রাতে বোমারু বিমান পাঠাত জাপান। তখন শরৎকাল, পানিতে টইটম্বুর ফেনীর পাশের কালীদহ। রাতে ফেনীতে থাকত ব্ল্যাক আউট আর হাজার হাজার তেলের কুপি-দীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হতো কালীদহের জলে। বিমান থেকে মনে হতো এটাই ফেনী শহর। জাপানি পাইলটরা বোমাবর্ষণ করে যেত অবিরাম— জলে ফেলা আর বলে কাকে। প্রতিবার দহটার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মনের চোখে ভেসে উঠত এই সামরিক ফাঁকিবাজির চিত্র।

লস্করহাটে একবার প্রচণ্ড ভোগান্তি হলো পেটের অসুখে। অসহ্য পেটে ব্যথা, দাস্ত ও বমিতে দারুণ কাহিল হয়ে পড়লাম। বাড়ি যাওয়ার জন্য উচাটন হয়ে উঠল মন। কিন্তু লজিংবাড়ির কেউ এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। আমার ছাত্র 'মিয়া' ও তার বাবা-মা সেবা-শুশ্রূষার চূড়ান্ত নজির পেশ করলেন। বাড়ি যেতে চাইলেই তারা ভাবতেন যে আমি বোধকরি তাদের আদর-যত্নে সন্তুষ্ট নই। ফলে বাধ্য হয়েই এ প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। পরিবর্তে জলদি ভালো হয়ে ওঠার এবং যতটা ভালো হয়েছি তার চেয়েও বেশি ভালো দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষে যখন তারাও আমার আরোগ্য সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেন, তখন অনুমতি নিয়ে রওনা হলাম। কালীদহের পথে কতকটা এগোতেই বুঝতে পারলাম যে পুরোপুরি আরোগ্যলাভ আসলে করিনি, বরং শরীর এখনো দারুণ দুর্বল। পেটটা যেন আবার মোচড়াতে শুরু করল। ভাবলাম, কোনো রকমে কালীদহে পৌঁছাতে পারলেই হলো। ট্রেনে চড়ে বসব, তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

কিন্তু বিধির বিপাক আর বলে কাকে— স্টেশনে পৌঁছে দেখি আমার ট্রেনটা ক্যানসেল হয়ে গেছে— কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর কোনো ট্রেন নেই। এমন অবস্থা আগেও হয়েছে, তখন অবশ্য পরোয়া করিনি বিন্দুমাত্র। ফেনী মাত্র তিন মাইল, সুতরাং পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেছি। কিন্তু এখন? এই শরীর নিয়ে অতদূর হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব? তাছাড়া পূর্বাহ্নের রোদের তেজও ক্রমেই প্রখরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাড়ি যে আমার না গেলেই নয়। ফিরে গেলে এরা সহজে আর বেরোতে দেবে না। তাছাড়া ফিরে যেতে হলেও হাঁটতে তো

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

উৎপন্ন দ্রব্য, আর মাছ মেলেও অনেক। একপাশে বেড়িবাঁধের মতো বিরাট উঁচু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা চলে গেছে কালীদহ থেকে লস্করহাট এবং তারপরেও। এই দহটাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ তাদের যুদ্ধকৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফেনী ছিল মিত্রশক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এখনো পরিত্যক্ত বিশাল সামরিক বিমানঘাঁটি এর প্রমাণ বহন করে। এ কারণে অক্ষশক্তির, বিশেষ করে জাপানের এটা ছিল একটা বিশেষ টার্গেট। বিমানঘাঁটিটা অকেজো করার জন্য দারুণ ব্যস্ত ছিল জাপান। রাতে বোমারু বিমান পাঠাত জাপান। তখন শরৎকাল, পানিতে টইটম্বুর ফেনীর পাশের কালীদহ। রাতে ফেনীতে থাকত ব্ল্যাক আউট আর হাজার হাজার তেলের কুপি-দীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হতো কালীদহের জলে। বিমান থেকে মনে হতো এটাই ফেনী শহর। জাপানি পাইলটরা বোমাবর্ষণ করে যেত অবিরাম— জলে ফেলা আর বলে কাকে। প্রতিবার দহটার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মনের চোখে ভেসে উঠত এই সামরিক ফাঁকিবাজির চিত্র।

লস্করহাটে একবার প্রচণ্ড ভোগান্তি হলো পেটের অসুখে। অসহ্য পেটে ব্যথা, দাস্ত ও বমিতে দারুণ কাহিল হয়ে পড়লাম। বাড়ি যাওয়ার জন্য উচাটন হয়ে উঠল মন। কিন্তু লজিংবাড়ির কেউ এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। আমার ছাত্র 'মিয়া' ও তার বাবা-মা সেবা-শুশ্রূষার চূড়ান্ত নজির পেশ করলেন। বাড়ি যেতে চাইলেই তারা ভাবতেন যে আমি বোধকরি তাদের আদর-যত্নে সন্তুষ্ট নই। ফলে বাধ্য হয়েই এ প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। পরিবর্তে জলদি ভালো হয়ে ওঠার এবং যতটা ভালো হয়েছি তার চেয়েও বেশি ভালো দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষে যখন তারাও আমার আরোগ্য সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেন, তখন অনুমতি নিয়ে রওনা হলাম। কালীদহের পথে কতকটা এগোতেই বুঝতে পারলাম যে পুরোপুরি আরোগ্যলাভ আসলে করিনি, বরং শরীর এখনো দারুণ দুর্বল। পেটটা যেন আবার মোচড়াতে শুরু করল। ভাবলাম, কোনো রকমে কালীদহে পৌঁছাতে পারলেই হলো। ট্রেনে চড়ে বসব, তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

কিন্তু বিধির বিপাক আর বলে কাকে— স্টেশনে পৌঁছে দেখি আমার ট্রেনটা ক্যানসেল হয়ে গেছে— কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর কোনো ট্রেন নেই। এমন অবস্থা আগেও হয়েছে, তখন অবশ্য পরোয়া করিনি বিন্দুমাত্র। ফেনী মাত্র তিন মাইল, সুতরাং পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেছি। কিন্তু এখন? এই শরীর নিয়ে অতদূর হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব? তাছাড়া পূর্বাহ্নের রোদের তেজও ক্রমেই প্রখরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাড়ি যে আমার না গেলেই নয়। ফিরে গেলে এরা সহজে আর বেরোতে দেবে না। তাছাড়া ফিরে যেতে হলেও হাঁটতে তো

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হবে! প্রশ্ন হলো— দেড় মাইল হাঁটব, না তিন মাইল? শেষে ঘরমুখো বাঙালির বাড়ি যাওয়ার আকুতিরই জয় হলো। রেললাইনের পাশ ধরে পা চালালাম ফেনী অভিমুখে। কিন্তু পা যে আর চলে না— সীমাহীন দুর্বলতায় আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বার কয় বমিও হয়ে গেল। পেটে ব্যথার সঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে এলো জ্বর। এতৎসত্ত্বেও থামলাম না, প্রাণপণ চেষ্টা করে এগিয়ে গেলাম। আশপাশের চিহ্ন-নিশানা দেখে মনে মনে হিসাব করে দেখতে লাগলাম কতটুকু এসেছি, আর কতটা বাকি। প্রচণ্ড রোদে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। চোখে কখনো সর্ষে ফুল কখনো অন্ধকার দেখতে লাগলাম। দাঁড়িয়ে থাকাটাও অসম্ভব হয়ে গেল, নিমেষের জন্য সম্বিত হারিয়ে পড়ে গেলাম। কিন্তু এই জনমানবহীন রেলপথের ধারে পড়ে থাকার ভয়াবহ পরিণতি ভেবে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে আবার উঠে দাঁড়ালাম, চলতে শুরু করলাম। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া গেল না, পড়ে গেলাম আবারও।

এ পথচলা যেন মানবশিশুর প্রথম চলতে শেখার মতোই। এমনিভাবেই জীবনের দুর্গম পথ ধরে এক পা, দুই পা করে এগিয়ে চলে মানুষ, কখনো আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, আবার কখনো বাঁধার প্রাচীরে হোঁচট খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে। জীবনের পথটা ক্ষুদ্র হলেও তখন মনে হয় দীর্ঘ-অশেষ, দুর্গম-অনতিক্রম্য। কিন্তু দূর থেকে হাতছানি দেয় গন্তব্যের— সাফল্যের স্বর্ণতোরণ— তার প্রাণপাত জীবনসংগ্রামের অনিবার্য, যথোপযুক্ত পুরস্কার। সংগ্রামই তার পথ, তার জীবনের আদি-উত্তরাধিকার। হাল ছেড়ে দেবে সে? কিছুতেই নয়।

হাল ছাড়লাম না আমিও। কিন্তু তাই বলে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম এমনও নয়। ফেনী যে এতদূরে, তা এমন করে আর কখনো বুঝিনি। একটা ট্রেন উল্টো দিকে চলে গেল। এসময় পাশ দিয়ে হাঁটা বিপজ্জনক ভেবে বসে রইলাম। ট্রেনটা পার হয়ে গেলে চেষ্টা করলাম উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু ওঠা কি যায়? পা যে আর চলে না। তবু কষ্টে, অতিকষ্টে আরও খানিকটা গেলাম, আবার জিরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর একসময় ফেনী স্টেশনের সিগন্যাল পোস্টটা নজরে পড়ল। আশায় নেচে উঠল অন্তরমন— এই তো এসে গেলাম, ফেনী আর দূর নয়। শরীরের প্রতিবিন্দু শক্তি নিংড়ে পাঠালাম পা দুটোতে। তারপর সিগন্যাল পোস্টটা লক্ষ্য করে চলতে শুরু করলাম। দুর্বলতায় ক্লান্তিতে মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিল, চোখে দেখছিলাম অন্ধকার। মাথায় অসহ্য ব্যথা। সিগন্যালটার কাছে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখি আমি একটা লম্বা অপরিচিত কক্ষে বিছানায় শুয়ে আছি— হাসপাতালের বেড— ফেনী হাসপাতাল। অন্যান্য বেডে আরও লোক শুয়ে আছে। একটা বোতলের সঙ্গে যুক্ত পাইপ আমার হাতে গেঁথে দিয়ে কী একটা তরল পদার্থ প্রবেশ করানো হচ্ছে আমার ধমনীতে। মাথাব্যথা তখনো যায়নি। চিকিৎসাকর্মীদের কাছে যা শুনলাম তার সারমর্ম হলো, অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে পড়ে থাকতে দেখে নিকটে কর্মরত রেল কর্মচারীরা ধরাধরি করে রাস্তায় বয়ে এনে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সে যুগে ফেনী হাসপাতালে কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না।

আমরা ছিলাম ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'ম্যাট্রিকুলেশন'-এর সর্বশেষ ব্যাচ। ১৯৬২ সালের পর থেকে নতুন 'সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট' (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হয়। সেই সঙ্গে শিক্ষাবছরও করা হয় পরিবর্তন। ফলে আমাদের বরদাস্ত করতে হয় সুদীর্ঘ আঠারো মাসের বছর। দীর্ঘ স্কুল ছুটির দিনগুলো বাড়িতেই কাটাতাম 'রিভিশন' আর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। এ বছরটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বুড়ো মৌলবি সাহেবের কবর খোলার ঘটনায়।

বুড়ো মৌলবি সাহেব বা 'বুড়া হুজুর'-এর পুরো নাম মৌলবি হোসেন আহমদ। ১৯৬১ সালে তিনি ইন্তেকাল করলে আমাদের বাড়ির পাশে তার থাকার জন্য দেওয়া বাড়ির দরজায় রাস্তার পাশ ঘেঁষে তাকে সমাহিত করা হয়। গ্রামের লোকেদের ধারণা, মৃত্যুকালে তার বয়স ১২০ বছর হয়ে থাকবে। অত না হোক, শত বছরের ওপরে যে তার বয়স হয়ে থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। চুল-দাড়ি ছাড়াও তার দীর্ঘ লম্বা ভুরু পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার জ্যেষ্ঠপুত্র রশিদের বাপেরও ভুরু আধপাকা ছিল। তখন সম্ভবত শ্রাবণ মাস, দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিল। চাকর ছেলেটা ছুটে এলো কাছারিঘরে, আবেগে উত্তেজনায় তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। যা বলতে চাইল তা হলো, দক্ষিণের পুকুরের জানে (পুকুরের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাড় দিয়ে ধানের জমিন পর্যন্ত কাটা নালা) যেখানে তার বসানো আন্তাটার (বাঁশের সরু কঞ্চি দিয়ে বানানো একধরনের মাছ ধরার ফাঁদ, যা পানিবাহী নালায় বসানো হতো) সামনে মাছের নাকি জোয়ার এসেছে। গোল্লায় গেল পরীক্ষার পড়া— তীরের মতো ছুটে গেলাম পুকুরপাড়ে। দক্ষিণের পুকুরের জানটা (নালা) বেশ লম্বা, পুকুরের উত্তর পাড়ে ঘাটলার পর নারকেল-সুপারি বাগানটার ভেতর দিয়ে সামনের নিচু ধানের জমিনগুলো পর্যন্ত চলে গেছে। পুকুরের কাছ ঘেঁষে আন্তাটা বসানো, বাকি সারাটা নালা পানিতে ভর্তি থাকার কথা। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পানির চিহ্নও নেই। তার বদলে হাজার হাজার ছোট-বড় দুধসাদা পুঁটি মাছ সারা নালাটায় খল খল করছে। আন্তার কি সাধ্য আছে এত মাছ ধারণ করে। দিশেহারা চাকর ছেলেটা বুঝতেই পারছিল না কী করবে। বললাল, এক কাজ করা যাক, ঠিক করলাম একবারে শেষ প্রান্তে ধানের জমির পাশে বাঁধ দিয়ে সবগুলো মাছ ছেঁকে তুলি। তাই করলাম, কয়েকটা বড় কোরা (বাঁশ ও বেতের বানান ঝুঁড়ি) ভর্তি হয়ে গেল চকচকে সাদা পুঁটি মাছে। ভেতরবাড়ির উঠানে বয়ে নিয়ে মাত্র গেছি। কে একজন ছুটে এলো। বলল— শুনেছেন, বৃষ্টিতে বুড়ো মৌলবি সাহেবের কবরটা ভেঙে গেছে— মৌলবি সাহেবের লাশটা দেখা যাচ্ছে— যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। অবিশ্বাসের সুরে বললাম— ধুর ছাই, কী যে বলো তার ঠিক নাই, এক বছরের পুরোনো লাশ কি আর আস্ত থাকে! ছেলেটা জোর করে বলল, সত্যি সত্যি আছে। আসুন না নিজেই দেখুন, আমিও অবশ্য তাই ভাবছিলাম। ছুটে গেলাম মৌলবিবাড়ির দিকে।

কবরের জায়গাটা সাধারণ ফসল ফলানোর ক্ষেত ছিল। অন্যান্য কবর বাড়ির মতো উঁচু ভিটা নয়। কবর দেওয়ার পর কিছু মাটি ওপরে ফেলে সামান্য উঁচু করা হয়েছে। কিন্তু শ্রাবণের মুষলধারার বৃষ্টিতে সেই মাটিটা গলে গিয়ে পড়েছে পাশের নিচু জমিতে। তাই উন্মোচিত হয়ে গেছে বছরকালের কাঁচা কবর। কাছে গিয়ে যা দেখলাম তা সত্যিই নিজের চোখে না দেখলে আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিতাম। দেখলাম, বৃদ্ধ মৌলবি সাহেবের মরদেহটা সম্পূর্ণ অক্ষত-অবিকৃত। কফিনের কাপড়টারও বাহ্যিক কোনো বিকৃতি নজরে পড়ল না। কবরের চারপাশে কাপড়ের পর্দা খাটিয়ে লোকেরা কবরের ভেতরে নেমে কাফনের চারপাশে পড়া মাটিগুলো কাচিয়ে সরিয়ে আনল। তারপর বাঁশের একটা ছইয়ের মতো দেওয়া হলো, যাতে করে ওপরে দেওয়া মাটি শরীরটার ওপর না পড়ে। নতুন করে সমাহিত করা হলো বুড়ো মৌলবি সাহেবকে।

বুড়ো মৌলবি সাহেবকে আমরা 'মৌলইছা দাদা' (মৌলবি সাহেব দাদা) ডাকতাম। তার পুরো নাম মৌলবি হোছাইন আহমদ। যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, এটা তার পৈতৃক ভিটা নয়। মসজিদের চাকরি গ্রহণ করার পর আমাদের ওয়াক্ফ থেকে এ বাড়ি এবং তার সঙ্গে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আরও পাঁচ কানি জমি তাকে লা-খেরাজ বা খাজনামুক্ত প্রদান করা হয়েছিল। তার মনোনয়ন হয়েছিল মেজো চৌধুরী, অর্থাৎ মুজাফফর আলী চৌধুরীর সময়ে। কথিত আছে, মনোনয়ন লাভে প্রত্যাশী মৌলবিদের, শুক্রবারে ডাকা হতো খুতবা ও নামাজের মাধ্যমে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। মসজিদের মুতাওয়াল্লি মুজাফফর আলী চৌধুরী অনেক দেরি করে আসতেন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মসজিদে। অমন ডাকসাঁইটে জমিদারের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে বেচারা চাকরিপ্রত্যাশী মৌলবি অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে থাকতেন। চৌধুরী সাহেব এলে শুরু করতেন খুতবা। নামাজ পড়ার পর খাওয়ার দস্তরখানে চৌধুরী তাকে জানাতেন তার সিদ্ধান্ত— না চাকরি তিনি পাননি। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন মৌলবি। অনেকেই ব্যর্থ হলেন এভাবে। তারপর যুবক মৌলবি হোছাইন সাহেব এলেন এক শুক্রবার ইন্টারভিউ দিতে। খুতবার সময় হলে তিনি মিম্বরে উঠে বসে মুয়াজ্জিনকে ইশারা করলেন আজান দিতে। বিপদে পড়লেন মুয়াজ্জিন, আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু চৌধুরী সাহেব এখনো আসেননি। নির্বিকার স্বরে জবাব দিলেন যুবক ইমাম, সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি, নামাজ সময়মতো হবে, কারো জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। আজান শুরু হতেই চৌধুরী প্রবেশ করলেন। নামাজ বাদে মুসল্লিরা বলাবলি করতে লাগলেন, অপেক্ষা করেও আগের মৌলবিরা চাকরি পাননি— এই ইমামের মনোনয়ন পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। দস্তরখানে মেজো চৌধুরী বললেন, মৌলবি সাহেব, আপনি কবে থেকে কাজে যোগ দিতে পারেন? চাকরি হয়ে গেল— মৌলবি হোছাইন সাহেবের।

হোছাইন মৌলবি সাহেবের ছিল অনেক পুত্র-কন্যা। অতবড় মৌলবিবাড়িটা ভরে গেল তার ছেলেদের ঘরে। বৃদ্ধ হলেও বয়সের ভার তাকে নুইয়ে দিতে পারেনি। জীবনের সম্ভবত শেষ বছরটায় তিনি কিছু কিছু নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারেননি। বাকি শীত হোক কি বর্ষা, প্রতি ওয়াক্তে সঠিক সময়ে মসজিদে হাজির হতে দেখেছি তাকে। তিনি ভাবগম্ভীর ইসলামি আলোচনা যেমন করতেন, ঠিক তেমনি মজা পেতেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও হাস্য-কৌতুকে। ইমান, ইসলাম, বেহেশত-দোজখের ওজস্বী বিষয়গুলোও তিনি এভাবে সহজ করে পেশ করতে পারতেন। তার জনপ্রিয়তার কোনো সীমা ছিল না।

আমরা তাকে দাদা ডাকতাম, সেই সুবাদে তিনিও আমাদের সঙ্গে রস-তামাশা-কৌতুক করার সুযোগ ছাড়তেন না। নিজেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ছড়া কেটে কেটে কথা বলতেন তিনি, বেশির ভাগই আদি, অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল নোয়াখালীর ভাষায়। যেমন—

'আঁর নাম হোছুইন্যা
আঁই কতা গান কই খোঁচাইন্ন্যা।
কতা গান কই হক,
হুইনতে লাগে না ঢক্।'

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সরল বাংলায় অনুবাদ করলে অনেকটা এমন হবে, 'আমার নাম হোছাইন (য'ফলা আকার নামের সঙ্গে তুচ্ছার্থে যোগ হয়)। আমি কথাগুলো খোঁচা দিয়ে বলি। (কিন্তু) কথাগুলো বলি হক, (যদিও) শুনতে ভালো লাগে না।'

তা না লাগুক, কিন্তু তার সেই সস্নেহ খোঁচাজড়িত হেদায়াতের বাণীর জাদুময় প্রভাব গ্রামবাসীকে অন্তত তার জীবদ্দশায় ইমান ও আমলের জান্নাতি পথে কায়েম রেখেছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় এসে গেল। পরীক্ষার কেন্দ্র পড়ল মহকুমা শহর ফেনীর বিখ্যাত পাইলট স্কুলে। ফেনীতে পরীক্ষার সময়টা থাকব কোথায় তার খোঁজ পড়ল। মফস্বলের ছাত্ররাও এ সময় শহরে এসে আত্মীয় বা পরিচিতজনের বাসায় অথবা ভাড়া করা মেস ইত্যাদিতে স্থান করে নেয়। এই শহরে আমাদের আত্মীয়স্বজনের অভাব ছিল না। কিন্তু আব্বা তার বন্ধু ও পিটিআইয়ের (প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) প্রিন্সিপাল এজাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসাটাই নির্বাচন করলেন। ইনস্টিটিউটের বিরাট ক্যাম্পাসটা শহরের ঠিক মাঝখানে। পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবেনা। এজাজউদ্দিন সাহেব ও তার স্ত্রীকে লক্ষ্মীপুর থেকেই খালুজান ও খালাম্মা ডাকতাম। তাদের বড় দুই ছেলেমেয়ে জাফর ও হেলেন ছেলেবেলা থেকেই আমার খেলার সাথি। আমি খুশিই হলাম এ ব্যবস্থায়। পিটিআই ক্যাম্পাসের এক কোনায় প্রিন্সিপালের বাসা। লম্বা একতলা দালান। ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকারে গড়া। প্রথমে বারান্দা ওয়ালা কামরাটা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর বাঁয়ে লাগানো লম্বা অংশে দুটো কামরা, এর মধ্যে মাঝের কামরাটা পড়ার ঘর, যাতে জাফরের থাকারও ব্যবস্থা, এর পরের বিরাট লম্বা হলঘরের মতো বেডরুমটার এক প্রান্তে খালাম্মা-খালুজান থাকতেন, অন্য প্রান্তে এক খাটে হেলেন ও খুকি অন্যটায় খোকা। জাফর বৈঠকখানায় থাকার ব্যবস্থা করল তার নিজের জন্য। যাতে রাতবিরাতে পরিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই চট করে কেটে পড়তে পারে। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো মাঝের পড়ার ঘরে। যেখানে পড়ার টেবিলে হেলেনও আমার সঙ্গে পড়ত।

জাফর আমার সমবয়সি ও বাল্যবন্ধু হলেও আচার-আচরণে বয়োপ্রাপ্ত যুবকের মতো ঝুনো হয়ে উঠেছিল। শহরে বড় হওয়ার সব উপসর্গই রপ্ত করেছিল সার্থকভাবে। ইতোমধ্যে সিগারেট ধরেছিল, প্রায় প্রতিরাতে খালাম্মা-খালুজান ঘুমানোর পর বেরিয়ে পড়ত সিনেমার সেকেন্ড শো দেখার জন্য। অনেক রাতে চুপিচুপি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ত। আমাদের বালসুলভ হালকা হাস্যকৌতুকে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সে খুব যে মজা পেত না, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যেত। প্রায়ই গুনগুন করে সিনেমার গানের কলি আওড়াত। আমার পড়ার টেবিলে হেলেনের পড়া নিয়ে হেলেনকে (এবং সময় সময় আমাকেও) রসালো খোঁচা মারতে কসুর করত না। হেলেন ক্ষেপে গিয়ে খালাম্মার কাছে নালিশ দিত। হেলেনকে এবং আমাকে ঘিরে ছেলেবেলা থেকেই দুই পরিবারে ভাইবোনেরা মন্তব্য করে আসছিল। কিন্তু বয়স আমাদের এতই কম ছিল যে, এসব মন্তব্য কেউ গুরুত্ব দিত না। আমাদের মধ্যেও এর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু তারুণ্যের এই উচ্ছল উন্মেষের মুহূর্তে এ ধরনের মন্তব্যের গভীর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আমরাও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না।

খালাম্মা-খালুজানের পরিষ্কার সতর্কবাণীর কারণে জাফর আমাকে তার বহির্মুখী অভিযাত্রার সাথি বানানোর সাহস করত না। কিন্তু একদিন মুরুব্বিদের অনুমতি নিয়েই আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল সিনেমায়। সুরত মহল সিনেমা ট্রাংকরোডের ওপরই, সুতরাং বাসা থেকে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। খালাম্মা প্রথম শোর অনুমতি দিলেন। সুতরাং সন্ধ্যার একটু পরেই তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। সেকালে সিনেমায়ও পুরুষ-নারীর পৃথক বসার ব্যবস্থা ছিল। শুধু স্বামী-স্ত্রী ওপরের ব্যালকনিতে একসঙ্গে বসতে পারত। নিয়মিত দর্শক হিসেবে জাফরের পরিচিতি ছিল যথেষ্ট। আমাদের দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে সে দ্বাররক্ষীর সঙ্গে কী যেন ফিসফাস করে বলে এসে আমাদের বলল ওপরে যেতে। বললাম, 'তুই আসছিস না?' সে জানাল অন্যত্র বসবে, ইন্টারভ্যালে দেখা হবে। দ্বাররক্ষীও মুচকি হেসে যেতে দিলো আমাদের। হেলেন বলল, সে তার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেবে। ওপরে গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়লাম। সিনেমা শুরু হলো: উত্তম-সুচিত্রার ক্লাসিক— 'হারানো সুর'। আর এই প্রেমঘন উপাখ্যান ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে থাকা একজোড়া তরুণ-তরুণীর হৃদয়মনকে যে রোমাঞ্চিত করে তুলবে, তাতে আর সন্দেহ কী? সেই প্রায়ান্ধকার হলে এক-আধবার আড়চোখে পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া ছাড়া সেই রোমাঞ্চ আর কোনো বাঁধ ভাঙল না। সিনেমা শেষ হলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরদিন দুপুরের পরে পড়তে বসে আমার নোট খাতার একটা পাতার মাঝখানে নতুন করে লেখা দুটো লাইন নজরে পড়ল।

'নাইলনের শাড়ি পাইলটের পেন
উত্তমের হাতে সুচিত্রা সেন।'

হেলেনের হাতের লেখা, কিন্তু তাৎপর্য কী বোধগম্য হলো না।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তাৎপর্য যে অত সহজে বোধগম্য হয় না— একথা বুঝতে অবশ্য অনেক কাল লেগেছে। শুধু আমি কেন, নারীর রহস্যময়ী ধাঁধা পাঠোদ্ধার করতে হিমশিম খেয়ে গেছেন পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকেরা পর্যন্ত। দীর্ঘ রাত ধরে পড়ার টেবিলে পরীক্ষার প্রস্তুতি করতাম। সাড়ে নটা-দশটার দিকে খালাম্মা-খালুজান আর ছোট দুই ভাইবোন খোকন ও খুকি ঘুমিয়ে পড়ত। আর জাফর চুপি চুপি ছুট দিত সেকেন্ড শো দেখার জন্য। শুধু হেলেন বসে থাকত পড়ার টেবিলে আমার পাশে। আমার মতো তার ফাইনাল পরীক্ষা সামনে নেই, তবু পড়ার এত কী তাগাদা কে জানে! এমন এক রাতে বার কয়েক হাই তুলে খোলা বইটার ওপর মুখ রেখে চোখ বুজল সে। তা-ও আবার উল্টো দিকে নয়, আমার দিকে ফিরে। ছোট টেবিলটার একপাশ দেয়ালে, আরক পাশ আমার খাটের সঙ্গে লেগে আছে। খাটের উল্টো দিকের পাশ ঘেঁষে পাশের কামরায় যাতায়াতের দরজা, তাই দেয়ালের উল্টো দিকে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসতে হতো আমাদের। সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ঠ যে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে বসার মতো অবস্থা। ঘুমন্ত হেলেনের নিঃশ্বাস আঘাত হেনে চলল আমার খোলা হাতটায়। সেই আঘাতে শিহরিত-রোমাঞ্চিত হতে শুরু করল দেহের প্রতিটি অনুকণা। গোল্লায় গেল পরীক্ষার প্রস্তুতি। দুচোখজুড়ে উপভোগ করতে শুরু করলাম নিদ্রিতা পঞ্চদশীর প্রস্ফুটিত মুখশোভা। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল দেহের শিরায় শিরায়। সেই শোভার দারুণ আকর্ষণে ঝুঁকে পড়া থেকে আমার ঠোঁট দুটো বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম। সেই সংগ্রাম যে এত কঠিন হতে পারে কল্পনাও করিনি। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেলাম, ঘামে ভিজে গেল সারা শরীর। টেবিল ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে পায়চারি শুরু করলাম। উত্তপ্ত শরীরটা প্রশান্তি পেল রাতের স্নিগ্ধশীতল বাতাসে। কামরায় ফিরে এসে দেখি হেলেন টেবিলে নেই, তার বইটা আগের মতোই খোলা পড়ে আছে। আশ্বস্ত হলাম, ভাবলাম শুতে চলে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই আশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলো না, হঠাৎ নড়াচড়ার শব্দ শুনে টেবিলের পাশে আমার বিছানাটার দিকে চোখ পড়তেই দেখি মশারির ভেতর শুয়ে আছে হেলেন। শুতে সে ঠিকই গেছে, তবে ভেতরের কামরায় নিজের বিছানায় নয়। কী করে আবার আগুন জ্বলে উঠল মাথায়, কী তার অভিপ্রায় কে জানে! এমন এক নাটকীয় মুহূর্তের বর্ণনা অনেক কাল পরে কোরআনে পড়েছি— সুরা ইউসুফে, মিশরের রানি যখন যুবক ইউসুফকে ডাক দিয়েছে, কোরআনের ভাষায়, 'কালাত হাইতা লাক্'— 'মেয়েটি ডাকল, আমার দিকে আয়।' হেলেন যদি সেদিন ডাক দিয়েও থাকে, সেটা মিশরীয় সুন্দরীর মতো সরাসরি ছিল না। আর নিজেকে মহামতি হজরত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ইউসুফের সঙ্গে তুলনা করার ধৃষ্টতাও আমার নেই। ইউসুফ জবাব দিয়েছিলেন, 'মায়াজ আল্লাহ'— 'আল্লাহর আশ্রয় চাই' বলে। আমার ভেতরে আল্লাহর ভয়ও ছিল বটে, তবে গোটা পরিবার, সমাজ এবং পাশের কামরায় ঘুমন্ত আমার মেজবোন হেলেনের আব্বা-আম্মার চিন্তাটা ছিল আরও তাৎক্ষণিক, আরও নগদ। উপেক্ষা করলাম ঘুমন্ত সুন্দরীকে, স্থির করলাম প্রাণপণে মন দেওয়ার পড়াশোনায়। কিছুক্ষণ পর সে উঠে বিনা বাক্যে ভেতরে চলে গেল নিজের বিছানায়। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। আরও খানিক পরে আলো নিভিয়ে আমিও শুয়ে পড়লাম। বালিশটা তখনো হেলেনের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর।

পরদিন থেকে হেলেন অসুখের অজুহাতে পড়ার টেবিলে এলোনা বেশ কয়েকদিন। অন্যত্রও কথোপকথন হয়ে এলো সংযত-সংক্ষিপ্ত-নেহাত যেটুকু না বললে চলে না। পরিবর্তন অবশ্য নজরে পড়ল সবার। ঠোঁটকাটা জাফর তো বলেই বসল: মান-অভিমান চলছে বুঝি? পরীক্ষার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম। অফুরন্ত অবসর কাটল আমার অতি প্রিয় 'হবি'গুলোর চর্চায়— বইপড়া, মাছধরা, আড্ডা, গল্পগুজব, ডাকটিকিট কালেকশন, পল্লি উন্নয়নের নানা উদ্যোগ, রাজনীতিচর্চা, লেখালেখি আর আত্মীয়বাড়ি বেড়ানো। স্মৃতির পাতা থেকে প্রায় মুছে গেল পরীক্ষার দিনগুলোর প্রায়-রোমান্টিক অভিজ্ঞতা।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বারো

ফেনীতে ফিরে গেলাম প্রায় ছয় মাস পরে। আব্বা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কলেজ এবং ফেনী পাইলট হাইস্কুল একই কমপ্লেক্সে, একটা ফুটবল খেলার মাঠের দুপাশে টকটকে লাল ইটনির্মিত দুটো লম্বা, দোতলা দালান। ভর্তির পর আব্বা আমাকে নিয়ে গেলেন পাইলট স্কুলের হেডমাস্টার জালাল উদ্দিন আহমদ সাহেবের অফিসে। প্রচণ্ড প্রতাপশালী হেডমাস্টার জালাল সাহেব— দেশজোড়া তার সুখ্যাতি। শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী, সাদা দাড়ি আর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও কিশতি টুপি স্বল্পবাক এই মানুষটার চারপাশে একটা সম্ভ্রমের পরিমণ্ডল রচনা করে রাখত। জালাল সাহেব আমাদের গ্রামের লোক, আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলেও গ্রামের রীতি মেনে আব্বা তাকে 'কাকু' ডাকতেন। সেই সুবাদে আমার হলেন তিনি 'জালুদাদা'।

আব্বা একরকম স্থানীয় অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন জালাল সাহেবকে। অবশ্য কখনো কখনো টাকা আসতে দেরি হলে ধার চাওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কারণে তার কাছে যাইনি। টাকা এলেই প্রথম তার দেনা পরিশোধ করে আসতাম। এটা ছিল আব্বার শক্ত নির্দেশ। হোস্টেলে অবস্থান করার মতো আর্থিক সংগতি ছিল না আমাদের। ঠিক হলো 'লজিং'য়ে থেকে পড়াশোনা করব। আনকোরা কলেজছাত্রদের জন্য এটা এক উদ্বেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমার মতো পূর্ব-অভিজ্ঞতার অধিকারীর জন্য নয়। 'লজিং' নামের এই চমৎকার ব্যবস্থাটার অবদান আমাদের মতো গরিব দেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা পরিমাপ করা অসম্ভব। মাত্র হাতে গোনা কিছু ছাত্র হোস্টেলে থাকার বিলাসিতার সামর্থ্য রাখত, বাদবাকি বিপুলসংখ্যককে উচ্চতর বিদ্যালয়ের দুয়ারে ধরনা দিতে হতো লজিংয়ে থেকে। দেওয়া আর নেওয়ার এক সমসম্মানের বিনিময়ব্যবস্থা ছিল এই লজিং প্রথা। থাকার জায়গা, নাশতা ও দুবেলা খাওয়ার বদলে লজিং প্রদানকারী পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে সাত দিন পড়ানোর জন্য পেত এক তরুণ গৃহশিক্ষক। কোনো নগদ অর্থ হাতবদল করতে হতো না কোনো পক্ষকেই। অবশ্য শিক্ষাবছরের শুরুতে লজিংসন্ধানী ছাত্রের ভিড় জমত মফস্বলের কলেজ-শহরগুলোতে। প্রতিযোগিতায় হেরে যেত অনেকেই। আর উচ্চশিক্ষা তাদের জন্য থেকে যেত এক ব্যর্থ ভগ্ন স্বপ্নমাত্র। আমার অবস্থা অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

স্বতন্ত্র। ফেনীতে আমাদের আত্মীয়-আপনজনের প্রভাব নেই। অনেক পরিবারই আব্বাকে জানালেন তাদের আগ্রহের কথা। হেলেনদের বাসার ব্যাপারে আমার অনিচ্ছা দেখে আব্বা আমাদের অন্যান্য আত্মীয় কাজী ফজলুল হক মোক্তার, মকবুল আহমদ উকিল, কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শফিউদ্দিন আহমদসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন, আগ্রহ দেখালেন সবাই। শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু বিবেচনা করে ভাইস পিন্সিপাল শফিউদ্দিন আহমদ সাহেবের আমন্ত্রণ কবুল করার সিদ্ধান্ত হলো। শফিউদ্দিন সাহেবের বাসাটা আর দশটা শহুরে বাসার মতো একদম রাস্তার ওপরে নয়, বরং পাঁচগাছিয়া রোডের একটু ভেতরে একটা পুকুরপাড়ে। গ্রামের বাড়ির আমেজ ছিল বাসাটায়। আমার থাকা ও পড়ার ব্যবস্থা হলো ছোট্ট কাছারি ঘরটায়।

স্যারের দুই মেয়ে হাসিনা ক্লাস নাইনে ও জাকিয়া ক্লাস সিক্সে পড়ে। (এতদিন পরে নাম দুটো ঠিক মনে রাখতে পেরেছি কি না, সন্দেহ।) এদের দুজনকে পড়ানোর দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। শিগ্‌গিরই ভুল ভাঙল— কাজটা যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ না-ও হতে পারে। মেয়ে দুটো সামনে অতি ভদ্র ফেরেশতাতুল্য, কিন্তু পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে যখন একত্র হয়, তখন দুষ্টের সেরা। কদিন পরই লক্ষ করলাম, আমার অনুপস্থিতিতে কারা যেন আমার জিনিসপত্র, বইখাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে।

কলেজজীবনে যাত্রার শুরুটা ছিল একই সঙ্গে ব্যস্ততা আর নতুন নতুন আনন্দঘন অভিজ্ঞতায় ভরপুর। স্কুলজীবনের একঘেয়েমির পর এ যেন এক বৈচিত্র্যে ভরা পরিপূর্ণ জীবনের উদার আমন্ত্রণ। তারুণ্যের উচ্ছলতা প্রাণবন্ত এক দঙ্গল ছাত্রছাত্রীতে ভরা ক্লাস, যা আবার একটামাত্র শ্রেণিকক্ষের শ্বাসরুদ্ধকর গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। বিষয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ বদল। কখনো একতলায়, কখনো দোতলায়। কখনো লাল ইটের খানদানি কলা ভবনে, কখনো পুকুরের অপর পাড়ে নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনে। ইংরেজি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস ও লজিক নিলাম পাঠ্যবিষয় হিসেবে। কলেজজীবনের প্রথম দিনগুলোতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাটাই সব ছাত্রছাত্রীর সর্বোচ্চ প্রাধান্যের বিষয়। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। সুযোগও এসে গেল শিগ্‌গিরই। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের জাঁদরেল বিচারপতি জাস্টিস এস আর কায়ানীর মৃত্যুসংবাদ এলো। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যেও কয়েকটা মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে গোটা দেশে জনগণের মন জয় করেছিলেন বিচারপতি কায়ানী। কলেজের প্রচলিত প্রথামতো পরদিন রাখা হলো শোকসভা। সারা সকাল অবসর ঘণ্টায় কলেজ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

লাইব্রেরিতে বসে দৈনিকগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে বিচারপতি কায়ানীর জীবনীর ওপর প্রচুর মালমসলা জোগাড় করে নিলাম। বিকেলে নিচতলার বিরাট অ্যাসেম্বলি হলে বসল শোকসভা। প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উপস্থিত। প্রিন্সিপাল জিএমএ মান্নান সাহেব সভাপতিত্ব করছেন। শুরুতেই বক্তৃতা করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের নাম দিতে বলা হলো। তাকিয়ে দেখি, যারা স্লিপ জমা দিচ্ছে, তারা সবাই তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের ছাত্র। ছাত্রী সম্ভবত শুধু একজন। সাহস করে স্লিপ একটা আমিও জমা দিয়ে দিলাম। স্লিপ যে শিক্ষক গ্রহণ করছিলেন, তিনি বিস্ময়ে হতবাক— বললেন, তুমিও বলবে! তুমি না প্রথম বর্ষে? জি স্যার, জবাব দিলাম নির্বিকার চিত্তে। ঠিক আছে বলবে, মৃদু হেসে আশ্বাস দিলেন প্রিন্সিপাল মান্নান সাহেব।

সর্বশেষে ডাক এলো আমার। হিসাব করে দেখি, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি শুধু আমিই। আমার নাম ও বর্ষের ঘোষণা শুনে মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল হলটাতে। না তাকিয়েই বুঝলাম অনেকেই নাক সিঁটকাচ্ছে। সমস্ত সাহস ও বক্তৃতা কৌশল আঁকড়ে নিয়ে শুরু করলাম। আশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাহস জোগালেন প্রিন্সিপাল। বক্তৃতার ভেতরেই অনুভব করলাম, শ্রোতাদের মনোযোগ অনায়াসেই আকর্ষণ করেছি। শোকসভা হওয়া সত্ত্বেও বক্তৃতা শেষে হাততালি পড়ল প্রচুর। সভাপতির ভাষণে প্রিন্সিপাল নাম উল্লেখ করেই প্রশংসা করলেন আমার।

কলেজ 'ছাত্র মজলিশের' নির্বাচন তখন অত্যাসন্ন। ফেনী কলেজে ছাত্র সংসদ এ নামেই পরিচিত ছিল। পরদিন কলেজে এসে বুঝলাম এক বক্তৃতা নির্বাচনের বাজারে আমার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রচুর। সাধারণ ছাত্ররা তো বটেই, উভয় নির্বাচনি দলের নেতারাও আমার সঙ্গে কথা বলা ও কুশল বিনিময়ের ঔৎসুক্য দেখাল। কলেজে তখনো কেন্দ্রীয় ছাত্রদল যেমন 'ছাত্রলীগ', 'ছাত্র ইউনিয়ন' ইত্যাদির বদলে 'ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি (ইউপিপি)' এবং 'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস সোসাইটি (ইউএসএস)' নির্বাচনে অংশ নিত। ইউপিপি ছিল বামপন্থি চিন্তা ও পলিসির ধারক আর ইউএসএস ছিল খানিকটা ডানপন্থি, জাতীয়তাবাদী চিন্তার অনুসারী। উভয় পক্ষই তাদের দলের সদস্য হতে এবং আসন্ন নির্বাচনে তাদের প্যানেল থেকে দাঁড়াতে অনুরোধ করতে থাকল। উভয় পক্ষ থেকেই সময় চেয়ে নিলাম।

চিন্তা করতে গিয়ে পড়লাম মহাফাঁপরে। ছাত্ররাজনীতিতে বামের চমক আছে। অন্যদিকে ফেনী কলেজে তুলনামূলকভাবে ইউপিপির জেতার রেকর্ড

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ইউএসএসের চেয়ে ভালো। নির্বাচন যখন মানুষ জেতার জন্যই করে, তখন জেতার সম্ভাবনা যে দলে বেশি, সেই দলেই যোগ দেওয়া স্বাভাবিক। ইউপিপির নেতারা একরকম ধরেই নিলেন আমি তাদের অনুরোধই রক্ষা করব। দু-তিন দফা বৈঠকের পর যখন তাদের জানিয়ে দিলাম যে আমি ইউএসএসে যোগ দিয়েছি, তারা স্বভাবতই আশ্চর্য হলেন।

ইউএসএসকে অবশ্য ইউপিপির সমান পরিশ্রম করতে হয়নি। দল হিসেবে তারা ইউপিপির মতো সুসংগঠিতও ছিল না যে দফায় দফায় বৈঠক করবে। যোগদানের সিদ্ধান্তটা নেহাতই আমার। রাজনৈতিক গ্রুপিং ও আদর্শের দিক থেকে আমার তখনকার ঝোঁকটা জাতীয়তাবাদী ছিল বললেই চলে। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দিকে এবং নেতা হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকেই আমি গ্রহণযোগ্য ভাবতাম। স্থানীয় ছাত্রদল হিসেবে ইউএসএসও এই একই চিন্তার ধারক ছিল বলে এই দলে যোগ দেওয়াটাই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়েছে।

কলেজ ছাত্র মজলিশের নির্বাচনে সাড়া পড়ে গেল বেশ কয়েক সপ্তাহে। সভা, মিছিল, বাড়িবাড়ি গিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা, পোস্টার-প্রচারপত্রের ধুম। একপক্ষ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে চুটিয়ে নিন্দাবাদ চালিয়ে ব্যঙ্গ, কবিতা আর ছড়া কেটে নাম বিগড়িয়ে স্থূলরসিকতা করতেও কসুর করল না। আমাদের প্রতিপক্ষ ইউপিপির প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী ছিলেন সোলায়মান আর আমাদের দলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদপ্রার্থী ছিলেন জমির। সোলায়মান কালো, লম্বা ও মোটা ছিলেন। জমির মাঝে মাঝে লুঙ্গি পরেও কলেজে আসতেন। তাই ব্যঙ্গ-গান রচনা করে পথে পথে গাওয়া হলো:

‘কয়লার ইঞ্জিন সোলায়মান
ইউপিপির নেতা হয়ে
হারালে সম্মান।’
অথবা—
‘আরে ও ভাই লুঙ্গি জমির
প্রাণ বাঁচাবার কর ফিকির’ ইত্যাদি।

সোলায়মান ইউপিপির আর জমির ইউএসএসের নেতা ছিলেন।

আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা হলো আমার নামের দৈর্ঘ্য নিয়ে। আমার বিপরীতে ইউপিপির প্রার্থী ছিলনে মোয়াজ্জম হোসেন। তার নিজেরও নামের পরিধি ছিল

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

একই রকম সীমিত-সংযত। ইউএসএসের প্রার্থী তালিকায় আমার নাম যখন ছাপা হলো, 'চৌধুরী এসএএফএম মঈনুদ্দীন' প্রচারের ধুম পড়ে গেল— 'যার নাম অত লম্বা, তাকে কি ভোট দিবেন?'

কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে ততদিনে আমি ভালোই স্বীকৃতি লাভ করে ফেলেছি। আমাদের পুরো প্যানেল তো জিতলই, সারা কলেজে সমস্ত প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে আমি নির্বাচিত হয়ে গেলাম 'সহকারী সাহিত্য সম্পাদক' পদে। ঠোঁট কাটল বন্ধুরা— এই বিপুল ভোটাধিক্যেরা কারণ হিসেবে আমার চেহারাকে দায়ী করল। রস করে বলল, 'মেয়েদের ভোট সবগুলো বাগিয়ে নিয়েছিস।' রাগ করে বলতাম, 'তোদের মাথা।'

পরের সপ্তাহে ডাক পড়ল প্রিন্সিপাল জিএমএ মান্নান সাহেবের কক্ষে। দোতলা কলেজ ভবনটার দুপাশে ছিল তেতলা মিনারসদৃশ দুটো কক্ষ। এর বাঁ পাশেরটায় প্রিন্সিপাল মহোদয়ের অফিস। পেছনের দিকে মেয়েদের কমনরুমের সামনে দিয়ে একধাপ সিঁড়ি বেয়ে তার অফিসে যেতে হতো। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রিন্সিপাল ছাত্র মজলিশের সভাপতি। তাই সর্বোচ্চ নির্বাচিত পদ হলো সহসভাপতির। একজন একজন করে সব নির্বাচিত সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন প্রিন্সিপাল। সেই ডাক পেয়ে আমিও গেলাম দেখা করতে। মেয়েদের কমনরুমের দরজায় দু-তিনটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সালাম বিনিময় করে তাদের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা আলাপ-আলোচনা শেষ করে বেরোবার জন্য দরজাটা খুলে সিঁড়িতে একপা দিতেই পাখির ঝাঁকের মতো কিচিরমিচির করে উঠল একদঙ্গল মেয়ে। বুঝলাম, কমনরুম থেকে বেরিয়ে তারা আগেই ওত পেতে ছিল হামলা চালাতে। মেয়ের পাল যখন একসঙ্গে কলরব করে ওঠে, তখন মূল বক্তব্য যে কী, তা বোঝা সহজ কাজ নয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না, কী বলতে চান অল্পতে বুঝিয়ে বলুন। তার পরও তাদের উচ্ছ্বাস যায় না। যাই হোক, বুঝলাম তারা বলছে, 'আমাদের মিষ্টি কই?' বিপুল ভোট পেয়ে কেমন করে জিতলেন বুঝতে পারেন না বুঝি? আমরাই তো সবাই মিলে ভোট দিয়ে জেতালাম। মিষ্টি খাওয়াতে হবে আমাদের। হঠাৎ মনে হলো, বন্ধুদের হাস্যরস তাহলে একদম ভিত্তিহীন নয়। জিতেছি গুণের কারণে নয়।

সে যাই হোক, উপস্থিত সমস্যার তো সমাধান করতে হবে। বললাম, বেশ অন্যায় আবদার তো আপনাদের, আমার ঘাড়ে কাজ চাপালেন, মিষ্টি তো আমাকে খাওয়াবেন আপনারা। আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল তারা—

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বলল, ওসব কথায় পার পাবেন না। মিষ্টি খাওয়াতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মিষ্টি খাওয়ানোর ওয়াদা দিয়ে বেরিয়ে আসার অনুমতি পেলাম।

কলেজে পড়ার অভিজ্ঞতা স্কুলজীবনের মতো নয়, বয়ঃসন্ধীর মতো এটাও একরকমের শিক্ষাসন্ধীর সময়। স্কুলের বন্ধ-গুমোট পরিবেশের পরিবর্তে তরুণ শিক্ষার্থীরা হঠাৎ করেই অধিকার করে বসে অফুরন্ত স্বাধীনতা। হোস্টেলে থাকুক বা লজিং— এই ছাত্রের ওপর থাকে না অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ। থাকে না কোনো বিধিনিষেধ। খাঁচাছাড়া পাখির মতো অবাধে উড়ে বেড়াতে থাকে না তার কোনো বাধা। এই হঠাৎ পাওয়া মুক্তির ভেতরে মোহময় আমেজ যেমন আছে, তেমনি আছে মহাবিপদের প্রতিশ্রুতিও। অজানার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে প্রাণপণে নোঙর আঁকড়ে থাকে তারা, যারা মনে রাখে তাদের শিকড়ের ঠিকানা। যারা তাদের আজকের এই উচ্চশিক্ষায় উত্তরণের পথে বাবা-মা আর আপনজনদের কত ত্যাগ, কত কোরবানি রয়েছে তা ভুলতে পারে না। আর যারা শুধু বর্তমানের আবর্তে ঘুরপাক খায়— 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' যাদের জীবনদৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার 'নোঙর খুলে পাল তুলে দিয়ে' অজানার পথে হারিয়ে যাবে— এটা আর বিচিত্র কী?

আর আমি? অজানা অভিজ্ঞতা আহরণের আকর্ষণে নোঙর খুলে ভেসে বেড়াবার অদম্য আগ্রহ আর আশৈশব পারিবারিক প্রশিক্ষণের প্রভাব একে অন্যকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত করে আমার জন্য রচনা করল এক মধ্যপথ। সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালি যুবক এই পথ ধরেই জীবনের পথে করে যাত্রা শুরু। নিজস্ব মূল্যবোধ বাঁচিয়ে চলাটাকে পাশ্চাত্যে 'কনজারভেটিজম' নামে সম্মান করা হয়, অথচ এর বাংলা প্রতিশব্দ 'রক্ষণশীলতা' একটা নেতিবাচক বিশেষণ। পারিবারিক প্রশিক্ষণ যদি রক্ষণশীলতাও হয়, তাহলে তা-ও আমার জন্য হয়েছে এক আশীর্বাদ। এক সুদৃঢ় নোঙর, যা রক্ষা করেছে আমাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়ানো থেকে। কিন্তু তাই বলে প্রগতি ও মুক্তচিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ থেকে আমি কোনোভাবে পিছিয়ে ছিলাম এমন ভাবাটাও ভুল হবে। প্রগতি ও মুক্তচিন্তা অবশ্যই— তবে বল্গাহীন নয়— নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে, আবৃত্তি, বক্তৃতা আর নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মফস্বলের ছোট্ট শহরে সংস্কৃতিমনা হিসেবে সহজেই স্থান করে নিয়েছিলাম। শহরের দুটো সিনেমা হল, 'সুরত মহল' আর 'দুলান সিনেমা'র আমি ছিলাম নিয়মিত দর্শক। বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ছায়াছবির যশস্বী নায়ক-নায়িকা যেমন উত্তম-সুচিত্রা, দিলীপ কুমার-বৈজয়ন্তী মালা আর কণ্ঠশিল্পী

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হেমন্ত কুমার, মোহাম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকর হয়ে উঠল আমার অত্যন্ত প্রিয়। আরও প্রিয় ছিল রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি।

কিন্তু সংস্কৃতি-আসক্তিটা নেশা হয়ে দাঁড়ায় মনের অজান্তে। যুবক আমি রবীন্দ্রসংগীতের ভাষায় সত্যি সত্যিই, 'প্রামোদে ঢালিয়া দিনু মন'। অন্যসব নেশার মতো এই মত্ততাও আদায় করে নেয় কঠিন মূল্য। পিছিয়ে পড়তে শুরু করলাম পড়ালেখায়। পরিবর্তন প্রতিফলিত হতে শুরু হলো পরীক্ষার ফলাফলে। ধর্মীয় অনুশাসন পালনে এলো শিথিলতা। পুরো বছরেও বাড়িতে না গেলে নামাজ পড়িনি এক ওয়াক্তও।

ধর্মীয় আচারাদি পালনে শিথিলতা আসার আরও একটা কারণ ছিল। সংস্কৃতিচর্চার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটল বন্ধু নির্ণয়ে। ধর্মমনাদের ছেড়ে ধীরে ধীরে ভিড়ে পড়লাম সংস্কৃতিমনা বন্ধুদের সঙ্গে। স্বভাবতই এদের অধিকাংশই ছিল সেক্যুলারিজম অথবা সমাজতন্ত্রের অনুসারী। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম এদের সাহিত্য, অংশগ্রহণ করতাম এদের আলোচনাসভায় ও পাঠচক্রে। চিন্তাজগতে উদয় হতে শুরু করল নতুন নতুন প্রশ্ন। বাল্যকাল থেকে লালিত স্বীকৃত বিশ্বাসের সুদৃঢ় শিলাখণ্ডে ফাটল দেখা দিল যেন।

এতকাল নামাজ-রোজা করেছি আবাল্যের অভ্যাস বসে, বিনা প্রশ্নে। অনেকটা মুরুব্বিদের যান্ত্রিক অনুসরণ মাত্র। কিন্তু এই যান্ত্রিকতার স্বল্পস্থায়ী মুহূর্তগুলোতে অস্থির বাল্যজীবনেও নামাজ বয়ে আনত খানিকটা প্রশান্তির প্রলেপ। চঞ্চল দিনগুলোর উল্লাস-আবেগের কোলাহলের ভেতরেও কীসের যেন এক শূন্যতার অনুভব দানা বেঁধে আছে, যা কখনো কখনো তীক্ষ্ম সুঁইয়ের মতো মনের পর্দায় খোঁচা দেয়। সেই সূচিবিদ্ধ অপূর্ণতায় কেমন যেন একটা শান্তির স্নেহস্পর্শ পাই নামাজে।

একদিন হঠাৎ করে স্কুলজীবনের একটা বাংলা পাঠ্যবইয়ের একটা প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রবন্ধটা এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নামাজ'। চৌধুরী লিখেছেন:

'আমি নামাজ পড়িব। প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিব। এ চিত্তের ক্ষুধা মিটাব। কায়া ও মায়ার অস্তিত্বে চৈতন্যে ডুবিব-মজিব।

কেন নামাজ পড়ি? কেমন করিয়া বলিব? কেমন করিয়া বলিব নদী সমুদ্রে যায় কেন? মেঘনাদে ময়ূর নাচে কেন? প্রদীপে পড়িয়া পতঙ্গ মরে কেন? কেমন করিয়া বলিব কেন?'

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সত্যিই তো— কেন? এয়াকুব আলী চৌধুরীর জবাবে গর্ভবতী এই প্রশ্নের ভেতরে যেন লুকিয়ে আছে এর উত্তর। অথচ স্কুলে এই প্রবন্ধ কতবার পড়েছি— তখন শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এর গদ্যের মাধুর্য ও ভাষার মুনশিয়ানার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ধারেকাছেও পৌঁছেনি।

বাল্যকালে শুধু সুরা-নিয়ত মুখস্থ করে নামাজ শিখেছিলাম। এবার বোধ হয় সর্বপ্রথম এর একটা আধ্যাত্মিক কারণ খুঁজে পেলাম। নামাজে খানিকটা মনোযোগী হলাম আগের চেয়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিবেদিত হয়ে উঠেছি এমনটাও বলা যাবে না।

সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার এক অপরিহার্য বাহন ছিল *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার শিশু-কিশোর পাতা 'কচি-কাঁচার আসর'। পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* ছিল তখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। আর 'কচি-কাঁচার আসর'ও ছিল কিশোরদের কাছে তেমনই প্রিয়। পরিচালকের পদবি ছিল 'দাদাভাই', আসল নাম রোকনুজ্জামান খান। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করে তোলায় তার অবদান ছিল অপরিসীম। যোগাযোগকারীদের সময়মতো জবাব দিয়ে, তাদের লেখার ওপর মন্তব্য করে এবং প্রকাশযোগ্য লেখা আসরে ছাপিয়ে দিয়ে তিনি উৎসাহিত করতেন তাদের। স্কুলজীবন থেকেই আমি এই আসরের সদস্য ছিলাম। কয়টা লেখাও ছাপা হয়েছিল আমার। মফস্বল শহরগুলোতে গঠন করা হতো আসরের শাখা মেলা। প্রতিটি শহরে দেওয়া হতো একটা বিশেষ নাম। ফেনীতে সদস্যসংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক হয়ে ওঠায় দাদাভাইয়ের অনুমতি নিয়ে ফেনীতে গঠন করে ফেললাম 'কিশলয় কচি-কাঁচার মেলা'।

ঢাকার পত্রিকায় লেখা ছাড়াও ফেনী থেকে সেকালে প্রকাশিত দুটো সাপ্তাহিক *তালিম* ও *আমার দেশ*-এও লিখতাম প্রায়ই। *তালিম* মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের মালিকানাধীন ইসলামি ভাবধারার পত্রিকা। সম্পাদনা করতেন আবদুল গফুর নামের এক ভদ্রলোক। আর *আমার দেশ* পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহমদ। চরিত্রে জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ। দুই পত্রিকাতেই আমার লেখা সমাদৃত ছিল।

এ ধরনের একটা লেখা 'মগের মুল্লুকে দুইদিন' প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক *আমার দেশ*-এ। লিখেছিলাম দুই দিনের জন্য রামগড় সফর করে এসে। সফরের কারণ ছিল আমার ছোটদা (মেজো ভাই) কামাল উদ্দিন চৌধুরীর

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রামগড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। ছোটদা তখন ফরেস্টারের চাকরি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মায়নীমুখে থাকতেন।

আমরা দু-তিনজন মোটরগাড়ি করে ফেনী থেকে রামগড় অভিমুখে রওনা করলাম। ফেনী থেকে শুভপুর হয়ে রামগড়ে যাওয়ার পথটা ছিল ছবিময়। ইংরেজিতে যাকে বলে পিকচারিক। ছাগলনাইয়া হয়ে শুভপুরের ঐতিহাসিক কৈয়ারা দিঘির পাশ দিয়ে দারোগারহাটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। বৃহত্তর ফেনী অঞ্চলের তিনটা বিখ্যাত দিঘির একটি এই কৈয়ারা দিঘি। অন্য দুটো হলো ফেনী শহরের পাশেই বারাহিপুরের বিশাল উঁচু পাড়ের জন্য প্রসিদ্ধ 'বিজয় সিং' দিঘি আর চৌদ্দগ্রামের মাইল-লম্বা জগন্নাথ দিঘি, কৈয়ারা প্রসিদ্ধ স্ফটিক স্বচ্ছ পানির জন্য। দিঘিটির নামকরণ করা হয়েছে ফেনী অঞ্চলের ইতিহাসবিখ্যাত দেশনায়ক শমসের গাজীর মা কৈয়ারা বিবির নামে।

দারোগার হাট হয়ে শুভপুর ব্রিজ পার হয়েই চট্টগ্রাম জেলার করেরহাট। এর নয় টিলা তাকিয়া থেকেই রাস্তার দু-পাশের শালবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। কয়লার মুখ বাজার ব্রিজ পার হয়ে বালুটিলা ও হেঁকো বাজার থেকে রাস্তাটা ফেনী নদীর তীরঘেঁষে চলতে লাগল। নদীর অন্য তীরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। সম্ভবত এখানেই কোথাও পার হলাম চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সীমানা। পার্বত্য চট্টগ্রামের শুরুতেই রাস্তার পাশে বিরাট সাইনবোর্ড— 'নন রেগুলেটেড এরিয়া'। মানে উপজাতীয় এলাকা, দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন এখানে চলে না। এই এলাকা পরিচালিত হয় উপজাতীয় মগ-চাকমা নীতিবিধান অনুসারে। অন্যভাবে বলতে গেলে— 'মগের মুল্লুক'।

বাগান বাজারের পর সোনাইপুল বাজারে নদী পার হয়ে পার্বত্য প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এসে হাজির হলাম মহামুনি চরে। তারপর গির্জা ও মন্দির অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম আমাদের অভীষ্ট গন্তব্য রামগড়ে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

উপজাতীয়দের এই ছোট্ট শহরটা সহজেই মুগ্ধ করল আমাকে। উঁচু-নিচু পাহাড়-টিলায়, বনভূমি ও শহরের সমন্বয়, স্নিগ্ধ সবুজে, কোলাহলহীন প্রশান্তি মিশে একটা ব্যতিক্রমী আকর্ষণ ছিল রামগড়ের। তরতাজা শাকসবজি আর রকমারি ফলফলাদির সওদা মাথায় বিচিত্র সাজে সজ্জিত উপজাতীয় রমণীরা সকাল থেকে আসতে শুরু করে শহরের বাজারে। খাবারদাবার ভীষণ সস্তা আর সবচেয়ে সস্তা দুধ, ফেনীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম, মগ-চাকমারা দুধ খাওয়া পছন্দ করে না।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বাজারের পথে ছোট্ট একটা মাঠের মাঝ দিয়ে পথ ধরে হাঁটছিলাম। সামনে পড়ল এক উপজাতীয় যুবক। উপজাতীয়দের বয়স আঁচ করা সম্ভব নয়— ওর বয়স পনেরো কি ষোলো। আমার চেয়ে এক-দুই বছরের ছোট। আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল ছেলেটা। যেন অনেককালের চেনা। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করলাম। বলল, সে চাকমা সম্প্রদায়ের ছেলে, নাম 'থুঁই'। স্থানীয় স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র। বেশ মিশুক ছেলে, অনর্গল কথা বলে চলল। দুজনে মিলে সামনের একটা চায়ের দোকানে চা খেলাম। থুঁই খুব সাধল তার বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করাতে। কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল না। মাফ চেয়ে ঠিকানা বিনিময় করে, যোগাযোগ রাখার ওয়াদা দিয়ে বিদায় নিলাম।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

তেরো

ওয়াদা করলে কী হবে, ফেনী ফিরে বিভিন্ন ব্যস্ততায় তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কলেজে বন্ধু জুটে গেল অনেক। শান্তশিষ্ট কবির, বাক্‌পটু মোটাসোটা সিকান্দার, আশোক ও ননি এবং সর্বোপরি আমার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু সোনাপুর (ফেনীর কাছের গ্রাম) মজুমদারবাড়ির শাহজাহান বিন আলম (সাজু), আজাদ ও দিদার। এদের সঙ্গে গল্প করে, আড্ডা দিয়ে ও খেলাধুলা করে সময় কাটছিল ভালোই। কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে প্রিন্সিপাল জিএমএ মান্নান ও ভাইস প্রিন্সিপাল শফিউদ্দিন আহমদ ছাড়াও ছিলেন আরবির রহমানী সাহেব, ইতিহাসের এম এন জাহাঙ্গীর, সিভিকসের হুমায়ুন কবির, ইংরেজির জাহাঙ্গীর চৌধুরী, লজিকের মুজিবুর রহমান ও আবদুল খালেক এবং অবশ্য বাংলার সতীশ চন্দ্র সেন এবং জ্যোৎস্নাময় দেব আমাদের জ্ঞানবর্ধনের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

পাঠ্যবিষয়গুলোর মধ্যে বাংলাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। এজন্য অনায়াসে বাংলার অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললাম। সেনবাবু ছিলেন হালকা-পাতলা গঠনের— বয়স বোধকরি সত্তর ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু গলার আওয়াজ ছিল তার গগনবিদারী। পুকুরের ওপারে বিজ্ঞান ভবনের লেকচার থিয়েটার থেকে যখন 'এই ছেলেরা!' বলে হাঁক দিতেন, তখন এপারের কলা ভবনের দেয়াল পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠত। সেন বাবুকে অবশ্য বেশি দিন আমরা পাইনি। বছরখানেকের মধ্যেই তিনি অবসর নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন।

জ্যোৎস্নাময় দেব বাংলা পড়াতেন হৃদয় দিয়ে। বাংলায় যারা ভালো, তারা সহজেই তার স্নেহের পাত্রে পরিণত হতো। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমার দেরি হলো না মোটেই। জ্যোৎস্না বাবু বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করতেন, যেন যারা চায় গতানুগতিক পাঠ্যসূচির ভেতর থেকে জবাব দিতে পারে আর যারা চায় সৃজনশীল জবাবও দিতে পারে। তাই বাংলা রচনা অংশে পাঠ্য তালিকার বিষয়গুলো ছাড়াও তিনি যোগ করতেন সম্পূর্ণ নতুন নতুন বিষয় যেমন— 'রেল স্টেশনে কিছুক্ষণ' বা 'আনমনা একা একা পথ চলিতে'। আর এ ধরনের বিষয় পেলে তো আমি আহ্লাদে আটখানা। মন উজাড় করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতাম। জ্যোৎস্না দেব এমন শিল্পকর্মের কদর

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

করতেন খুব। মনে আছে, এক পরীক্ষার পরে ফল ঘোষণার দিন আমি বাংলা ক্লাসে হাজির হলাম কিছু দেরিতে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সম্ভবত সম্মিলিত ক্লাস। ক্লাসে ঢুকে দেখি জ্যোৎস্না দেব ছাত্রদের কী যেন পড়ে শোনাচ্ছেন। একটু মন দিয়ে শুনতেই বুঝতে পারলাম লেখাটা আমারই— আমার পরীক্ষার খাতা থেকে 'আনমনা একা একা পথ চলিতে' প্রবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছেন তিনি। ছেলেমেয়েরা মৃদু হেসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল আমার দিকে— লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম।

বাংলা লেখার হাত ভালো বলে আমার বয়সি অনেক যুবক ভুল করে ভাবতে শুরু করে যে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের সব শাখায় সমান সাফল্য তার নিশ্চিত। তাই কাব্যপ্রতিভা থাকুক আর না থাকুক, তাদের অনেকে লিখতে শুরু করে কবিতাও। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। স্কুলজীবন থেকেই লিখে আসছি ছড়া, কবিতা, সনেট— সব। কিছু ছাপা হয়েছে, কিছু হয়নি। ক্রমেই নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা গজাতে শুরু করল যে সম্ভবত আমি কবিও বটে। কিন্তু ছন্দপতনের মতো এই ভুলটাও কলেজজীবনের এই প্রথম বছরটাতেই ভাঙল। সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিটা নিম্নরূপ:

একদিন কলেজ ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরছি পাঁচগাছিয়া রোড দিয়ে। রাস্তাটার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিল্ডিংটার নাম ছিল 'হায়দার মঞ্জিল'। লম্বা তিনতলা লাল ইটের দালানটিতে বাড়ির মালিক ছাড়াও ছিল আরও কয়েক পদস্থ কর্মচারী পরিবারের ভাড়াটে নিবাস। এদের এক পরিবারের কন্যা ছিল কলেজে আমার সহপাঠিনী সুরাইয়া। উত্তরবঙ্গের কোথাও যেন তাদের বাড়ি। কলেজে অসামান্য সুন্দরী হিসেবে তার নামডাক ছিল অনেক।

হায়দার মঞ্জিলের প্রতি তলায় ছিল ব্যালকনির মতো টানা বারান্দা। আমি রাস্তার অপর ফুটপাত ধরে দালানটার মাঝামাঝি আসতেই দোতলার বারান্দা থেকে সুরাইয়ার নেতৃত্বে পাঁচ-ছয়টা মেয়ে চিৎকার করে আবৃত্তি করে চলল একটা ছড়ার মতো কবিতা:

'ঝিকিমিকি আকাশে
সকালের রোদ
রাতভর আঁধারের
দেবে যেন শোধ।'

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

প্রথমে বুঝিনি, কিন্তু কয়েক ছত্র শোনার পরই বুঝলাম আবৃত্তির লক্ষ্য আসলে আমি। কারণ কবিতাটা আমারই— স্কুলজীবনে লেখা একটা ছড়া। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগে আমার কামরাটায় বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটির ঘটনা। সন্দেহ দুর করার জন্য মাথা তুলে তাকাতেই দেখি সুরাইয়ার পেছনে আমার দুই ছাত্রী হাসিনা, জাকিয়াও রয়েছে। বাদবাকিরা কলেজের অন্য সহপাঠিনী।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, এই আবৃত্তি মহড়ার আসল উদ্দেশ্য আমার অপরিপক্ক কাব্যপ্রতিভাকে বিদ্রুপ করা ছাড়া কিছু নয়। মনে হলো ওরা বুঝি আমাকে ভেংচি কাটছে— বলছে, এটা কী একটা কবিতা হলো? মনে মনে দুটো সিদ্ধান্ত করে ফেললাম— প্রথমত, এই লজিং ছাড়তে হবে; দ্বিতীয়ত, মজবুত একটা কবিতা লিখে কলেজের ছাত্রীদেরও উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। অল্প কদিনের মধ্যেই ভাইস প্রিন্সিপাল শফিউদ্দিন আহমদ সাহেবকে বোঝাতে সমর্থ হলাম যে নানা কারণে আমাকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে। নতুন জায়গির হলো ফেনীর পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি পেরিয়ে বারাহিপুরে।

আর কবিতা? ঠিক করলাম কলেজের দেয়াল পত্রিকার জন্য একটা কবিতা লিখব। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের সবচেয়ে মোক্ষম মাধ্যম ছিল দেয়াল পত্রিকা। কলেজ লাইব্রেরিতে শোভা পেত এই পত্রিকা। ছাত্রছাত্রীরা অবসর ঘণ্টায় দলে দলে দাঁড়িয়ে এই সুন্দর হস্তাক্ষরে সাজানো শিল্পকর্ম উপভোগ করত। দেয়াল পত্রিকাটার নাম সম্ভবত ছিল *বাতায়ন*। প্রধান উপদেষ্টা সম্পাদক থাকতেন একজন অধ্যাপক। এই সময়ে সম্পাদক ছিলেন বাংলা বিভাগের নতুন যোগ দেওয়া যুবক অধ্যাপক রফিকুর রহমান ভূঞা। কলেজের সময়সূচির সংক্ষেপন অনুসারে আমরা বলতাম— 'র, র, ভূ'। কবিতা লিখলাম— একটা সনেট। অনেক যত্ন নিয়ে, বারবার ফিরে গিয়ে পরিবর্তন করে যা দাঁড়াল, শেষ পর্যন্ত তা মোটামুটি মনঃপূত হলো। প্রথম বারোটি ছত্রে মোহনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা এক সুন্দরীর, শেষ দুটি ছত্রে তার প্রতি ভালোবাসার ঘোষণা। কবিতাটার নাম দিলাম— 'আমার প্রিয়া'। দু-একটা ছত্র এ রকম—

'যার কবরীতে বন করবীটি শোভে
যার পাশে পাশে ভ্রমরটি ঘোরে লোভে,
যার কেশদাম আষাঢ় মেঘের মতো
রাঙা মুখখানি শোভে তায় লজ্জানত।'

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

শেষ দুই লাইন:

'ভালোবাসি তারে সারাটি হৃদয় দিয়া
হৃদয়ের রানি সেইতো আমার প্রিয়া।'

হুলস্থূল পড়ে গেল কলেজে। দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরিতে ভিড় জমাল কবিতাটি পড়ার জন্য। প্রায় সবাই নিশ্চিত বর্ণনাটা সুরাইয়ার। যারা আগের ঘটনা জানত তারা বলল, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লেখা। প্রশ্ন উঠল— প্রধান সম্পাদক এ ধরনের কবিতা প্রকাশের জন্য অনুমোদন করলেন কী করে? র, র, ভূ ডাকলেন একদিন— বললেন, অনুমোদন করেছেন বটে, তবে আমার কাছ থেকে তিনি যা প্রত্যাশা করেন, কবিতাটা সেই মানের নয়। রচনাশৈলী ও গাঁথুনি নিখুঁত হলেও বিষয় চয়ন ছিল সস্তা, গতানুগতিক।

ডাক পড়ল মেয়েদের কমনরুমেও। ছাত্রীদের স্বাভাবিক সর্দারনি ছিল তখন কাজী মমতা হেনা। যশোরের মেয়ে। তার সাথি ছিল খুকি (পুরো নাম মনে নেই)। পরে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফেনীর প্রখ্যাত সাংবাদিক এরশাদ মজুমদারের। বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ অভ্যর্থনা পেলাম মেয়েদের কমনরুমে। বুঝলাম, ঔষধে কাজ হয়েছে। সাহিত্যচর্চা নিয়ে মোটামুটি বিদগ্ধ আলোচনা হলো। একপর্যায়ে মমতা জানাল যে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেয়েদের একটা আলাদা দেয়াল পত্রিকা বের করার। বললাম, বেশ তো, তবে আমরা তো পড়তে পারব না। আপনাদের পত্রিকা তো আপনাদের কমনরুমে থাকবে। মমতা জানাল, না, এটাও লাইব্রেরিতেই অবস্থান নেবে। তারা জানাল যে তারা নামও একটা নির্বাচন করেছে— 'অয়নান্তিক'। জিজ্ঞেস করল, অর্থ জানেন? কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও না জানার ভান করলাম— না, জানি না তো। কলরব করে উঠল ওরা— অত বড় কবি, সাহিত্যিক— জানেন না বললেই হলো! আমার অজ্ঞতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর মমতা বলল, 'অয়ন' মানে বর্ষ, 'আন্তিক' মানে শেষ, বললাম—

— ও আচ্ছা, তা বছরে একটা বের করবেন বুঝি?

— না, তা কেন? প্রতি মাসে বের করব, সে বলল।

— তাহলে নামটা ওরকম দিলেন কেন?

— মুখভরা শব্দ, শুনতে ভালো শোনায় তাই।

বুঝলাম, মেয়েদের আর আর ব্যাপারের মতো নাম নির্বাচনেও বাহ্যিক খোলসটাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশ। ওরা খুব ধরল প্রথম সংখ্যার জন্য একটা কবিতা লিখে দিতে এবং নিয়মিত লেখা দিতে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বললাম, নাহ্! কবিতা নয়, তবে অন্য লেখা দিতে পারি।

ওরা বলল, বারে, কবিতা নয় কেন? অমন সুন্দর কবিতা লেখেন আপনি। বললাম: ধন্যবাদ, তবে আপনার প্রশংসাটা সম্পূর্ণ যথার্থ নয়, কবিতা আর লিখব না। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি'। মেয়েদের কমনরুম থেকে বেরোতে বেরোতে ভাবলাম, আমার সিদ্ধান্তই সঠিক। বাংলা ভালো লিখি বটে, তবে কবিতা আমার জন্য নয়। আমি 'চেষ্টা কবি' হতে পারি, 'স্বভাব কবি' নই।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চৌদ্দ

ফেনী তখন ছিল ছোট্ট মফস্বল শহর। সরু-সরল পথঘাট, ছোট ছোট একতলা-দোতলা বা টিনের বাংলো ফ্যাসানের বাড়িঘর, বাগান, পুকুর ও গাছপালাঘেরা শহরটায় ছিল এক ঘুম জড়ানো মোহনীয়তার আমেজ। মুঘল আমলের বিশাল গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড, পাঁচগাছিয়া রোড, রাজার ঝি'র দিঘির পাড়, মিজান ময়দান, মাস্টারপাড়া, ডাক্তারপাড়া, তাকিয়া রোড, গুদাম কোয়ার্টারসহ গোটা শহরটায় কারণে এবং কখনো অকারণে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসতাম। ছোট হলেও দরিদ্র শহর ছিল না ফেনী। ঠিক প্রাচুর্য না হলেও ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মিলে একটা মধ্যবিত্ত স্বচ্ছন্দ-সচ্ছলতার চাকচিক্য সহজেই নজরে পড়ত শহরটায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফেনীর বিখ্যাত খদ্দর কাপড়, বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, বিড়ি কোম্পানি ইত্যাদি। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিদের মধ্যে অ্যালোপাথিক ওষুধ উৎপাদনের কোম্পানি জেনিথ ল্যাবরেটরি (পাক) লিমিটেড এবং হেকিমি ওষুধ উৎপাদনের কোম্পানি বেঙ্গল ইউনানি দাওয়াখানা লিমিটেডে উৎপাদিত বিভিন্ন ওষুধ গোটা পূর্ব পাকিস্তানে প্রসিদ্ধ ছিল। বিড়ি উৎপাদনের কোম্পানির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল 'শান্তি বিড়ি কোম্পানি' এসবসহ আরও অনেক ক্ষুদ্র শিল্পে কর্মসংস্থান হতো স্থানীয় লোকদের। আর এসব শিল্প-বাণিজ্য ছিল সম্পূর্ণ স্থানীয় মালিকানাধীন।

রাজনীতিতেও ফেনীর নাম ছিল। যেকোনো জাতীয় আন্দোলনে ফেনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকত। তখনকার নামকরা রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) মাহাবুবুল হক, সাবেক স্বদেশী আন্দোলনের নেতা খদ্দর পরা আবদুল জব্বার খদ্দর, মুসলিম লীগ সভাপতি মকবুল আহমদ উকিল, আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর নেতা আবদুস সাত্তার। এ ছাড়া ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলামি দলের। এদের অনেকেই নিজ নিজ দিক থেকে বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী। তবে স্থানীয় এমএনএ মাহাবুবুল হক ছিলেন সত্যিকার অর্থে এক প্রতিভাবান ও আকর্ষণীয় চরিত্রের রাজনীতিবিদ। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে মাহবুব আগে থেকেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাংবাদিকতায়ও হাত পাকিয়েছিলেন তিনি। বাংলা ও

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ইংরেজি উভয় ভাষায় আগুন ঝরানো বক্তৃতা করতে পারতেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তার প্রবর্তিত অদ্ভুত মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেওয়া তার ইংরেজি বক্তৃতাগুলো ছিল সাহসী, তীক্ষ্ণ ও চটকদার ব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা। এমন বক্তৃতা বিশ্বমানের সংসদগুলোতেও ছিল বিরল। যেমন, এক বক্তৃতায় মৌলিক গণতন্ত্রের তুখোড় সমালোচনা করে তিনি একে তুলনা করেন 'a multi-headed hydra'-এর সঙ্গে। রাজনীতিতে সফলতা অর্জনের জন্য অপর যে গুণটা অপরিহার্য, তা হলো সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী চেনা এবং তাদের আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। মাহবুবের এ দুটো গুণই ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। মনে আছে, স্থানীয় ছাত্ররাজনীতিতে আমার সেই প্রথম পদক্ষেপের মুহূর্তেই আমি পরিচিত হই তার সঙ্গে। রাজনীতিতে তখনো আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নবিশমাত্র। কিন্তু মাহবুবুল হকের পাকা চোখে হয়তো ধরা পড়েছিল কোনো আসামির সম্ভাবনা। যে গুরুত্ব দিয়ে তিনি আমার মতামত ও পরামর্শ নিতে শুরু করলেন, তা আমাকেও আশ্চর্যান্বিত করল। প্রথমে ভাবতাম জাতীয় পরিষদের জাঁদরেল সদস্য হলেও ভবিষ্যতের নির্বাচনি বিজয় নিশ্চিত রাখার জন্য এলাকার প্রধান কলেজের উদীয়মান ছাত্রনেতাকে হাতে রাখার প্রয়োজনে তার কাছে আমার এই গুরুত্ব। কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই এই ভুল ভাঙল। পরিষ্কার হয়ে গেল যে নিঃস্বার্থভাবেই আমাকে ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য মেনটরিং করতে মনস্থ করেছেন তিনি।

দেখতে দেখতে দুই বছর কেটে গেল। ঘটনাবহুল দুই বছর। ছোট্ট মফস্বল শহরের সংক্ষিপ্ত পরিসরের বাইরেও যে একটা বিশাল জগৎ আছে, তা-ও পরিপূর্ণ ছিল অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনায়। পাকিস্তানের রাজনীতি তখন আইয়ুবের সামরিক শাসনাধীন। চারদিকে একটা গুমোট অস্বস্তি ছেয়ে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবের মৃত্যুর পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই হয়ে উঠলেন এই প্রদেশের (এবং সম্ভবত সারা দেশের) মুখ্য নেতা। গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান তার ১৯৫৩ সালের লাহোরের মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে অর্জিত 'কসাই' বদনাম কাটাবার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জনে মনোনিবেশ করলেন। ১৯৬২ সালের ৩ জানুয়ারি আজম খানকে না জানিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে করাচিতে গ্রেপ্তার করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে উঠল প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড়। আজম খানের সঙ্গে আইয়ুবের মতবিরোধ চলছিল আগে থেকেই। এ ঘটনা তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তিনি পদত্যাগ করলেন। আবেগপ্রবণ লাখো বাঙালি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন তাদের একান্ত প্রিয় গভর্নর 'পশ্চিমা-অবাঙালি' আজম খানকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী বটে, তবে আন্তরিক ভালোবাসা শনাক্ত করতে বিলম্ব করে না। আন্তরিকতার সুতায় মালা গাঁথে ঐক্যের, সম্প্রীতির। আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক। কিন্তু আবেগপ্রবণ বাঙালির অনুভূতির যে সুতোর সন্ধান আজম খান পেয়েছিলেন, হঠকারী আইয়ুব তা পাননি। আজম খানের বিদায়ে ছিন্ন হয়ে গেল দুই প্রদেশের সংহতির প্রথম সুতোটি।

পাকিস্তানের বাইরে বিশ্বজুড়ে এবং ষাটের দশকের এই প্রথম বছর কটি ছিল নানা দিক থেকে চমকপ্রদ ও ঘটনাবহুল।

আমেরিকাজুড়ে চলছে যৌবনের উদ্দাম জয়যাত্রা। ১৯৬০ সালে রোমের 'সামার অলিম্পিকে' ১৮ বছর বয়সি ক্যাসিয়াস ক্লে (যিনি পরে ইসলাম কবুল করে মোহাম্মদ আলী নাম গ্রহণ করেন) লাইট হেভিওয়েটে স্বর্ণপদক লাভ করে সাড়া জাগিয়ে দেন দুনিয়াজুড়ে। ১৯৬৪ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে সনি লেস্টারকে হারিয়ে তিনি হেভিওয়েট বক্সিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেন এবং বিপুল বিজয়ের পর ক্যাসিয়াস ক্লে (মোহাম্মদ আলী) তার বিখ্যাত গর্বভরা দাবিটি প্রথম উচ্চারণ করেন:

> I was born to be great, I am great and I will be greater–the greatest.

'আমি মহান হতে জন্মেছি, আমি মহান— আমি হব আরও মহান— মহানতম।'

মুখে যা-ই বড়াই করুন না কেন, বক্সিংয়ের মুষ্ঠিযুদ্ধের আসন তাৎপর্যের ব্যাপারে মোহাম্মদ আলীর ধারণা আদৌ মোহগ্রস্ত ছিল না।

তার নিজের ভাষায়:

> Boxing is, a lot of whitemen watching two blackmen beating each other up.

আমেরিকার ১৯৬০ সালের অন্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সনকে হারিয়ে অপেক্ষাকৃত যৌবনের উজ্জ্বলতায় প্রদীপ্ত জন এফ কেনেডির প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়া। থিওডোর রুজভেল্টের পর কেনেডিই হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় নবীনতম (৪৩ বছর) প্রেসিডেন্ট। কেনেডির তারুণ্যই শুধু একমাত্র গুণ ছিল না, লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন স্বীকৃত। তিনিই একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যিনি তার জীবনীগ্রন্থ *Profiles in Europe*-এর জন্যে পুলিৎজার প্রাইজ লাভ করেন।

নিজেদের দেশের দেউলিয়া রাজনীতি আর অনুকরণযোগ্য প্রতিভাবান রাজনীতিবিদের অভাবে আমরা আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য রোল মডেল খুঁজে বেড়াতাম অন্যত্র— আমেরিকা, চীন, রাশিয়া বা ব্রিটেনে। এই সময়ে কেনেডির আগমন স্বভাবতই উল্লসিত করল আমাদের। আমাদের রাজনীতিবিদেরা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ নিয়েই মশগুল থাকতেন। দেশ বা জাতির উন্নয়ন ও বৃহৎ কোনো অর্জনের দুরদৃষ্টিসম্পন্ন আকাঙ্ক্ষা লালন করে এমন অপবাদ তাদের কোনো শত্রুও দিতে পারবে না। কিন্তু কেনেডিরা ছিলেন স্বাপ্নিক, ভিশনারি, জাতিকে তারা স্বপ্ন দেখাতে পারতেন। আর শুধু ফাঁকা স্বপ্নই নয়, তা অর্জনের বাস্তব পদক্ষেপও নিতে তারা বিলম্ব করতেন না। একটা উদাহরণ দিই। ১৯৬১ সালের ২৫ মে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় ঘোষণা করেন:

> I feel the nation should commit itself to achiving the goal, before the decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.

'আমি মনে করি, আমাদের জাতির উচিত এই দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদের বুকে একজন মানুষকে নামিয়ে তাকে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আসার সংকল্প করা।'

যেমন কথা তেমন কাজ, দশক শেষ হওয়ার অনেক আগে, মাত্র আট বছর পরে ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই এ্যাপোলো ১১ চাঁদে মানুষ নামাল— একজন নয় দুজন— নীল আর্মস্ট্রং ও বাজ এলড্রিন। প্রথম মানুষ হিসেবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করে মিশন কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন:

> That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

গর্বিত হলো আমেরিকানরা আর তাদের সঙ্গে গোটা মানবজাতি।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কেনেডি ও আমেরিকা তখন ব্যস্ত ছিল কম্যুনিজম ঠেকাবার বিশ্বজোড়া যুদ্ধে। নামে শীতল যুদ্ধ হলেও কার্যত এই যুদ্ধ ছিল ভয়ংকর রকমের উত্তপ্ত আগুনঝরা। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সিআইএ'র উদ্যোগে গঠিত প্যারামিলিটারি 'ব্রিগেড ২৫০৬' ফিডেল কাস্ট্রোর কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য 'বে অব পিগস ইনভেশন' নামে এক ব্যর্থ অভিযান চালায় এবং করুণ পরাজয় বরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী ভূমিকার কারণে কাস্ট্রোর অনুরোধে রাশিয়া কিউবায় আণবিক মিশাইল প্রতিষ্ঠা করে। সন্ত্রস্ত আমেরিকা কিউবার চারপাশে নৌঅবরোধ শুরু করে। মানবজাতি প্রথমবারের মতো পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। শেষ নাগাদ অবশ্য চুক্তির মাধ্যমে ভালোয় ভালোয় এই সংকটের অবসান হয়।

কিন্তু রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টি, 'ভিশন' আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা শুধু নিজের ও নিজের দেশের জন্য। বিশ্বমানবতার প্রশ্ন তাদের কাছে তেমন কোনো গুরুত্ব রাখে না। হিরোশিমা নাগাসাকির আণবিক গণহত্যাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধবাজ হিসেবে আমেরিকার নামডাক দুনিয়াজোড়া। সেই দেশের অস্ত্র উৎপাদনকারী পুঁজিপতিরা নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থেই রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শবাদী হতে দেয় না। শত্রু না থাকলে তারা নতুন শত্রু আবিষ্কার করে। ঘৃণার বীজ বোনে দেশ ও জাতির মনে, শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম আর নতুন অস্ত্র সরবরাহের অফুরন্ত সুযোগ। দুনিয়াজোড়া শীতল যুদ্ধের প্রভাব অস্ত্র-ব্যাপারীদের জন্য দুঃসংবাদ। নতুন 'ভিলেন' মিলতেও বিলম্ব হলো না খুব একটা। পৃথিবীর কোনায় কোনায় কম্যুনিজমের প্রভাব খুঁজে তা প্রতিহত করাটাই আমেরিকার প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।

সাধারণ নাগরিকদের ভোগবিলাসে আর রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে লাগিয়ে দেওয়া হলো। বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হলো দূরের মানুষদের দুঃখ-কষ্টে বেদনাবোধ করা থেকে।

কম্যুনিজম ঠেকানোর যুদ্ধ শুরু হলো শুধু ঘরের পেছনে কিউবায় নয়, বরং সুদূর ভিয়েতনামে, লাওস আর কম্বোডিয়ায়। ভিয়েতনামের শাসক নগুয়েন ভেন থিউকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ইতোমধ্যে পাঠিয়েছিলেন সামরিক উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক। কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন আঠারো গুণ। অবশ্য এই যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতির শেষ পরিণতি কী হতে পারে, তা কেনেডির কাছে ছিল দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তবু জেমস ফ্রি ম্যান ক্লার্কের চিরন্তন অনুসিদ্ধান্ত: 'A politician thinks of the next election'-এর অনুসরণে কেনেডি বললেন:

> We don't have a prayer of staying in Vietnam. Those people hate us. They are going to throw our

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

সিআইএ'র উদ্যোগে গঠিত প্যারামিলিটারি 'ব্রিগেড ২৫০৬' ফিডেল কাস্ট্রোর কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য 'বে অব পিগস ইনভেশন' নামে এক ব্যর্থ অভিযান চালায় এবং করুণ পরাজয় বরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী ভূমিকার কারণে কাস্ট্রোর অনুরোধে রাশিয়া কিউবায় আণবিক মিশাইল প্রতিষ্ঠা করে। সন্ত্রস্ত আমেরিকা কিউবার চারপাশে নৌঅবরোধ শুরু করে। মানবজাতি প্রথমবারের মতো পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। শেষ নাগাদ অবশ্য চুক্তির মাধ্যমে ভালোয় ভালোয় এই সংকটের অবসান হয়।

কিন্তু রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টি, 'ভিশন' আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা শুধু নিজের ও নিজের দেশের জন্য। বিশ্বমানবতার প্রশ্ন তাদের কাছে তেমন কোনো গুরুত্ব রাখে না। হিরোশিমা নাগাসাকির আণবিক গণহত্যাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধবাজ হিসেবে আমেরিকার নামডাক দুনিয়াজোড়া। সেই দেশের অস্ত্র উৎপাদনকারী পুঁজিপতিরা নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থেই রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শবাদী হতে দেয় না। শত্রু না থাকলে তারা নতুন শত্রু আবিষ্কার করে। ঘৃণার বীজ বোনে দেশ ও জাতির মনে, শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম আর নতুন অস্ত্র সরবরাহের অফুরন্ত সুযোগ। দুনিয়াজোড়া শীতল যুদ্ধের প্রভাব অস্ত্র-ব্যাপারীদের জন্য দুঃসংবাদ। নতুন 'ভিলেন' মিলতেও বিলম্ব হলো না খুব একটা। পৃথিবীর কোনায় কোনায় কম্যুনিজমের প্রভাব খুঁজে তা প্রতিহত করাটাই আমেরিকার প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।

সাধারণ নাগরিকদের ভোগবিলাসে আর রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে লাগিয়ে দেওয়া হলো। বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হলো দূরের মানুষদের দুঃখ-কষ্টে বেদনাবোধ করা থেকে।

কম্যুনিজম ঠেকানোর যুদ্ধ শুরু হলো শুধু ঘরের পেছনে কিউবায় নয়, বরং সুদূর ভিয়েতনামে, লাওস আর কম্বোডিয়ায়। ভিয়েতনামের শাসক নগুয়েন ভেন থিউকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ইতোমধ্যে পাঠিয়েছিলেন সামরিক উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক। কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন আঠারো গুণ। অবশ্য এই যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতির শেষ পরিণতি কী হতে পারে, তা কেনেডির কাছে ছিল দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তবু জেমস ফ্রি ম্যান ক্লার্কের চিরন্তন অনুসিদ্ধান্ত: 'A politician thinks of the next election'-এর অনুসরণে কেনেডি বললেন:

> We don't have a prayer of staying in Vietnam. Those people hate us. They are going to throw our

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

> asses out of there at almost any point. But I can not give up that territory to the Communists and get American people to re-elect me.

'আমাদের ভিয়েতনামে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই, ওসব লোকেরা আমাদের ঘৃণা করে। যেকোনো মুহূর্তে ওরা আমাদের পাছায় লাথি মেরে ভাগাবে। তবু এই এলাকা আমি কম্যুনিস্টদের ছেড়ে দিয়ে আশা করতে পারি না যে, আমেরিকাবাসী আমাকে পুনর্নির্বাচিত করবে।'

মোক্ষম ভবিষ্যদ্বাণী বটে। মাত্র দেড় দশকের মাথায় ২৯-৩০ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে Operation Frequent Wind নামের এই লজ্জাকর কর্মসূচিতে পরাজিত মার্কিনিদের ও তাদের ভিয়েতনামি সহযোগীদের এয়ারপোর্ট, সামরিক বিমানঘাঁটি থেকে বিমানে এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন দূতাবাসের ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে করে পার করতে হয়। শেষ পর্যন্ত দূতাবাসের মার্কিন পতাকাটা নামিয়ে ভাঁজ করে তা বগলে নিয়ে পালাতে হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকেও। এক যুগ স্থায়ী এই আহাম্মকি সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ: নিহত হলো ৫৮ হাজার মার্কিন সৈন্য ও বেসামরিক কর্মচারী এবং ২০ লাখ ভিয়েতনামি নাগরিক।

তবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে যায় তার। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ডালাস শহরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন প্রেসিডেন্ট জন ফিটজারল্ড কেনেডি।

কালো আমেরিকানরা তখনো লড়ছিল পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য। দেশজুড়ে সিভিল রাইটস আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এর তীব্রতা প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে বাধ্য করল একটা 'সিভিল রাইটস্ লেজিসলেশান' অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের সামনে পেশ করতে। এই আন্দোলন জগৎজুড়ে ছড়িয়ে দিলেন এক স্বাপ্নিক নেতা ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট তারিখে ওয়াশিংটনের লিংকন মোমো রিয়ালের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আড়াই লাখ সমর্থকের সামনে ড. কিং প্রদান করলেন তার স্বপ্নময় অথচ মহাবিস্ফোরক বক্তৃতা।

কিং বললেন—

> Let us not wallow in the vally of despair, I say to you my friends! And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

have a dream. It is a dream deeply rooted in the American derams.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slavers and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of Brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississipi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppossion, will be transformed in an oasis of freedom and justice, I have a deram that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the quality of their character.

I have a dream today!

'আমি আপনাদের বলি, হে বন্ধুরা! আর হতাশার কাদার উপত্যকায় গড়াগড়ি দেওয়া নয়। যদিও আমরা আজকের ও আগামীকালের দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছি, তবু আমার একটা স্বপ্ন আছে, যে স্বপ্নের শিকড় গজিয়েছে আমেরিকান স্বপ্নের ভেতর।

'আমি স্বপ্ন দেখি যে, একদিন আমাদের এই জাতি আমাদের জাতীয় মূলনীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করবে।

'আমরা এই সত্য স্বপ্রমাণিত হিসেবে বিবেচনা করি যে, সব মানুষকে সমান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

'আমার একটা স্বপ্ন আছে, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে সাবেক দাসের সন্তানেরা আর সাবেক দাস-মালিকদের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের টেবিলে একসঙ্গে বসতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

'আমার একটা স্বপ্ন আছে, একদিন এমনকি মিসিসিপি প্রদেশও— যে প্রদেশ ঘৃণা ও জুলুমের উত্তাপে ঘর্মাক্ত— রূপান্তরিত হবে মুক্তি ও সুবিচারের মরূদ্যানে।

'আমার একটা স্বপ্ন আছে, একদিন আমার ছোট্ট চারটি সন্তান এমন দেশে বাস করবে, যেখানে তাদের মূল্যায়ন করা হবে তাদের চারিত্রিক গুণ দিয়ে, তাদের গায়ের রং দিয়ে নয়।'

নিজের অনুবাদের দক্ষতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে বটে, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, ওপরের অনুবাদটুকু ড. কিংয়ের সেদিনের আবেগসিক্ত কাব্যময় ওজস্বী সেই বক্তৃতার এক অক্ষম সাদামাটা ভাষান্তরণ মাত্র।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পনেরো

মার্কিন নেতারা যখন নিজেদের জাতিকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন, পাকিস্তানের নেতারা তখন নিজেদের আত্মস্বার্থের সংকীর্ণ স্বপ্নে বিভোর। সামরিক শাসক আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ও মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক আজব পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রচিত নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯৬০ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত এক কনস্টিটিউশন কমিটি এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (তৎকালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল আবু সাঈদ চৌধুরীও ছিলেন অন্যতম।)

আইয়ুবের হঠকারী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে এ ছাড়াও ছিল প্রথমে প্রফেসর শরীফ ও পরে বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত দুটি ব্যাপকভাবে জনধিকৃত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ, ময়মনসিংহ শহরের অজানা-অপরিচিত উকিল মোনায়েম খানকে গভর্নর নিযুক্ত (২৫ অক্টোবর ১৯৬২) করা। এর প্রতিটি জ্বলন্ত অঙ্গারে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করল। দাবানল জ্বলে উঠল সারা পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সারা দেশ ছাত্র হরতাল ও বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে গুলিবর্ষণ করলে তিনজন ছাত্র নিহত, দুই শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হন। বহুসংখ্যক গ্রেপ্তার হয়। আইয়ুব খান ভাষণ দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এলেও প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে বক্তৃতা দিতে ব্যর্থ হয়ে তড়িঘড়ি কার্জন হল থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার কোনো এক দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না— তাই ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে ১৯৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর উভয় প্রদেশের সকল বিরোধী দলের সর্বমোট ৫৪ জন নেতার নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) গঠন করা হয়।

এন.ডি.এফ প্রতিষ্ঠা অবশ্য রাতারাতি হয়নি। একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছিল এই সর্বদলীয় ঐক্য মোর্চা। ১৯৬২ সালের ৩রা জানুয়ারি করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব পাকিস্তানের

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

গভর্নর আজম খানকে না জানিয়েই গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতার পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২৫শে জুন সংবাদপত্রে 'নয় নেতার বিবৃতি' প্রকাশিত হয়। এর বিবৃতিতে বলা হয়, 'গণতন্ত্রের সারকথা হচ্ছে জনগণই সার্বভৌম এবং সকল ক্ষমতার উৎস। গণপ্রতিনিধি ছাড়া কোনো ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে না। করলে তা স্থায়ী বা গ্রহণযোগ্য হবে না।' নয় নেতার বিবৃতি সারাদেশে দারুণ সাড়া জাগায়। ১৪ই জুলাই জাতীয় পরিষদে 'পলিটিকেল পার্টিজ বিল' গৃহীত রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করার অনুমতি মেলে। আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান করাচির জেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে দেখা করলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই বিলের শর্তসাপেক্ষে অগণতান্ত্রিক পরিবেশে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করার বিপক্ষে মত দেন। ১৯ শে আগস্ট তিনি জেল থেকে মুক্তি পান এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসলে বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই বিপুল জনতার সামনে ঘোষণা করেন: 'নয় নেতার বিবৃতির ফলে দেশে কোটি নেতা সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানেও অদ্ভুত সাড়া জেগেছে, তারা নেতৃত্বের জন্য চেয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। আমিও নয় নেতার সাথে শামিল হলাম— আমার নম্বর দশ।' ২৪ দফা সংবলিত এই ঐতিহাসিক বিবৃতিতে যে নয় নেতা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা হলেন:

১. নুরুল আমীন

২. আতাউর রহমান খান

৩. হামিদুল হক চৌধুরী

৪. আবু হোসেন সরকার

৫. শেখ মুজিবুর রহমান

৬. ইউসুফ আলী চৌধুরী

৭. মাহমুদ আলী

৮. সৈয়দ আজিজুল হক

৯. পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ

এই বিবৃতি জনগণের মধ্যে বিপুল আলোচনা এবং শাসকশ্রেণির মধ্যে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করে। সরকারি পত্র-পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা শুরু হয়। আইয়ুব খান নেতাদের 'নিমক হারাম' বলে গালাগাল করেন। ৮ই জুলাই তারিখে নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হয়। নেতৃত্ব অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন।

এ সম্পর্কে চারদিকে সে সময়েও জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের এ বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেছেন তাঁর লেখায়:

'দেশের দুর্ভাগ্য যে, এই ক্রান্তিলগ্নে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে চলে যান। এই সুযোগে গণঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য শেখ মুজিবের ভূমিকা দেশের সমূহ ক্ষতি করেছে।

'অনেকেই জানেন, যুক্তফ্রন্টে থাকাকালে শেরে বাংলার সঙ্গে শেখ মুজিবের মতানৈক্য ঘটে। মাওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবের দুর্ব্যবহারের জন্য আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। আবার শেষ জীবনে শহীদ সাহেবের সঙ্গে শেখ মুজিবের মতানৈক্য ঘটে। সেই কথাই এখন বলছি।

'শহীদ সাহেব এন.ডি.এফকে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে লন্ডনে চিকিৎসার জন্য গেলেন। দেশে নুরুল আমীন এন.ডি.এফের পতাকা-তলে থেকে বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খাঁ প্রভৃতি নেতা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মোর্চা গঠন করে বিরোধীদলকে বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শেখ মুজিব এতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কারণ নেতৃত্ব তাঁর হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম। তিনি দিশেহারা হয়ে ছুটলেন লন্ডনে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, তা না হলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়বে। শহীদ সাহেব একথা শুনে শেখ মুজিবকে তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এবং আওয়ামী লীগের অন্য কয়েকজন নেতা, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এই লোকটি আমার দেশকে ধ্বংস করতে চায়, আমি এই ধ্বংসযজ্ঞের অংশীদার হতে পারিনে। ওর থেকে সাবধান থেকো। সে শুধু দেশকে ধ্বংস করবে না, বাঙালিদেরও ধ্বংস করবে।'[৫]

নিরাশ হয়ে ঢাকায় ফিরলেও মুজিব তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষক সোহরাওয়ার্দী সাহেবের হুকুমের তোয়াক্কা না করে এন.ডি.এফ থেকে আওয়ামী লীগকে বের করে পুনরুজ্জীবিত

---

৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, *সাংবাদিকের রোজনামচা*, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

করলেন। এ সংবাদে মর্মাহত শহীদ সাহেব বৈরুতের হোটেল থেকে লেখা এক চিঠিতে *ইত্তেফাক* সম্পাদক মানিক মিয়াকে তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন এই আঘাতই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর আত্মীয়-পরিজনের অনুপস্থিতিতে বৈরুতের এক নির্জন হোটেল কক্ষে পরলোক গমন করেন তিনি। পাকিস্তানের উভয় অংশেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে ছিলেন বিপুলভাবে সম্মানিত। সোহরাওয়ার্দী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভুলচুকও করেছেন প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। পরিবর্তে জনগণও তাঁকে আপ্লুত করেছেন শর্তহীন অকৃত্রিম ভালোবাসায়। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো তাঁর মৃত্যুর সংবাদ যেন জাতিকে স্তব্ধ, নির্বাক করে দেয়।

আমি তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। স্কুল জীবন থেকেই আব্বার মুখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য খাতনামা যশস্বী পুরুষ: যেমন তাঁর নানা বিখ্যাত আলেম মাওলানা ওবায়েদউল্লাহ ওবারদী সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর মামা বিলাত ফেরত আবদুল্লাহ মামুন সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। কলেজের প্রথম দু'বছরে ছাত্রলীগ প্রভাবিত ইউ.এস.এস করতাম বলে আওয়ামী লীগ এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। তাই গোটা জাতির মতো তাঁর মৃত্যু আমাকেও প্রচণ্ডভাবে শোকাভিভূত করল। মনে আছে দৈনিক *ইত্তেফাক* তাঁর মৃত্যুর ওপর বিরাট একটা স্মরণিকা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করল। এর প্রচ্ছদে ছিল পৃষ্ঠা জোড়া সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরাট ছবি। নিচে সম্ভবত কবি ফররুখ আহমদের লেখা কয় পঙ্‌ক্তি কবিতা—

'অকস্মাৎ সারাদেশ স্তব্ধতায় নীরব নিথর
বেলুচ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বাঙালীর ঘর
আপন সন্তান-হারা।'

সে ছবিসহ পতাকা আয়না-বাঁধিয়ে গ্রামের বাড়িতে আমার শোয়ার খাটের ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। শহীদ সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে সরকারি ও বিরোধীদল উভয়েই তাঁর মৃত্যুকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে বিলম্ব করলেন না। আইয়ুব খান জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার হুকুম দিলেন। জাতীয় পরিষদে সরকারের পক্ষে খান সবুর ও বিরোধী দলের পক্ষে শেখ মুজিব ও জহিরুদ্দীন কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে বক্তৃতা করলেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সেই অশ্রুবর্ষণ যে কৃত্রিম ছিল তা পরিষ্কার হতে দেরি হলো না। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যত্নে গড়া গণ আন্দোলন এন.ডি.এফ ভেঙে পশ্চিম পাকিস্তানি আওয়ামী লীগ নেতাদের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, মাহমুদ আলী কাসুরী ও খাজা মোহাম্মদ সফদার নিয়ে ২২শে জানুয়ারি করাচিতে নতুন এক এন.ডি.এফ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এবং সোহরওয়ার্দী সাহেবের পরিষ্কার নির্দেশ অমান্য করে ২৫শে জানুয়ারী (১৯৬৪) তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসভবনে আওয়ামী লীগের যুক্তসভা অনুষ্ঠান করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন। এইভাবে অনেকের মতে আইয়ুব খানের গোপন ইঙ্গিত ও উৎসাহে ভেঙে গেল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যত্নে গড়া একনায়কত্ব বিরোধী দুর্বার আন্দোলন। শিগ্‌গিরই ন্যাপও (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) পুনর্গঠিত হলো। আনন্দে বগল বাজালেন আইয়ুব খান।

শেখ মুজিবের এ সময়কার রাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের দোষগুণের একটা বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছেন তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধু আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থে। নিচে তার কয়েকটা উল্লেখ করছি:

‘কিন্তু ইতোমধ্যে গৃহ বিবাদের অশান্তি আমাদের পাইয়া বসিয়াছিল। আতাউর রহমান সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনই আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিক। দুই এর পক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা এক বছরে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। ...এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলংকের মতই ছিল আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। ...কিন্তু সবার চেয়ে বেশী ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একগুঁয়েমী। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া দেওয়ার মূলেও ছিল মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপ। ...পক্ষান্তরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া তিনি পূর্ব বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। ...যুক্তফ্রন্ট ভাংগার ফলে যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার দাবি দাওয়া গৃহীত হইতে পারে নাই, এবং সেই হইতে ১৯৫৮ সালে দেশের চরম দুর্যোগ আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে যে যুক্তফ্রন্ট ভাংগার বিষময় পরিণাম বলা যায়, এটা দলমত নির্বিশেষে প্রায় সবাই স্বীকার করিয়া থাকেন।’ সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতে গেলে কলেবর দীর্ঘ হয়ে যায় বিধায় মাঝে মাঝে বাদ দিতে হলো। কিন্তু সে সময়ের রাজনীতিবিদ এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক হিসাবে এবং সর্বোপরি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে তাঁর পর্যালোচনা ও

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মূল্যায়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার দাবি রাখে। অন্যত্র মুজিব চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

'আমার বিবেচনায় মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই আত্মপ্রীতি ছিল খুব প্রবল, এটাকেই তিনি তাঁর পার্টি প্রীতি বলিয়া চালাইতেন।'

ইস্কান্দার মির্যার চালে পড়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে মার্শাল ল' জারি হওয়ার মাত্র ছয় দিন আগে সকলের বাধা ঠেলে করাচি ছুটে গিয়েছিলেন মন্ত্রী হতে। আবুল মনসুরের ভাষায়:

'কিন্তু কেন জানিনা, কার বুদ্ধিতে বুঝি নাই। মুজিবুর রহমান আমাদের কাউকে না জানাইয়া কয়েকজন হবু মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচী চালিয়া গেলেন। মন্ত্রীত্বের শপথ নিলেন। ভাল পোর্টফলিও পাওয়া গেল না বলিয়া চার পাঁচ দিন পরে পদত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মার্শাল ল। কী চমৎকার প্ল্যানটা ছিল সুস্পষ্ট। স্বার্থান্ধ ছাড়া আর সবাই বুঝিয়াছিলেন।'

আইয়ুবের মার্শাল ল'র উৎপত্তি এখানেই। আইয়ুব শাহি উৎখাতের জন্য গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) ও একইভাবে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পরিষ্কার নিষেধ অমান্য করে কোনো এক অদৃশ্য প্ররোচনার শিকার হয়ে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করে, ভেঙে দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

জনমতের চাপে এবং নিজের অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণটা কোনো রকম হালাল করার জন্য অবশেষে আইয়ুব ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করলেন। মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদ ও এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখও দেওয়া হলো। সরাসরি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নয়, বরং আইয়ুবের আজব আবিষ্কার মৌলিক গণতন্ত্রের ৮০ হাজার বি.ডি মেম্বারের ভোটে এই নির্বাচন হবে। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সকল বিরোধীদলের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা 'সম্মিলিত বিরোধীদল' (Combined Opposition Party-COP) গঠিত হয়। কায়দে আযমের বোন মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে COP-এর একক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

আমি এ সময়ে ফেনী কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। কলেজ ছাত্র মজলিশের প্রাক্তন সদস্য হিসাবে সংগত কারণেই রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ক্রমশই ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইউ,এস,এস ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলাম। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ জোগালেন, ইউ,এস,এসের সভাপতি ও ছাত্রলীগ নেতা চৌদ্দগ্রামের এয়ার আহমদ সাহেব। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে শহরের প্রায় সকল বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। অবশ্য সেই সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আহ্বানও একইভাবে বেড়ে চলল। ফলে লেখাপড়ায় দেওয়ার মতো সময় হ্রাস পেতে থাকল।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। সর্বত্র COP-এর পক্ষ থেকে জনসভার আয়োজন করা হচ্ছিল। শুরুর দিকে এসব সভা প্রধানত স্থানীয় উদ্যোগেই আয়োজিত হতো। পরে বক্তার জন্য ফেনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র নেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হতো। কিন্তু এ ব্যবস্থা নানা কারণে সন্তোষজনক ছিল না। এসব অভিযোগ ও অসন্তোষের অবসানের জন্য সকল বিরোধীদল ও ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি খাজা আহমদকে সভাপতি করে সম্মিলিত বিরোধীদল (COP)-এর ফেনী শাখা গঠিত হলো। ছাত্র দলগুলো মিলে গঠন করল 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। রাজনীতি আমাকে অনেকটা নেশার মতো পেয়ে বসল। আব্বা ও বড়দা'র পৌনঃপুনিক হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতমভাবে জড়িয়ে পড়লাম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। গোল্লায় গেল লেখাপড়া। সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুবাদে আমি ইতোমধ্যেই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলাম। ছুটে বেড়াচ্ছিলাম মহকুমার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। একদিনে একাধিক জায়গায়— জনসভা থেকে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। খ্যাতনামা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা মঞ্চে অংশগ্রহণ করতে একদিকে বাড়ছিল আত্মবিশ্বাস অন্যদিকে পরিচিতি। জনসভাগুলোর কেন্দ্রীয় আকর্ষণগুলোর মধ্যে আমিও হয়ে উঠলাম অন্যতম। মনে আছে সিলোনীয়ায় এমন এক জনসভায় আমাকে এই বলে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করা হলো: 'এখন আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন সংগ্রামী ছাত্রনেতা ফেনীর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অতন্দ্র কর্মী এবং এই মহকুমার আইয়ুব-কনভেনশান লীগের নেতা, ৬ নং উদরাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, কাজী নুরুল হুদা চৌধুরী (সুরুজ মিয়ার) ভাতিজা চৌধুরী মুঈনুদ্দীন।' সুরুজ কাকার পরিচয়কে আইয়ুব খানের সাথে যুক্ত করে দিয়ে প্রস্তাবক আমার গুরুত্ব বাড়াতে না কমাতে চাইলেন বোঝা গেল না।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ষোলো

ফাতেমা জিন্নাহর মনোনয়ন রাজনৈতিক ময়দানে হঠাৎ করে জাগিয়ে তুলল নতুন সম্ভাবনার আলোক মশাল। দেশজুড়ে পড়ে গেল নতুন সাড়া। স্বল্পবাক মাদারে মিল্লাত (ফাতেমা জিন্নাহকে যে নামে দেশবাসী জানত) জাতিকে ডাক দিলেন ছোট্ট এক বাক্যে 'Awake Pakistan! now or never', 'জাগো পাকিস্তান, এখন অথবা কখনো নয়।' মুহূর্তে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো একটা ক্ষণস্থায়ী আশ্বাসের আলোকে ঝলকে উঠল সারা দেশ। স্বৈরতন্ত্রের স্টিমরোলারে নিষ্পেষিত অসাড় অসহায় জাতি যেন বেঁচে ওঠার আগ্রহে নড়েচড়ে বসল। ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন। জনতার ঢল নেমে গেল দিকে দিকে। জনসভাগুলোতে সমুদ্র স্রোতের মতো সমবেত মানুষের স্থান সংকুলান করতে ভীষণ বেগ পেতে হলো উদ্যোক্তাদের।

কিন্তু পাকিস্তানের বরাত খারাপ। জন্মলগ্ন থেকেই এক কুচক্রী প্রাসাদ চক্রান্তকারী আমলা ও জোতদার গোষ্ঠী সিন্দবাদের জিনের মতো অভাগা এই দেশটার কাঁধে সওয়ার হয়ে বসেছিল। তার সঙ্গে সেনাবাহিনীকে সংযুক্ত করে ফেলে তারা সার্বিক অর্থে জাতির দণ্ডমুণ্ডের নিয়ামক হয়ে বসল। মৌলিক গণতন্ত্র নামের এক কিম্ভূতকিমাকার প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনমতের জোয়ারকে করা হলো অর্গলবন্ধ। ফাতেমা জিন্নাহর উদাত্ত আহ্বান, জাগো পাকিস্তানেও জাগতে দেওয়া হলো না পাকিস্তানকে। ভবিষ্যতেও আর কোনো দিন জাগবার সম্ভাবনা বাকি রইল না। আইয়ুব খান জিতল বটে, কিন্তু কবর রচনা হয়ে গেল পাকিস্তানের।

ফাতেমা জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান সফরের এক বিশেষ অংশ ছিল ট্রেনযোগে প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গণসংযোগ অভিযান। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সফরটা ছিল এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘণ্টা আটেকে যে সফর শেষ হওয়ার কথা, তাতে লেগে গেল ৩০ ঘণ্টার ও বেশি। এক্সপ্রেস ট্রেন 'গ্রিন এরো'ও হারিয়ে বসল তার দ্রুতগমন ক্ষমতা। প্রায় সব কটা বড় স্টেশন ও জংশনে জমায়েত হাজারো মানুষের উচ্ছল উচ্ছ্বাস বাধার পাহাড়ের মতো থামিয়ে রাখল ট্রেনটাকে। প্রতি স্টেশনে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ফাতেমা জিন্নাহর বক্তব্য শোনার জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল ও ছাত্র

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সংগ্রাম পরিষদের স্থানীয় নেতারা প্ল্যাটফর্মের ওপরই তৈরি করে রাখে বিশাল বক্তৃতা মঞ্চ। মিস জিন্নাহর জন্য প্রতীক্ষারত জনতার মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে পালাক্রমে চলছিল রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধক গানের মাহফিল। একইভাবে তৈরি হয়েছিল বিশাল এক মঞ্চ ফেনী রেল স্টেশনেও।

ফাতেমা জিন্নাহর ট্রেনটি ফেনীতে পৌঁছার কথা দুপুর ২টায়, অথচ সন্ধ্যার পরও পৌঁছার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জনতার ভিড় উপচে পড়ছে প্ল্যাটফর্ম ও তার চারপাশ। স্থানীয় কপ (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর দুর্বলতার কারণে সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমাকেই সভাপতিত্ব করতে হলো অনুষ্ঠানে। কিন্তু শিগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে করেছিলাম, ততটা সহজ নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বক্তব্য দিতে আগ্রহী অগণিত নেতাকর্মীর মিছিল সামলানো। উঁচু মঞ্চটার সিঁড়িতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকদের কড়া পাহারার কারণে সরাসরি আমাকে অনুরোধ-উপরোধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে লোক মারফত অথবা কাগজের চিরকুটে লিখে অনুরোধ পাঠাতে লাগলেন তারা। কিন্তু একমাত্র আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগ ছাড়া দেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব রাজনৈতিক দলই সম্মিলিত বিরোধী দলের সদস্য; নেতার মিছিল তো অন্তহীন, কজনকে সন্তুষ্ট করা যায়? যেহেতু মিস জিন্নাহ মাইজদী যাচ্ছেন না, তাই জেলা সদরের নেতারাও এসে জড়ো হয়েছেন। তারপর আরও রয়েছেন অন্যান্য মহকুমা ও স্থানীয় নেতা আর ছাত্রনেতারা। যথাসম্ভব সবাইকে সুযোগ দিতে কসুর করলাম না। তবে মনে মনে ঠিক করলাম, বড় এক রুই-কাতলা নেতাকে তার এক সংকীর্ণমনা ভূমিকার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেবো। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বহু ছাত্র কর্মী গ্রেপ্তার হচ্ছিল। তাদের জামিন নেওয়া ও মামলা পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ল সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমার ওপর। ভীষণ চাপের মুখে ছিলাম। ফেনীর মামলাগুলো পরিচালনার জন্য ফেনীর সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ আইনজীবী মকবুল আহমদ সাহেবের সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য দলের নেতারা আমাকে অযথা সময় নষ্ট না করতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কারণ মকবুল আহমদ সাহেব ছিলেন স্থানীয় কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি, আইয়ুববিরোধীদের মামলা তার লড়ার কথা নয়। তা ছাড়া তার ফিও অনেক বেশি। কিন্তু আমিও দমবার পাত্র নই, হাজির হলাম মকবুল সাহেবের কাছে। স্বল্পবাক মকবুল সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। শুধু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তাই নয়, আমাদের অবাক করে দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, এ জন্য আমাকে কোনো ফিও দিতে হবে না। ওরা ছাত্র মানুষ, পয়সা কোথায় পাবে? শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। ভাবলাম, মানবতা এক সর্বজনীন গুণ, রাজনীতির ক্ষুদ্রতায় একে আটকে রাখা যায় না।

কিন্তু বিপদে পড়লাম যখন বেশ কয়েকজনের মামলা ফেনী থেকে নোয়াখালী জেলা আদালতে স্থানান্তর করা হলো। মাইজদীর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ততটা সুসংগঠিত ছিল না। ফলে জেলখানায় বন্দি ছাত্রদের দেখাশোনা ও মামলার তদবির-তদারকের জন্য ফেনী থেকে কয়েকজনকে পাঠাতে হলো। যাওয়ার সময় তাদের আশ্বস্ত করলাম যে মাইজদীতে মামলা পরিচালনায় কোনো অসুবিধাই হবে না। কারণ মাইজদীর সবচেয়ে নামকরা আইনজীবী হলেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মালেক উকিল। তাদের হাতে উকিল সাহেবের জন্য চিঠিও দিয়ে দিলাম। ভাবছিলাম উকিল সাহেব তাদের যাবতীয় আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। কর্মীদের নিজেদেরই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতে হলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, মামলার দিন সকালে তাদের কাছ থেকে জরুরি ফোনকল পেলাম। মালেক উকিল সাহেব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তার ফির ৫০০ টাকা আগে হাতে না পেলে তিনি কোর্টে যাবেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ঠিক আছে অমুক ভাইয়ের (স্থানীয় একজন সহৃদয় ব্যবসায়ী) কাছে যাও। তিনি ধার দেবেন। কোনো রকম আজকের কাজ উদ্ধার করো। উকিল সাহেবের কাছ থেকে এর উপযুক্ত খেসারত যথাসময়ে আদায় করতে হবে।

ফেনী ও মাইজদীর প্রায় সব বিরোধী দলের সারি সারি নেতা-উপনেতারা ইতোমধ্যেই বক্তৃতা করে গেছেন। মালেক উকিল এলেন বিকালবেলায়। এসেই বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চেয়ে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের হাতে স্লিপের পর স্লিপ পাঠাতে থাকলেন। প্রতিটি স্লিপই আমি দুমড়ে ফেলে দিতে লাগলাম। শেষে স্থানীয় ছাত্রলীগ সভাপতি এসে বলল: উকিল সাহেব খুবই রাগ করছেন, আপনি কেন তাকে বক্তৃতা দিতে ডাকছেন না। বললাম, মনে নাই, তুমিই তো মামলা পরিচালনার জন্য মাইজদী গিয়েছিলে। আর ওই দারুণ বিপদের সময় উনি তার ফির টাকা আদায়ের আগে জামিনের আবেদন মুভ করতে অস্বীকার করেছিলেন। যাও, তাকে বলো গিয়ে বক্তৃতা করতে হলে প্রথমে সেই ৫০০ টাকা ফেরত দিতে হবে। উপায় না দেখে উকিল সাহেবকে টাকাটা জোগাড় করতেই হলো। ছাত্রলীগের ভাইটি টাকাটা এনে আমার হাতে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দিলে ঘোষণা দিলাম: এবার বক্তৃতা করবেন নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল।

আর মনে মনে ভাবলাম, এই সংকীর্ণমনাদের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব কোনো দিন এলে কী উপায় হবে জনগণের! মিস জিন্নাহর গাড়ি এলো অনেক দেরিতে। রাত হয়ে যাওয়ায় তিনি ট্রেন থেকে না নেমে কম্পার্টমেন্টের দরজা থেকে মাইকে বক্তৃতা করলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, কী করে এই শীর্ণকায়া বৃদ্ধা কঠিন সফরের ধকল সহ্য করছেন। পথে পথে অগণিত জনসভায় বক্তৃতা করা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরের সেই তীক্ষ্ণ-তীব্র আওয়াজে সামান্য পরিবর্তনও দেখা গেল না।

মাদারে মিল্লাতকে বহনকারী ট্রেনটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফ্রিডম স্পেশাল'। লাখো জনতার উচ্ছ্বাস ও আবেগের বন্যা ভেদ করে গন্তব্যস্থল চট্টগ্রামে ট্রেনটি পৌঁছাল নির্দিষ্ট সময়ের দীর্ঘ বাইশ ঘণ্টা পরে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব সম্ভাব্য সব অপকৌশল ব্যবহার করলেন নির্বাচনে জেতার জন্য। তার পরও ফাতেমা জিন্নাহর বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে শঙ্কিত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট তারিখ থেকে তিন মাস এগিয়ে এনে ২ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ক্ষমতাসীন মিলিটারি ডিক্টেটর রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থের সয়লাব বইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মিস জিন্নাহ গণভোটে জিতেও মৌলিক গণতন্ত্রের পরোক্ষ ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটে সামান্য ব্যবধানে হেরে গেলেন।

ফাতেমা জিন্নাহ ছিলেন তার ভাইয়ের মতোই গণতন্ত্রকামী, নীতির ব্যাপারে আপসহীন, দৃঢ়চেতা নারী। জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর থেকেই পাকিস্তান যে কুটিল প্রাসাদ চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছিল, তার ছিলেন তিনি নির্ভীক সমালোচক। ফলে শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন চক্র তাকে এক বিষফোঁড়ার মতোই বিবেচনা করে আসছিল। স্বাধীনতা দিবসে রেডিও পাকিস্তানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে তাকে দেওয়া হয়নি। কারণ সরকারের শর্ত ছিল তার বক্তৃতা সেন্সর করা ছাড়া প্রচার করা যাবে না। আর মিস জিন্নাহ এই শর্তে ভাষণ দিতে রাজি হলেন না। দুই বছর পর সেন্সর ছাড়া বক্তৃতা প্রচারে রাজি হলে তিনি রেডিও পাকিস্তানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন! কিন্তু বক্তৃতা প্রচারের সময় সরকারের সমালোচনার অংশ এলে হঠাৎ প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই অংশ শেষ হলে পুনর্বার প্রচার শুরু হয়।

রেডিও পাকিস্তানের ডাইরেক্টর জেনারেল জেড. এ বোখারী পরে ক্ষমা চেয়ে মাদারে মিল্লাতকে চিঠি লেখেন। তিনি যান্ত্রিক গোলযোগকে এর জন্য দায়ী করেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ফাতেমা জিন্নাহও দমবার পাত্রী নন, জবাবে তিনি বোখারী সাহেবকে লেখেন:

> It is also a matter of wonderment for me that the very sentences that you requested to omit from the speech were the ones which could not be broadcast due to the technical problem. It seems your transmitters are very obedient and submissive as they are always ready to create technical problems in order to facilitate you.

পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকে যে কুচক্রী মহল শাসনক্ষমতায় জেঁকে বসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সব সময়ই ফাতেমা জিন্নাহ ছিলেন সোচ্চার। অবশ্য এই দুর্দান্ত সাহসিকতার জন্য তাকে দিতে হয়েছিল চরম মূল্য। ভাঁওতাবাজির নির্বাচনে মাদারে মিল্লাতকে হারিয়েও আইয়ুব খানের স্বস্তি আসেনি। এই পথের কাঁটাকে চিরবিদায় করার ষড়যন্ত্র শুরু হলো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অমীমাংসিত ফলাফল, তাসখন্দে স্বাক্ষরিত অপমানজনক শান্তিচুক্তি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পদত্যাগ ইত্যাদি আইয়ুব খানের জন্য পরিস্থিতি ক্রমেই সংকটপূর্ণ করে তুলছিল। ১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই তারিখে মাদারে মিল্লাত মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে নিজের বাসভবনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তার দেহে ছিল রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন। মাত্র তার আগের দিনই মিস জিন্নাহ এক আত্মীয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সবাই সেখানে তাকে হাসিখুশি দেখেছিল। মৃত্যুর পর নিকটাত্মীয়দের অনুরোধ সত্ত্বেও কোনোরূপ পোস্টমর্টেম ছাড়াই কড়া পাহারায় তড়িঘড়ি তাকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেল। এর সঙ্গে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যেরও হয়ে গেল চিরসমাধি।

সেদিনের পাকিস্তান ছিল বাদবাকি তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব প্রতিফলন। বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন মুসলিম জাহানের দেশে একপাল লুটেরার দল জেঁকে বসল ক্ষমতার মসনদে। সাম্রাজ্যবাদীর বিদায় হলো বটে, কিন্তু দেশগুলো হস্তান্তর করে গেল তাদের এ দেশীয় পদসেবীদের কাছে। ফল যা হবার তাই হলো।

মানবতার এই বিরাট মিছিলে মানুষের মুখ হলো আহত-লাঞ্ছিত। শান্তির শত্রুরা পৃথিবীর দিকে দিকে বিভেদের বীজ বুনল— কোথাও ভাষার, কোথাও অঞ্চলের আর কোথাও হীন ব্যক্তিস্বার্থের নামে।

অথচ আশ্চর্য, বাহ্য অবয়বে ওরা কেউ শান্তির শত্রু নয়। দুনিয়ার দহলিজে ওরা শান্তির মহান ধারক। মানবতার মুক্তি ও সমৃদ্ধির পতাকাবাহী। কোটি কোটি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সরল জনতাকে মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়ার নামে কোথাও আর্থিক সচ্ছলতা আবার কোথাও গণঅধিকারের নামে ওরা প্রতারণা করে চলছিল অনবরত।

ওদের নতুন মনিবেরা পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিয়েছে দুই হিস্যায়। একটা উন্নত পৃথিবী আর একটা অনুন্নত দুনিয়া। অনুন্নত কথাটা খারাপ শোনায় বলে ওকে শ্রুতিমধুর করে বলা হয় 'ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড'— উন্নয়নশীল বিশ্ব। পশ্চিমের বনেদি ও আনকোরা সাম্রাজ্যবাদীরাই উন্নত বিশ্বের মালিক-মোক্তার। আর বাদবাকি দুনিয়ার সমস্তটাই অনুন্নত। এদের টেনে-হিঁচড়ে উন্নতির পথে বয়ে আনার দায়িত্বটাও উন্নতওয়ালারাই দয়া করে গ্রহণ করেছেন। এইডের মকরধ্বজ খাইয়ে এদের হাড্ডিসার দেহকাঠামোগুলো স্বাস্থ্য-শ্রীমণ্ডিত করার দায়িত্ব নাকি তাদেরই। এসব 'বিগ পাওয়ারে' কাজ করার জন্য নিয়ে এলো 'এইড' নামের মলম। আর এই এইডের অক্টোপাসের বিরাট 'হা'য়ের মধ্যে এক এক করে টপ টপ করে ঢুকে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার ছোট-বড় অগণ্য-অসংখ্য দেশ আর জাতি। পাকিস্তানও এমনই একটা দেশ।

'এইড' আসে। তার সঙ্গে আসে 'ইকুইপমেন্ট', আসে 'স্পেশালিস্ট'। আর সেই সঙ্গে আসে তাদের ব্যবহারের 'ইউটেনসিলস', জামা-জুতা-মোজা, আন্ডারওয়্যার এমনকি টয়লেট পেপার পর্যন্ত। সব মেইড ইন সেই দাতা বিগ পাওয়ার। বলাবাহুল্য, সবই এইডের টাকায়।

বাদবাকি এইডের টাকায় অনুন্নত দেশটিতে গড়ে ওঠে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীদের নয়নাভিরাম বাসভবন, স্বচ্ছন্দ সড়ক, আধুনিকতম রাজধানী, কেনা হয় নেতা-কর্তাদের জন্য চকচকে রোলস রয়েস, মার্সিডিজ ও লিমুজিনের বহর। এইড-পূর্ব আর এইড-পরবর্তী অনুন্নত দেশটায় সূচিত হয় বিরাট পরিবর্তন। চেহারাই বদলে যায় দেশটার।

সবই বদলায়, শুধু বদলায় না দেশটির সাধারণ মানুষের ভাগ্য। শিক্ষার হার বাড়ে না। সরকারি আদমশুমারির খাতায় বিগ-কর্তাদের তুষ্ট করার জন্য অথবা বিশ্ববিবেককে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিংবা আত্মপ্রতারণার জন্য দেশের শিক্ষার হার বাড়িয়ে দেখানো হয়। সেই সব দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ প্রতিদিন অনাহারে বা অর্ধাহারে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। ছেঁড়া কাঁথায়, মাটির শয্যায় শুয়ে খড়-শূন্য চালের ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা গুনতে গুনতে দরিদ্র জনতা স্বপ্ন দেখে তাদের ভোটে নির্বাচিত জনগণ-মন অধিনায়ক আসবেন।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

আসবেন নিশুতি রাতে ওমর ফারুকের মতো চাল কি আটার বোঝা মাথায় নিয়ে। নিজের হাতে রুটি বানিয়ে তারা ক্ষুধার্ত শিশুদের তুষ্ট না করুন, অন্তত দাঁড়িয়ে থেকে নিরন্নদের খাওয়া তদারক করে আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। কিন্তু একালের পাকিস্তান সমেত অন্য সব উন্নয়নশীল দেশের নব্য-গণতান্ত্রিক নায়কেরা তো আর ওমর ফারুকের সেকেলে আদর্শে বিশ্বাস করেন না। তাই তারা আসেন না। হতভাগা নাগরিকের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ৯০ টাকায় চাল কিনতে কিনতে দরিদ্র ভোটারের অস্পষ্ট মনে পড়ে যায় নির্বাচনের আগে এই সরকারের দলই চালের দাম ৪০ থেকে ২০ টাকায় নামিয়ে আনার ওয়াদা করেছিলেন।

তাই 'এইডের' মলম লাগিয়ে দেশের কোটি কোটি নিরন্ন জনতার পোড়া কপালে জোড়া লাগে না, বরং বাঁধা পড়ে যায় তাদের শেষ সম্বল থালা, ঘটি, বাটি, বর্তন-বাসন সব। এইডের সঙ্গে আসে সুদের পাহাড়। যে সুদ শোধ করার আর কোনো পথ জাতির হাতে বাকি থাকে না। তখন নিজেদের অপদার্থ নেতৃত্ব এবং জাতিকে বন্ধক দেওয়ার অপরাধ গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াসে তারা আত্মজীবনীর শিরোনামা দেন, 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস'। আর তার প্রথম পাতায় জাতীয় কবির সাহসী পঙ্‌ক্তি চুরি করে গলাবাজি করেন:

'আয় তায়েরে লাহুতি
উস্ রিজক সে আতি হ্যায় মউত আচ্ছি
জিস্ রিজক সে আতি হ্যায়
পরওয়াজ মে কোতাহি।'[৬]

'হে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ, সেই রিজিকের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, যে রিজিক (খাদ্য) খেলে সৃষ্টি হয় উড্ডয়নে বাধা।'

কিংবা দম্ভভরে ফাঁকা আওয়াজ করে:

> We shall not accept any conditional loan, we shall throw it back right on their face.

কিন্তু তত দিনে দেশের নদীগুলো দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে যায়। বিহঙ্গের পক্ষ দুটো ততক্ষণ আর মুক্ত থাকে না— ডলার, রুবল বা পাউন্ডের শিকলে বাঁধা পড়ে যায় বহু আগেই। এই অক্ষমের ফাঁকা আওয়াজ বৃহৎ শক্তিদের বৃহত্তর

---

৬. আল্লামা ইকবাল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আত্মজীবনী *Friends Not Masters*-এর প্রথম পাতায় উদ্ধৃত।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কর্ণে কোনো সাড়া জাগায় না। তত দিনে হোয়াইট হাউজ, ক্রেমলিন আর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে পরিকল্পনা চলে অত টাকার সুদাসলের পরিবর্তে দেশটাকে দাসখতে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া যায় কীভাবে। ছেঁড়া কাঁথায় শোয়া গরিব নাগরিক টেরও পায় না যে, তার আবার মনিব পরিবর্তন হলো। আণবিক যুগে যুদ্ধ ও শান্তির পরিভাষায়ও পরিবর্তন এসেছে অনেক। এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী জামানার মতো কেউ আর কারও দেশ কবজা করে না, শুধু অনুগত করে নেয়। তাদের ভাষায় 'to extend their sphere of influence.'

কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই ঋণের চেয়েও সঙ্গিন ব্যাপার রয়েছে। তা হচ্ছে পাকিস্তানের ঘোষিত আদর্শ। যে কারণেই হোক, পাকিস্তানের স্রষ্টা ও নেতারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম গ্রহণ করার প্রেরণা বা প্রবণতা কোনোটাই রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্রে উপস্থিত ছিল না। যে যুগে ইসলামি আদর্শ বিশ্বজোড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, ঠিক তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অক্ষম অনুকারী, ইসলামি চরিত্রবর্জিত একদল লোকের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা ছিল ডুমুরগাছে ফুলের সন্ধানের মতোই মস্ত আহাম্মকি।

স্বাধীনতার পটভূমি ও ফলশ্রুতির একটা সঠিক ও নিরপেক্ষ চিত্র থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানে দেশনেতারা ইসলামি আদর্শের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তার অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা মিলবে। স্বাধীনতার মাত্র ২৫ বছর পরে বিভক্ত পাকিস্তানের খণ্ডিত শবদেহ সামনে নিয়ে অনেকেই ভেবেছেন— কেন এমন হলো? একদিন যে দেশের অস্তিত্ব এমনকি নাম পর্যন্ত ছিল না, শুধু একটা আদর্শের অঙ্গীকারে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো সেই দেশ। কিন্তু কোন অপরাধে সিকি শতাব্দীও টিকল না? সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তো বটেই, পৃথিবীজোড়া মানুষের মনে রেখে গেল এক বিরাট প্রশ্ন। দেড় হাজার বছর আগে যে ইসলাম মানবতার ইতিহাসের সর্বোত্তম কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, কালের চাকার নির্মম আবর্তনে সেই ইসলামই কি আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে অকেজো হয়ে গেল? পৃথিবীর সব মঞ্চ থেকে তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা তারস্বরে ঘোষণা করে চলছে: এখন এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ইসলামের গাঁথুনিতে কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তিপাত এ যুগে একটা অবাস্তব কল্পনা। সাম্প্রদায়িক (ধর্মীয়) উন্মাদনার সাক্ষাৎ সৃষ্টি পাকিস্তানের 'কাট-টু-সাইজের' মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ইসলামের অকার্যকারিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা ও লজ্জাকর পতনের পেছনে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, দেশনেতাদের স্বার্থপরতা, অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ ফিরিয়ে রেখেই এরা আজ এই প্রান্ত প্রচারণায় ঘর্মাক্ত কলেরব। কারণ তারা ভালোভাবেই জানে যে আগামীর পৃথিবী থেকে ইসলামি সমাজের ধারণা চিরদিনের জন্য বিলোপ করে দিতে হলে সবার আগে ইসলামের অনুসারীদের মনে এর অকার্যকারিতার ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা বৈচিত্র্যময় এই উপমহাদেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়। লোকশ্রুতি রয়েছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার বিরাট এই উপমহাদেশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাথি সেলুকাসকে বলেছিলেন: 'বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস।' সত্যিই হিমালয়ের দেয়ালঘেরা সমুদ্র স্তনিত এই ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মেলা। তাই আলেকজান্ডারের আগে ও পরে এই ভূমি প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করেছে ক্ষমতা ও বৈচিত্র্যপ্রেমিক খ্যাতিমান বিশ্বজয়ী বীরপুরুষদের। জুলিয়াস সিজারের মতো তারা এসেছেন, দেখেছেন এবং জয় করেছেন। কিন্তু লুটেরার মতো ফিরে যেতে পারেননি, এই বৈচিত্র্যময় ভূমির আকর্ষণে তারা বাঁধা পড়ে গেছেন চিরদিনের জন্য।

শক, হুন, আর্য ও গ্রিকদের পথ ধরে একদিন এ দেশে এসেছে মুসলমান। মহান ইসলামি আদর্শের বিপুল প্রেরণা ওদের দেহের প্রতি রেণুকণায় জাগিয়ে তুলেছে এক অস্থির প্রাণচাঞ্চল্য। তাই দিগ্বিজয়ী দেশনায়কেরা এসেছেন, কিন্তু তারও আগে এসেছেন হৃদয়জয়ী দাঈ, দরবেশ সুফি-সাধকেরা। তাই দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের নিগড় থেকে বন্দি মানবতাকে মুক্তি দেওয়ার মহান মিশন নিয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে, পরিচিত পৃথিবীর সংকীর্ণ সীমানা ছড়িয়ে ওরা ইসলামের বিজয় পতাকা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণসাগরের উচ্ছল জলধারায়। তারপর সর্বশক্তিমানের দরবারে দুহাত তুলে দোআ করেছিল, 'প্রভু হে, সমুদ্র এসে পথ রোধ না করলে তোমার মহিমার পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি আরও এগিয়ে যেতাম দেশ থেকে দেশান্তরে।'[৭] আল্লাহর দেওয়া মহাবিধানের পতাকা ওদের সব প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল দায়িত্বসচেতনতার এক দুর্বার অনুভূতি। দুহাত তুলে ওরা প্রার্থনা করত: 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' সেই শক্তিও তারা অর্জন করেছিল। সেই শক্তির সর্বপ্লাবী গুণেই বিজয়ী হয়েও

৭. আফ্রিকা-বিজেতা মুসলিম সেনাপতি উকবা ইবন নাফের উক্তি।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তারা ছিল বিনয়ী। প্রবল হয়েও তারা ছিল সরল আর সহানুভূতিপ্রবণ, লাঞ্ছিত মানবতার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাই দেশের পর দেশ জয় করার পরও জুলুম-নির্যাতনের অপবাদে তাদের সুমহান খ্যাতি মুহূর্তের জন্যও কলঙ্কিত হয়নি। অত্যাচারী রাজা-বাদশাহদের শাসনাধীন বিভিন্ন বিজিত দেশের লাঞ্ছিত জনতা তাদের জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ। গ্রানাডা মালাগা দ্বার খুলে তাদের খোশ আমদেদ জানিয়েছে: আহলান-সাহলান, স্বাগত-সুস্বাগত।

কিন্তু সময় স্বভাব বদলায়। চকচকে আনকোরা সমাজকাঠামোতে ধীরে ধীরে জং ধরে। দেশজয়ের নেশা মুসলমানের বহাল থাকলেও আদর্শবোধের মহিমান্বিত চেতনা থেকে তারা বিচ্যুত হচ্ছিল প্রতিদিন। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল এক নয়া সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইসলামের আবির্ভাব, তারই অনুসারীরা আবার নিজেরাই রাজা-বাদশাহ হয়ে জনগণের খোদা হয়ে জেঁকে বসল সর্বত্র।

ভারতবর্ষে ইসলামের সঠিক রূপ যতটুকু এসেছে, তা এসেছে মূলত দরবেশ-আউলিয়া আর বণিক শ্রেণির মাধ্যমেই। রাজা-বাদশাহরা এনেছে ঐশ্বর্য, বিলাস আর পারসিক জৌলুসের অগণিত নগ্ন আয়োজন। হাতে গোনা সামান্য কজন ধার্মিক বাদশাহ ছাড়া দীর্ঘ হাজার বছরের মুসলিম শাসনে বাদবাকি সব কজন শাসকই ছিলেন বিলাসী ও আত্মপূজারি। দীর্ঘ হাজার বছরের শাসন ও আধিপত্যের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ আছে, চুক্তি ও সন্ধি আছে, বিজয় ও পরাজয় আছে। প্রতাপ ও প্রাবল্যের অগণিত কাহিনি আছে, রোমাঞ্চকর অভিযান, বিলাস-সম্ভোগ ও আড়ম্বরের অশ্রুতপূর্ব কাহিনি, শিল্প ও স্থাপত্যকলার সুন্দরতম নিদর্শনসহ কোনো কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু একটিই, তা হলো আদর্শিক জাতি হিসেবে আত্মপরিচয়দানের অভাব। যে আদর্শ চেতনার উত্তাল স্রোতধারা তাদের তাড়িত করে এনেছিল মহাভারতের উপকূলে, স্রোতের জঞ্জালের আবর্তে ডুবে তারা সেই আদর্শ চেতনাই বিস্মৃত হয়ে বসেছিল। ফলে হাজার বছরে একবারও ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার দায়িত্বানুভূতি তাদের মনে জাগেনি। উল্টো রাজ্য রক্ষা করে মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার আদিম নেশায় বুঁদ হয়ে তারা নিজেরাও ইসলামকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক জগাখিচুড়ি দ্বীনে ইলাহি প্রতিষ্ঠার ধৃষ্টতা দেখাতেও পিছপা হয়নি। আমার এক বন্ধুর মুখে এক গল্প শুনেছি, শেখ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফেসানি নাকি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বাদশাহি ব্যবস্থা খতম করে খেলাফত কায়েম করার আহ্বান জানান। বাদশাহ জিজ্ঞেস

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করেন: খেলাফত কায়েম করলে আমি খলিফা হতে পারব কী? জবাবে মুজাদ্দিদে আলফেসানি বলেন, খলিফা তো হবে সে, যে সবচেয়ে খোদাভীরু, সৎকর্মশীল ও শাসনক্ষমতায় যোগ্যতম। জবাব শুনে জাহাঙ্গীর বললেন: আপনি কি মনে করেন আমার বাপ-দাদা বহু পরিশ্রমে যে বিপুল সাম্রাজ্যের বাগডোর হস্তগত করেছেন, তা বোকার মতো একজন মোল্লার হাতে আমি ছেড়ে দেবো? রসিক বন্ধুটি হেসে আরও বললেন: বাগডোর অবশ্য এখনো মুঘলদের হাতেই রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: সে কেমন করে? উচ্ছল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বন্ধুটি বললেন: হ্যাঁ ঠিকই আছে, তবে সাম্রাজ্যের নয় ঘোড়ার, আজকের দিল্লিতে বেশির ভাগ টাঙ্গাওয়ালাই মুঘল। খুব হাসি পেল। ভাবলাম, মালিকুল মুলকের এক সাক্ষাৎ পরিহাস বটে। হায় জাহাঙ্গীর! ফিরে তাকানোর মূল প্রাপ্তি হলো, এটা অতীতের আলোয় বর্তমানের আঁধার চিরে পথ বের করে নিতে সহায়ক হয়। যাক, অতীতচারণ যথেষ্ট হলো, আবার ফিরে যাই ফেনীতে।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

সতেরো

দুই বছর কলেজজীবন পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠের পালা সাঙ্গ হলো। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য কোন পথ নেব— এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। পরীক্ষা শেষে অবসর দিনগুলোতে জ্যোৎস্নাময় দেব তার ঘরে যেতে বললেন। জ্যোৎস্না বাবু আমার কাজের সেরকম মূল্য দিতেন তা আগেই বলেছি। খুশি হয়ে তার আমন্ত্রণ কবুল করলাম। মাস্টারপাড়ায় তার ঘরে হাজির হয়ে দেখি তিনি কলের গানে রবীন্দ্রসংগীত শুনছেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পরই স্যার জানতে চাইলেন: পরবর্তী পড়াশোনার ব্যাপারে আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে আমি জবাব দিলাম, ফেনীতেই বি. এ.-তে ভর্তি হয়ে যাব। আকাশ থেকে পড়লেন যেন জ্যোৎস্না বাবু। বললেন, তিনি এটা মোটেই অনুমোদন করেন না। আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সে ভর্তি হতে উৎসাহ জোগালেন। বেশ চাপ দিয়ে বললেন, বাংলায় আমার দখলটা নষ্ট না হয়ে আরও বিকশিত হোক, এটা তার একান্ত ইচ্ছা। শ্রদ্ধাজড়িত আবেগে ভরা মন নিয়ে বিদায় নিলাম স্যারের কাছ থেকে। ভাবতে কষ্ট হলো যে তার এই শুভধারণা ও স্নেহের প্রকৃত মূল্যায়ন করার উপায় আমার নেই। আর্থিক কারণে ঢাকায় বিদ্যার্জন তখন আমার জন্য অনেকটা অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া আর একটা বড় কারণ হলো আমার আদর্শিক বা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নতুন মোড়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তার নায়ক। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রাথমিক আকর্ষণ ছিল আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ বলয়ের দিকে। তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্রবন্ধুদের উদ্যোগ-উৎসাহে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য কিছু পড়াশোনা করেছি। সামাজিক সুবিচারের প্রস্তাবনার কারণে সমাজতন্ত্রী আদর্শের আকর্ষণটা নেহাত কম ছিল না। কিন্তু আস্তিকতাকে পুরোপুরি বর্জন করে যে সমাজের আহ্বান, তাকে সাগ্রহে কবুল করার মনোবৃত্তিও আমার ছিল না। তা ছাড়া গণমানুষের কল্যাণের নাম ভাঙিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রধান দুই মডেল রাশিয়া ও চীনে যে কঠোর যান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব জনগণকে নিষ্পেষিত করছিল, তাও চোখের সামনেই জ্বলজ্বল করে ভাসছিল। তাই প্রাথমিক আকর্ষণের রাজনীতিতেই স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারণ করতে যাচ্ছি, এমন সময় মুখোমুখি হলাম নতুন এক প্রস্তাবের। আর তা হলো, আস্তিকতাবোধ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অক্ষুণ্ন রেখে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে। প্রথম প্রথম এই আহ্বানকে তেমন একটা আমল দিইনি। স্বভাবগত উন্নাসিকতায় বন্ধুবান্ধবের আহ্বান উপেক্ষা করেছি।

ওদের দেওয়া বইপত্র খুলে দেখার যোগ্যও মনে করিনি। নজর না বুলিয়েই ফেরত দিয়েছি যখন তারা ফেরত চেয়েছে।

একবার তারা ধরে বসল তাদের এক সাধারণ সভায় যাওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম থেকে তাদের এক নেতা আসছেন। খুব নাকি ভালো বক্তা— হোসাইন খান, ভক্সওয়াগন কোম্পানির পূর্ব পাকিস্তানের ম্যানেজার।

যথাসময়ে উপস্থিত হলাম অনেকটা অনিশ্চিত মনে। কিন্তু কথা দিয়ে তার খেলাপ করাটা ছিল আমার স্বভাববিরুদ্ধ। উপস্থিতি দেখেই বুঝলাম বক্তার খ্যাতির সুনামটা বোধকরি যথার্থই হবে। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সুদর্শন ভদ্রলোক। লালচে ফরসা চেহারার ওপর সুবিন্যস্ত দাড়িতে চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানি, কিন্তু বক্তৃতা করলেন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বাংলায়। প্রাঞ্জল যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন কেমন করে পাশ্চাত্য-পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দুটোই মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

অপরদিকে ইসলাম কীভাবে একটা বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি পেশ করতে পারে, যা সত্যিকারের সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আমাদের দেশে ইসলাম শুধু আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মমাত্র। ধর্মীয় বক্তৃতা, খুতবা, ওয়াজে ভুলক্রমেও কেউ কখনো ইসলামি অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার আলোচনা করেন না। ধর্মীয় পুস্তকে, কিতাবে এ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। সুতরাং হোসাইন খানের পুরো বিষয়বস্তুটাতেই ছিল এক সম্পূর্ণ আনকোরা নতুনত্বের আভাস।

অবশ্য আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় কোনো রকম জায়গা করে নেওয়ার একটা মনগড়া প্রয়াস বলে একে প্রত্যাখ্যান করা যেত সহজেই। যদি না হোসাইন খান কোরআন, হাদিসসহ ইসলামের মুল বিধানগুলো থেকে অগণিত উদ্ধৃতি দিয়ে তার বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করতেন। প্রশ্নোত্তরে আমিও প্রশ্ন করলাম, তিনি যথাসম্ভব বিস্তারিত জবাব দিলেন। তবু পুরো একমত হইনি দেখে তার সঙ্গে পরে খাওয়ার দাওয়াতে শরিক হয়ে বাদবাকি আলোচনা শেষ করতে অনুরোধ করলেন। সেখানেও দীর্ঘ আলোচনা হলো। ফিরলাম অনেকটা অনিশ্চয়তায় ভরা মন নিয়ে। একটা বিষয় পরিষ্কার হলো, জীবনটা

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

শুধু আমার ইতোপূর্বে জানা দুই মেরুতেই বিভক্ত নয়, এর দাবিদার আরও মেরুর অস্তিত্ব আছে।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রভাবও খুব দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ফেনায় ঢাকা পুকুরে ঢিল ছুড়লে ফেনার পর্দা ভেঙে মুহূর্তের জন্য ভেসে ওঠে পরিষ্কার পানি। কিন্তু ঢিলের প্রভাব কাটতেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সরে যাওয়া ফেনা দ্রুত ফিরে এসে ঢেকে ফেলে পানিটা। আমারও অবস্থা হলো অনেকটা তেমনই। শিগ্গিরই ইসলামি সমাজ-ধারণার রেশটুকুও তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল তলে। হোসাইন খানের কথামতো স্থানীয় ছাত্রসংঘের বন্ধুদের দেওয়া বই-পুস্তক আগের মতোই রয়ে গেল অনাদৃত-অনুন্মুক্ত।

মনের দুয়ারের চাবিটা যার হাতে, তিনিই নির্বাচন করেন সেই দুয়ার খোলার সঠিক সময়। সেই সময় এলো শিগ্গিরই। কলেজ ছুটি। তাই গ্রামের বাড়িতে থাকছিলাম তখন। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর সৈয়দ শফিউল্লাহ খবর দিলো সে দাগনভূঞায় আসবে স্থানীয় মাদরাসায় একটা সভায় বক্তৃতা করার জন্য। আমার সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছা প্রকাশ করল। শেষের দিকে সভায় গিয়ে হাজির হলাম। প্রশ্নোত্তর শেষে শফিউল্লাহ আরও একটা সাংগঠনিক বৈঠকে আটকে পড়ল। সব যখন শেষ হলো, তখন রাত প্রায় ৮টা। শফিউল্লাহ ফেনী ফিরে যেতে চাইল, আমি দিলাম না। বাড়িতে নিয়ে গেলাম তাকে। খাওয়া শেষে বৈঠকখানায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ফুলের মালা শোভিত বিশাল ছবিটা দেখিয়ে শফিউল্লাহ অনুযোগ করল: এসব কী চৌধুরী সাহেব? বললাম: এ দেশে নেতা থাকলে তো এই একজনই ছিলেন। এই সম্মান তিনি অর্জন করেছেন দেশ ও জাতির সেবায় তার অসামান্য অবদানের দ্বারা। মাথা নেড়ে শফিউল্লাহ বলল, কিন্তু এটা তো শুধু সম্মান নয়, এটা তো প্রায় মূর্তিপূজার শামিল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ইসলামপন্থিদের সংকীর্ণতা, হীনম্মন্যতা এবং সবকিছুতেই ধর্মকে টেনে আনার প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে একগাদা বিষোদ্গার করলাম। বেচারা শফিউল্লাহ কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাকে কোনো সুযোগ না দিয়েই শুরু করলাম বিস্ফোরণের দ্বিতীয় পর্ব। বললাম: মানবতা আজ অগণিত সমস্যার মুখোমুখি, অগণিত অভুক্ত, নিরন্ন মানুষ প্রতি রাতে খালি পেটে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ছে। অন্নই শুধু নয়, দুনিয়াজোড়া গরিব মানুষ, আরও ভুগছে বস্ত্রের অভাবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাথা গোঁজার জন্য মাথার ওপরে এক টুকরো চাল পর্যন্ত নেই অনেকের। দুনিয়াজোড়া চলছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রচণ্ড অভাব। সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে, অথচ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। খুব

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

শিগ্‌গিরই এত মানুষের স্থান সংকুলানও হবে না এই পৃথিবীর বুকে। তোমরা মোল্লারা তো শুধু আছ তসবিহ-তাহলিল নিয়ে। আছে এসব সমস্যার কোনো উত্তর তোমাদের কাছে?

কাঁচুমাচু মুখে সৈয়দ শফিউল্লাহ বলল, দেখুন চৌধুরী, আপনার অত সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি তো দিতে পারব না, তবে আমার কাছে 'চিন্তাধারা' নামের একটা সেমিনারের বক্তৃতা সংকলন আছে, ওর একটা প্রবন্ধে আপনার এসব প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে পেয়ে যাবেন।[৮] দেবো আপনাকে পত্রিকাটা? অনেকটা অবজ্ঞাভরে জানতে চাইলাম, এক প্রবন্ধে সব সমস্যার সমাধান? এ তো রাস্তার ফেরিওয়ালা ডাক্তারদের সর্বরোগের মহৌষধ বিক্রির মতো দাবি। তবু যা হোক, দাও দেখি পত্রিকাটা। শফিউল্লাহ বলল, দিলে কী হবে, আপনি তো আগের মতোই না পড়ে ফেরত দেবেন। কোনো জবাব না দিয়ে সংকলনটা হাতে নিয়ে আসার পরে শোয়ারঘরের দিকে চলে গেলাম।

আমার পড়ার টেবিলে হারিকেনের আলোয় শফিউল্লাহর দেখানো প্রবন্ধটা খুললাম। শিরোনাম: বিশ্ব সমস্যা ও ইসলাম। লেখক মাওলানা আবদুর রহীম। অনেকটা সন্দেহভরা অনাগ্রহে পড়তে শুরু করলাম। ভাবখানা মাওলানা মানুষ, কীই-বা বুঝে বিশ্ব সমস্যার! কিন্তু প্রবন্ধটা খুলে পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে গেলাম। রাত বেড়ে চলছিল, চোখ ভেঙে আসছিল ঘুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়া ছাড়া কোনোমতেই ম্যাগাজিনটা বন্ধ করতে পারলাম না। শুরু করার আগে যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিলাম, তার দরুন লজ্জা হলো। মাওলানা তো মাওলানা, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপকও এমন তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক রচনা পেশ করতে পারবেন বলে মনে হলো না। বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে যেসব জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে নেতা-উপনেতা ও বিশেষজ্ঞরা হিমশিম খাচ্ছেন, সেগুলোর এমন যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য জবাব তিনি দিয়ে দিয়েছেন, ভাবতেও অবাক হতে হয়। আধুনিক হতাশাবাদী বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী যে আমাদের পৃথিবীর সম্পদভান্ডার দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে, তা তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব মহলে বহুকাল ধরে দুশ্চিতার অন্ত নাই যে, পৃথিবীতে ফসিল জ্বালানি (fossil fuel) দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদ, দ্রুত বাড়ছে জনসংখ্যা, অন্যদিকে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য স্থান ক্রমেই সংকীর্ণ হচ্ছে। মাওলানা

৮. *চিন্তাধারা সেমিনার সংকলন* (১৯৬২), সম্পাদক: শাহ্ আবদুল হান্নান।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আবদুর রহীম জবাবে বলেছেন, পৃথিবীতে মানব বসতির সূচনামুহূর্ত থেকে প্রয়োজন অনুপাতে আবিষ্কার হয়েছে একের পরে অন্য জ্বালানির উৎস। অথচ নতুন উৎস আবিষ্কারের পরেও আগের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়নি। এমনিভাবে জ্বালানি কাঠের পর কয়লা, তারপর গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোল, বিদ্যুৎ, আণবিক ও নবায়নযোগ্য অগণিত জ্বালানির উৎস। আমাদের দুনিয়ার বিপুল পরিসরের অর্ধাংশেরও কম অংশ মানব বসতি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আর বাদবাকি অংশ রয়ে গেছে জনমানবশূন্য এবং অনাবাদি। পৃথিবীর উৎপাদিত খাদ্যশস্যের সমতাপূর্ণ বিতরণ হলে মানুষের মনগড়া রাষ্ট্রসীমানা অগ্রাহ্য করে মানুষ ও সম্পদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করলে হতাশাবাদীদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে এই পৃথিবীতে আশার আলো জ্বালানো সম্ভব।

এতকাল পরে মাওলানার বক্তব্য পুরোপুরি পুনর্বর্ণনা করতে পারলাম কি না জানি না। পড়া শেষ করে অবাক বিস্ময়ে চোখ বুজে থাকলাম অনেকক্ষণ। যথার্থ বুঝলাম, সংকীর্ণ আল্লাহর জমিন বা তার দেওয়া সম্পদ নয়, বরং সংকীর্ণ স্বার্থপর মানুষের মন। ফজরের আগে বাকি কয়টা প্রবন্ধও পড়ে শেষ করলাম।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, মাওলানার সাথে পরবর্তীতে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। সাধারণত তাঁর বই ছাপা হতো সদরঘাটে অবস্থিত ওরিয়েন্টাল প্রেসে। সেখানে সে সময় সাপ্তাহিক *জাহানে নও*-ও ছাপানো হতো। একদিন কথা হচ্ছে প্রেসের ম্যানেজার গোলাম রব্বানী সাহেবের সাথে। মাওলানার একটি বই, খুব সম্ভবত *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, ছাপানোর জন্যে প্রায় প্রস্তুত। আমি এক নজর দেখে বললাম, এখানে একটি শব্দ পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। যতদূর মনে পড়ছে, মাওলানা বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, 'ইসলাম সর্বপ্লাবী, ইসলাম সর্বনাশী।' ম্যানেজার বললেন, এ তো সর্বনাশ, সমস্ত প্লেট রেডি হয়ে আছে, আপনি এখন সংশোধনী দিলে আমার গোটা আয়োজনই ভেস্তে যাবে। বললাম, তা হলে হোক, মাওলানাকে বলুন যে আমি সংশোধনী প্রস্তাব করছি। নিরুপায় ম্যানেজার সাহেব ফোন করে ঘটনা খুলে বললেন। মাওলানা আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। বললাম, 'সর্বনাশী' তো সাধারণত নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করতে দেখি। যেহেতু ইতিবাচক অর্থে এটার ব্যবহার প্রচলিত নয়, ভালো হয় যদি এটা বাদ দেন বা পরিবর্তন করেন। মাওলানা কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে একমত হলেন। ম্যানেজার সাহেব-কে বলে দিলেন, চৌধুরী কোনো সংশোধনী আনলে আর কথা নেই।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নাশতা খেতে খেতে বন্ধু শফিউল্লাহ জানতে চাইল প্রবন্ধটা পড়েছি কি না। বললাম, শুধু সেই একটা প্রবন্ধই নয়, বাদবাকিগুলোও পড়ে শেষ করেছি। তাকে অনুরোধ করলাম এ রকম আরও প্রবন্ধ বা বই থাকলে যেন আমাকে দেয়। সে বলল, আগেও তো কত বই দিয়েছি, আপনি তো পড়েননি।

বললাম, এখন পড়ব।

সেই থেকে শুরু হলো পড়া। যেসব বই এত দিন অবজ্ঞায় না হলেও অনুৎসাহে, অনাদরে পড়ার টেবিলে বা বালিশের নিচে ফেলে রেখে পরে ফেরত দিয়েছি, সেগুলো এখন বিপুল আগ্রহে নিতে শুরু করলাম আর গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পাঠ্যসূচিবহির্ভূত এই নতুন পাঠের চাপে অবহেলিত পড়ে রইল কলেজের পাঠ্যসূচির পাঠ। এমনকি ক্লাসে বসেও অধ্যাপকদের বক্তৃতায় মনোনিবেশ না করে পড়তাম এসব বই। মনে আছে, একদিন ক্লাসে ধরা পড়ে গেলাম। আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে একটা বই পড়ছি। শিক্ষক মহোদয় আমাকে কিছু একটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু নির্লিপ্ত আমি তখনো অধ্যয়নে রত। সহপাঠীরা হেসে উঠলে বুঝলাম ব্যাপারটা আমাকে নিয়েই। স্যার জিজ্ঞেস করলেন: কী বই পড়ছ এত মনোযোগ দিয়ে? বললাম: বইটার নাম *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*। তিনি লেখকের নাম জানতে চাইলেন। বললাম, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। নেহাত তাচ্ছিল্যভরে তিনি বললেন: হু! মাওলানা মানুষ আবার অর্থনীতির কী জানবেন! আচ্ছা বলো তো, কী বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি? বললাম: 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, স্যার'। তিনি জানতে চাইলেন: দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আমি কী জানি। গড়গড় করে পুরো সংজ্ঞাটা শুনিয়ে দিলাম। অবাক বিস্ময়ে শিক্ষক মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন, এত সব তুমি জানলে কী করে? বললাম, এই বইতে পড়েছি স্যার। একরকম অপ্রস্তুত লজ্জায় তিনি বললেন, দাও দেখি বইটা আমাকে।

ইতোমধ্যে যোগ দিয়েছি ইসলামী ছাত্রসংঘে। আর সে তো শুধু যোগ দেওয়া নয়, বাঁধভাঙা স্রোতের মতো শুরু হলো সেই অবিশ্রান্ত পথযাত্রা। সভায়, মাহফিলে, কর্মী বৈঠকে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আর দোর থেকে দোরে দাওয়াতি পথপরিক্রমায় কাটতে লাগল কর্মমুখর মুহূর্তগুলো। ঘরে ফিরেও পাঠ্যবইয়ের বদলে কোরআন, হাদিস ও ইসলামি বই-পুস্তক পাঠে কাটতে লাগল বাকি সময়। কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল আমাকে। ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া কমতে লাগল। আব্বা ও বড়দার সঙ্গে পত্রযোগাযোগ কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। ব্যাপারটা এত দূর গড়াল

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যে নিয়মিত চিঠি না লিখলে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ার ধমক দিলেন বড়দা।

শিগ্‌গিরই কলেজে নতুন সেশন শুরু হলো, আর তার সঙ্গে শুরু হলো প্রথম বর্ষের নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ-অভিনন্দনের পালা। সব ছাত্র সংগঠনই এ সময় প্রকাশ করে আকর্ষণীয় প্রচারপত্র। আমার বাংলা লেখার যশের কারণে ছাত্রসংঘ আমাকে তাদের প্রচারপত্র লেখার অনুরোধ করল। লিখে দিলাম একটা দীর্ঘ অভিনন্দনপত্র, 'ফেনী মহাবিদ্যালয়ের মহাঙ্গনে নবাগত ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা, খোশ আমদেদ।' প্রচারপত্রে আহ্বান জানালাম তাদের জীবনপথের এই নবযাত্রামুহূর্তে নিজেদের স্বকীয়তার ওপর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার সংকল্প নিতে। বস্তুবাদের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহজীব-তমদ্দুনকে ভলগা কি গঙ্গা, টেমস কি মিসিসিপিতে ভাসিয়ে না দিতে। মন নাড়া দেওয়ার উপযোগী আবেগাপ্লুত ভাষায় রচিত প্রচারপত্রটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার, আর বিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করল প্রচণ্ড গাত্রদাহ। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে ছাত্রসংঘের কজন কর্মী লিফলেটটা বিলি করছিল। ছাত্রলীগের একদল কর্মী হামলা করে তাদের হাত থেকে লিফলেটের পুরো বান্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। এ সময় নিচ থেকে ওপরে উঠছিলেন অধ্যাপক জ্যোৎস্নাময় দেব। তিনি ছাত্রলীগের ছেলেদের বললেন, 'ছিঁড়ছ কেন? বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ো, বাংলা শিখতে পারবে।' জ্যোৎস্না বাবু নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে লিফলেটটা পড়ে ফেলেছিলেন এবং রচনা দেখে বুঝেছিলেন যে এটা আমার লেখা। আমি তখন সিঁড়ির ওপরে দোতলার বারান্দায় কথা বলছিলাম ছাত্রদের সঙ্গে। ছাত্রলীগের কর্মীদের সর্দারটা ছিল আমার বন্ধু। সে-ই দৌড়ে এসে আমাকে খবরটা দিয়ে বলল, 'কী লিখেছিস এই লিফলেটে? জ্যোৎস্না বাবু আমাদের এই বলে তিরস্কার করলেন?' আবারও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল এই উদারমনা, ভাষাপ্রেমিক শিক্ষকের প্রতি।

ছাত্রসংঘের কাজে ক্রমেই জড়িয়ে পড়লাম গভীরভাবে। ধাপের পরে ধাপ অতিক্রম করে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলাম। এ সময় ফেনী শাখার তৎকালীন সভাপতি আবদুল হাকিম ভাই পারিবারিক কারণে পদত্যাগ করলেন। নতুন নির্বাচনে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়ে কর্মীরা আমাকেই সভাপতি নির্বাচন করলেন। আমার চোখের পানি, অনুনয়, অনুযোগ কোনো কাজে এলো না, দায়িত্ব অপরিবর্তিতই রইল। শঙ্কিত-অপ্রস্তুত আমি একরকম বাধ্য হয়েই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলাম— প্রার্থনা করলাম: 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।'

আমার অনুপযুক্ততার ব্যাপারটা প্রাদেশিক সভাপতি এ কে এম নাজির আহমদ ভাইয়ের কাছে লিখে জানালাম। জবাব এলো সুন্দর টানা হস্তাক্ষরে চমৎকার চিঠি। তিনি লিখলেন, এই শক্তি আহরণের একমাত্র উপায় হলো আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন। রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর দরবারে আরাধনা। ঠিক যেমন করে মানবজাতির নেতা মুহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ সা.-কে আহ্বান জানিয়েছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন। 'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি! রাত জাগো, কিছু অংশ অথবা অর্ধেক রাত অথবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা একটু বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি করো ধীর-স্পষ্ট স্বরে। নিশ্চয়ই আমরা তোমার ওপর অর্পণ করেছি এক গুরুভার বাণীর বোঝা।' (সূরা ৭৩ : ১-৫)

সুতরাং, রাত জাগতে শুরু করলাম। রাত জাগাটা অবশ্য এই সংগঠনের কর্মপদ্ধতির অপরিহার্য অংশ। মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হতো যৌথ রাত্রি জাগরণের অনুষ্ঠান। সংগঠনের পরিভাষায়— শববেদারি বা কিয়ামুল লাইল। স্থানীয় কোনো এক মসজিদে সন্ধ্যার পর সবাই জমা হতো। তারপর নামাজ, কোরআনের দারস (আলোচনা) বা শুদ্ধ করে তিলাওয়াতের প্রশিক্ষণ, আধ্যাত্মিক উন্নয়নের আলোচনা এবং তাহাজ্জুদে কাটত রাতের প্রহরগুলো। অবশ্য মাঝরাতে কিছু সময় ঘুমাবার জন্যও মিলত। ফজরের নামাজের পর ঘরে ফিরত সবাই। রাত জেগে ইবাদতে মশগুল কঠিন তাকওয়া সাধনার মুহূর্তগুলোই যুবকদের চরিত্রে এনে দিত প্রবৃত্তিকে দমন করে মানুষ হয়ে ওঠার এক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা।

আর ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম আমার ইসলামি জ্ঞানের দৈন্য ঘোচাবার জন্য ব্যাপক অধ্যয়ন কর্মসূচি।

দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর যে জিনিসটা গ্রহণ করতে পারছিলাম না, সেটা হলো ছাত্রসংগঠন হিসেবে ইসলামী ছাত্রসংঘের যথোপযুক্ত স্বীকৃতির অভাব। ছাত্রসংঘের সভা-বৈঠক হতো শহরের কোনো দোকানের খালি কোনো কামরায় অথবা আলিয়া মাদরাসায়। অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের মতো কলেজে সভা অনুষ্ঠানের কল্পনা করতেও সাহস হতো না যেন। এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। কর্মীসভায় প্রস্তাব করলাম, এখন থেকে সভা-বৈঠক কলেজেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। প্রস্তাবটা বিশেষ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করে অভিজ্ঞ পুরাতন কর্মী ভাইদের খুব একটা মনঃপূত হলো না। তারা মনে করলেন, বিরোধীরা আমাদের কোনোমতেই কলেজে সভা-জমায়েত করতে দেবে না। নতুনরা আমার সঙ্গে একমত হলো, নিজেদের সংগত অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে রাজি হলো না তারা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো সভা এবার থেকে কলেজেই হবে। পরের সপ্তাহেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলাম। কেউ বাধা দিল না, তবে তামাশা দেখতে এলো অনেকেই। কলেজে ইসলামী ছাত্রসংঘের অবস্থান স্বীকৃত হয়ে গেল।

স্বাভাবিক কারণেই সংগঠনের প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অসম্পূর্ণ। রক্ষণশীল কাঠামোর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এর গতি ছিল সতর্ক মন্থর। সংগঠনের বক্তব্যের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এর নথিভুক্ত জনশক্তির অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা আমি কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। জনশক্তির সাংগঠনিক স্তর ছিল তিনটি— পূর্ণ সদস্য (রোকন), সাথি (সাধারণ সদস্য বা রফিক) এবং সমর্থক। প্রতি স্তরের জন্য ছিল নির্ধারিত মান, পাঠ্যসূচি এবং আবেদনপত্র। পূর্ণ সদস্যের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমাদের শাখায় একজনও ছিল না। কিন্তু সাথি স্তরে কেন সংখ্যা বাড়ানো যাবে না, এটা আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এই স্তরের আবেদনপত্রও প্রাদেশিক অফিস থেকে আনতে হতো। কোনো একসময় একসঙ্গে দুই কি তিনটার বেশি ফরম থাকত না। ফরম চেয়ে ঢাকায় চিঠি লিখলাম, তিনটা ফরম এলো। বিরক্ত হয়ে আবারও লিখলাম, এবার পেলাম পাঁচটা, সঙ্গে হেদায়াত— কেন এই স্তরে ভর্তি করতে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন।

মিছিলটা যখন আল্লাহর পথে, তখন আল্লাহর পথে আগ্রহীদের অংশগ্রহণের পথে এত বাধা, এত প্রতিবন্ধকতা মেনে নিতে পারলাম না। ভাবলাম, ভর্তি ফরমটা তো এক টুকরা ছাপানো কাগজ ছাড়া কিছু নয়। এটা সরবরাহ করতে প্রাদেশিক অফিসের এত কার্পণ্য আর অক্ষমতা থাকলে ফেনীতেই আমরা ছেপে নেব। দাওয়াখানা প্রেসের মালিকের ছেলে আবদুল হক আমার সহপাঠী, তার কাছে ৫০০ ফরম ছাপার অর্ডার দিয়ে দিলাম। ফরম পেয়ে কর্মীরা তো মহাখুশি। কয়েক দিনের মধ্যে ১৫০টির মতো ফরম পূরণ করে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলাম। স্বভাবতই একরকম সাহস ও শঙ্কার দোলায় মনটা দুলছিল। অবশেষে জবাব পেলাম নাজির ভাইয়ের আর একটা সুদীর্ঘ চিঠি। আমার নির্বোধ হঠকারিতার জন্য যথাযোগ্য তিরষ্কারসহ ছাত্রসংঘের অনুসৃত ক্যাডার সিস্টেমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এই ব্যবস্থায় 'কোয়ান্টিটি' নয়; বরং 'কোয়ালিটিটাই' অধিকতর মূল্য

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেওয়া হয়। তিনি জানালেন, পূরণ করা দেড় শ ফরম আপাতত প্রাদেশিক দপ্তরে জমা (বাজেয়াপ্ত) থাকবে। অব্যবহৃত বাদবাকি ফরমও যেন ফেরত ডাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিই ইত্যাদি। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার খাতিরে মেনে নিলাম, কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে নয়। রোকন বা পূর্ণ সদস্য হতে না হয় গুণ বিচারের কঠোরতা পুরোপুরি প্রয়োগ করা হলো, কিন্তু দুয়ারে অর্গল লাগিয়ে খোদার পথের সাথি হতে যদি না দেওয়া হয়, তাহলে 'গুণ' অর্জন তারা করবে কেমন করে?

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আঠারো

গোটা ফেনীতে বিশেষ করে কলেজে নতুন উৎসাহের যে ঢল নেমেছে, এসব ছোটখাটো দু-একটা বাধার প্রাচীরে তা আটকে থাকল না। জনশক্তির শুমারি তো নেই, তবু সভা-মিছিলের উপস্থিতি ও সাধারণ যোগাযোগে উৎসাহ ও উদ্দীপনার ঢেউ দেখে সহজেই অনুমান করলাম যে ইসলামী ছাত্রসংঘ এখন কলেজের বৃহত্তম ছাত্রদল। কিছুদিনের মধ্যেই ফেনী কলেজ ছাত্র মজলিশ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হলো। আমাদের কর্মী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে ছাত্রসংঘ প্রতিযোগিতা করবে। যথারীতি প্রাদেশিক অফিসে খবর পাঠালাম। তারা মেনে নিলেন, তবে সতর্ক করে দিলেন সম্ভাব্য আশঙ্কা ইত্যাদি সম্পর্কে। শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। সভা-বৈঠক, ছাত্র সংযোগে কাটছিল কর্মমুখর দিনগুলো। আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারায় প্রথমেই এলো মনোনয়নের প্রশ্ন। সংগঠনের ভেতরের ও বাইরের বহু বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকেই সহসভাপতি পদে দাঁড়াবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। আবার এমন অনেকেও ছিল, যারা ভেতরে ভেতরে কানঘুষা করছিল যে নির্বাচনে আসার আসল কারণ যে আমি সহসভাপতি হতে চাই। অবশ্য আমার চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্বাচন ও মনোনয়ন নিয়ে বিভ্রান্তি ও মতবিরোধের ব্যাপারটা প্রথমেই শেষ করার জন্য একটা বর্ধিত কর্মীসভা আহ্বান করলাম আমাদের তখনকার সওদাগরপট্টির অফিসে। কর্মীদের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। কোরআন তিলাওয়াত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সভা শুরু হলে আমার উদ্বোধনী বক্তব্যে বললাম, আমি কোনো পদেই মনোনয়ন নেব না, শাখা সভাপতি হিসেবে ইসলামী ছাত্রসংঘের প্যানেলকে বিজয়ের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই আমার প্রধান ভূমিকা হবে। মনোনয়ন দেওয়ার মতো যোগ্য প্রার্থী আমাদের আরও অনেক আছে। ব্যস, সব উত্তেজনা মুহূর্তে চুপসে গেল। তবে অতি উৎসাহী সমর্থকেরা আশাহত হলো দারুণভাবে।

সহসভাপতির গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনয়ন দিলাম সংগ্রামী ছাত্রনেতা সৈয়দ শফিউল্লাহকে। মনোনয়নটা পেল প্রায় সর্বজনীন সমর্থন। বিপুল উৎসাহে শুরু হলো নির্বাচনি প্রচারণা। পোস্টারে, লিফলেটে ছেয়ে গেল সারা ক্যাম্পাস। কলেজের প্রচলিত নিয়মে প্রতিটি দলের জন্য দেওয়া হতো পুরো এক দিনের প্রোজেকশন মিটিংয়ের সুবিধা। কলেজের সমস্ত ক্লাস পুরো দিন বন্ধ থাকত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এবং কলেজের সবচেয়ে বড় হলে অনুষ্ঠিত হতো প্রোজেকশন মিটিং। সভাপতিত্ব করতেন নির্বাচন কমিশনার। সাধারণত কলেজের প্রবীণতম অধ্যাপক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান এস এন হক এ দায়িত্ব পালন করতেন। আমাদের জন্য নির্ধারিত দিনে যথারীতি সমস্ত ছাত্রছাত্রী জমায়েত হলো বাণিজ্য বিভাগের বৃহৎ মিলনায়তনে। এস এন হক স্যার সভাপতির আসনে বসে আমাকে সভা পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন।

কোরআন তিলাওয়াতের পর নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে তার উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানালাম। তারপর আমার বক্তৃতা। ইসলামী ছাত্রসংঘের পরিচিতি, দাওয়াত ও ছাত্র মজলিশ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতা দেওয়াটা তো সহজ কাজ, কঠিন অংশ এলো তারপর প্রশ্নোত্তরের পালা। এর আগে ছাত্রলীগের প্রোজেকশন সভায় ছাত্রদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় তাদের দারুণভাবে হেনস্তা হতে হয়েছে। স্বভাবতই এ নিয়ে আমাদের সংগঠনেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল যথেষ্ট। আমার অপেক্ষাকৃত নতুন অভিজ্ঞতায় এ ধরনের গুরুদায়িত্ব পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কি না— এই চিন্তায় প্রাদেশিক নেতৃত্ব আমাকে সাহায্য করার জন্য চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি গোলাম সারওয়ার ভাইকে পাঠালেন। সারওয়ার ভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল সভায় হাজির থেকে পাশে বসে আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার এস এন হক স্যার এই প্রস্তাবে কোনোভাবেই সম্মত হলেন না। কোনো বহিরাগতকে সভায় উপস্থিত রাখা সম্পূর্ণ বিধিবিরোধী বলে জানালেন। তবে আমাকে স্নেহের সঙ্গে বললেন: তোমার যোগ্যতার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, তুমি নিজেই এটা চালাতে পারবে। সারওয়ার ভাই বেচারা অসহায়ের মতো আমাদের সওদাগরপট্টির অফিসে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হলেন। প্রশ্নোত্তর শুরু হলো। প্রশ্ন তো নয়, যেন এক একটা সুচালো তির। কোনো রকমেই কোনোরূপ ছাড় দেওয়ার লক্ষণমাত্রও নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করে শুরু করলাম জবাব দিতে। পরিষ্কার, যৌক্তিক এবং কখনো কখনো কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। একজনের প্রশ্ন ছিল, 'আপনারা তো কোনো বিশ্ববদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে কখনো জেতেননি, তাহলে এখানে নির্বাচন করছেন কোন সাহসে?' জবাব দিলাম: বিজয়যাত্রার সূচনা কোথাও না কোথাও তো হতে হবে, তা ফেনী থেকে হলেই মন্দ কী?

অন্য একজন মন্তব্য করল: আপনারা তো পুরো প্যানেল মনোনয়ন দিতে পারবেন না, কারণ ড্রামা সেক্রেটারির পদে তো আপনারা নিশ্চয়ই মনোনয়ন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেবেন না, তাই নয় কি? জবাবে বললাম: 'সময় আসুক, দেখবেন পুরো প্যানেলেই আমরা মনোনয়ন দেবো, ড্রামা সেক্রেটারির পদসহ। কারণ আমরা সেই পদটা ছেড়ে দিয়ে বাকি সব পদে জিতলেও অন্য দল থেকে নির্বাচিত নাট্য সম্পাদক আমাদের নাকের ডগায় ছাত্র মজলিশের পয়সায় গত সেশনের মতো চট্টগ্রাম থেকে নর্তকী এনে নাচের অনুষ্ঠান করবে, সে কাজটি হতে দিচ্ছি না।' একজন হিন্দু ছাত্র জানতে চাইল: কলেজে ছাত্রসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হিন্দু ছাত্র। তারা তো কোনোমতেই আপনাদের ভোট দেবে না, কারণ আপনারা দেশকে ইসলামি রাষ্ট্র বানাতে চান। বললাম: অবশ্যই আমরা হিন্দু ছাত্রদের ভোট পাব, কারণ ছাত্র মজলিশ নির্বাচন প্রথমত কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য, রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের জন্য নয়। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান যে ইসলামী ছাত্রসংঘ, তা হিন্দু ভাইবোনেরাও সম্যক অবহিত আছেন। এই বিচারে আমরা বিশ্বাস করি, তাদের ভোটও আমরা পাব। আর ইসলামি রাষ্ট্রাদর্শের ব্যাপারেও বলা যায়, যেহেতু পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে, সুতরাং এটা স্বীকার করে নেওয়াই সব নাগরিকের জন্য শ্রেয়। আর প্রকৃত ইসলামই সংখ্যালঘুদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এক ছাত্রী বললেন: আপনি যেভাবে বলছেন যে আপনারা হিন্দুদের ভোট, ছাত্রীদের ভোটও পাবেন, তাহলে তো আপনারা জিতে যাবেন। জবাবে বললাম: 'আল্লাহ আপনার এই বক্তব্য কবুল করুন, আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে জিতে আমরা যাবই, ইনশাআল্লাহ।' একজন মন্তব্য করলেন: 'আপনি তো "চিত্রালী" মার্কা জবাব দিচ্ছেন।' এর কোনো জবাব না দিয়ে হেসেই শেষ করলাম। সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তর সেশন শেষে বললাম: এবার আমাদের দুজন ছাত্রনেতা সৈয়দ শফিউল্লাহ ও আবদুল হক হাজারী বক্তৃতা করবেন। কলেজের সময়সূচি অনুযায়ী মনোনয়ন তখনো সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্যানেলকে পরিচয় করানো গেল না। তবে সবাই বুঝল যে এ দুজনই সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী। পরিশেষে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এস এন হক সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাভরা বক্তব্য ও দোয়ার সঙ্গে সভা শেষ হলো।

প্রোজেকশন মিটিংয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালেন অনেকেই। সবচেয়ে অভিভূত হলাম নির্বাচন কমিশনার প্রবীণ অধ্যাপক এস এন হক স্যারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তিনি বললেন, 'আমার তো ভয়ই হচ্ছিল, অত সব কঠিন কঠিন প্রশ্নবাণ তুমি সামাল দিতে পারবে কি না! কিন্তু শেষে নিশ্চিত হলাম যে আমার ভয়টা ছিল অমূলক।' ওদিকে অফিসে প্রতীক্ষারত সারওয়ার ভাই খবর পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হিন্দু ছাত্রদের ভোটের প্রশ্নটার তাৎক্ষণিক জবাব তো বীরদর্পে দিয়ে দিলাম, কিন্তু পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে নয়। প্রশ্নটা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈঠকেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানেও একই ধরনের জোরালো যুক্তি দিয়ে কর্মীদের উৎকণ্ঠা তো দূর করেছি, কিন্তু নিজের মনে উৎকণ্ঠা খানিকটা থেকেই গেছে।

ব্যাপারটা নিয়ে হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করার উপায় খুঁজছিলাম। উপায়ও একটা এসে গেল। যে ছাত্রটি প্রশ্নটা করেছিল, সে সভা শেষে কথা বলতে চাইল। খুব খুশি হয়ে বসে গেলাম আলোচনায়। তার প্রশ্নও অগুনতি। সাধ্যমতো জবাব দিয়ে গেলাম দরদভরা আন্তরিকতা নিয়ে। মনে হলো কিছুটা কাজ হয়েছে। সে আর একদিন লম্বা সময় নিয়ে বসতে রাজি হলো। তার নাম অশোক রায়। হ্যাংলা-পাতলা লম্বা গড়নে ফুটফুটে ফরসা চেহারা। কথাবার্তায় একটা ভারাক্কি রয়েছে। তখন পুরো বুঝতে না পারলেও পরে জানতে পেলাম সে-ই কলেজে হিন্দু ছাত্রদের স্বাভাবিক নেতা। রাস্তায়-করিডরে দেখা হলে দুজনেই আগ্রহভরে কুশল বিনিময় ও হালকা আলাপচারিতায় লেগে যেতাম। ক্রমেই অশোকের সঙ্গে বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কখন যেন নিজেদের অজান্তেই পারস্পরিক সম্ভাষণটা 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' গড়িয়ে গেল বুঝতেও পারিনি। একদিন বললাম, এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর লম্বা সময় নিয়ে গল্পসল্প করা যাবে। আশ্বস্ত করলাম, ভয় নাই, খাবার নিরামিষই হবে। সে হেসে বলল, আমিষেও আমার আপত্তি নাই। ব্যস, ধার্য হয়ে গেল দিন-তারিখ।

সেই সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার সময়ও কথাবার্তা কিছু হলো। তারপর দুকাপ চা নিয়ে বসে গেলাম আলাপচারিতায়। অশোকের প্রশ্নের শেষ নেই। প্রথম প্রথম বাঙালির প্রচলিত বাগ্‌বিতণ্ডা, সন্দেহ-সংশয়ভরা উত্তেজনা নিয়ে কাটল অনেক সময়। কিন্তু তার তর্কবিতর্ক যে শুধু হার-জিতের নয়; বরং সত্য নির্ণয়ের একান্ত সরল উদ্দেশ্যে, এটা পরিষ্কার হয়ে গেল শিগ্‌গিরই। সে শুরুতেই স্বীকার করল যে ছাত্রসংঘের কর্মীদের সততা ও দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরও হিন্দুদের বদলে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি তারা যে পক্ষপাতিত্ব করবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে?

বললাম, তোমার প্রশ্নের মধ্যেই জবাবটা লুকিয়ে আছে। তুমি তো নিজেই ছাত্রসংঘের কর্মীদের সততা ও দায়িত্বানুভূতির সাক্ষ্য দিলে। তুমি কি মনে করো না তাদের এই সততা, এই দায়িত্বানুভূতি নিছক লোকদেখানো নয়; বরং

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সৃষ্টিকর্তার কাছে জবাবদিহির সচেতনতা উদ্ভূত? যদি তাই হয়, তাহলে কেমন করে তারা পক্ষপাতিত্ব করবে? তারা তো কোরআনের সেই বিধান মানে, যেখানে তাদের আদেশ করা হয়েছে— 'বিশ্বাসীরা সুবিচারে সদা মজবুত থকো আল্লাহ জন্যে এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, তা যদি তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতা বা নিকটজনদের বিরুদ্ধেও যায়। সে যদি বা হোক বিত্তবান বা দরিদ্র, তারা উভয়েই আল্লাহর ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং সুবিচার করতে গিয়ে খেয়ালখুশির অনুগামী হয়ো না।' আল কোরআন: ৪, ১৩৫

কোরআনের এত বিস্তৃত অনুশাসনে অবাক হলো অশোক। এ ব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল, 'ইসলামি রাষ্ট্র হলে তো হিন্দুদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এখনই যখন-তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তখন তো সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যাবে।'

বললাম: তা কেমন করে হবে বলো? দাঙ্গা কি ধার্মিক মুসলমানেরা করে? কখনো কোনো মসজিদের ইমাম, মাদরাসার ওস্তাদ অথবা নামাজি মানুষকে দেখেছ ছুরি উঁচিয়ে হিন্দুদের মারতে আসতে? দাঙ্গা তো করে যত সব বেনামাজি, ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ, মদখোর গুন্ডারা। যাদের অধিকাংশই ইসলামের বিরোধী শিবিরের লোক আর নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘুরা আবার ভোট তাদেরই দেয়।

অশোক বলল: তারা আমাদের মারবে কেন? আমরা তো তাদেরই সমর্থন করি।

বললাম: হ্যাঁ, সেই সমর্থনের দাসখত থেকে তোমরা যাতে এক চুলও নড়তে না পারো, সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এসব নিয়মিত হামলা। এতে তাদের লাভ দ্বিগুণ, ভোটটা নিশ্চিত করা আর মাঝে মাঝে নিরাপত্তা দেওয়ার মিথ্যা অঙ্গীকারে তোমাদের টাকাপয়সা, জায়গা-জমি হাতিয়ে নেওয়া। আমেরিকার সন্ত্রাসীদের ভাষায় এটাই হলো: প্রটেকশন রেকেট।

অশোকের চেহারায় একটা উপলব্ধির সংকেত যেন দেখতে পেলাম।

এবার সে উত্থাপন করল নতুন প্রসঙ্গ: বলল, আমরা যদি আপনাদের ভোটও দিই, আপনারা তো কোনো হিন্দু ছাত্রকে আপনাদের প্যানেলে মনোনয়ন দেবেন না। কারও সঙ্গে আগে আলোচনা করিনি বটে, কিন্তু কালবিলম্ব না করে বললাম, অবশ্যই দেবো। তুমি দাঁড়াবে নাকি? আশ্চর্য হয়ে অশোক বলল, সত্যিই দেবেন? আপনার দলকে মানাতে পারবেন তো? বললাম: তা আমার ওপর ছাড়ো। তুমি যদি নাট্য সম্পাদকের পদে দাঁড়াতে রাজি হও, তাহলে এখনই তোমাকে চূড়ান্ত অফার দিতে পারি। খানিকটা চিন্তা করে অশোক সানন্দে সম্মতি দিলো। খুশিতে ভরে গেল আমার মন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পরে কর্মী বৈঠকে প্রস্তাবটা পেশ করলাম। প্রতিক্রিয়া হলো দুই রকম। সাদামাটা কর্মীরা অনেকে আঁতকে উঠল। হিন্দুর নাম ইসলামী ছাত্রসংঘের প্যানেলে কেমন করে খাপ খাবে, এটা মোটেই তাদের মাথায় আসছিল না। তারা আরও ভয় করছিল যে, ইসলামপ্রিয় সাধারণ ছাত্রদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অল্প কিছুসংখ্যক রাজনীতিসচেতন কর্মী প্রস্তাবটা লুফে নিল। তারা এর মধ্যে যে বিরাট রাজনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে, তা পরিষ্কার দেখতে পেল। সেই সম্ভাবনাটা পরিষ্কার করলাম সবার কাছে। তা ছাড়া যেহেতু ছাত্রসংঘের কোনো কর্মী এই পদে লড়তে রাজি নয়, তাই নির্বাচন করতে হলে ওই পদটা খালি রেখে নির্বাচন লড়া ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। আর আংশিক প্যানেলটা সাধারণ ছাত্রদের চোখে অসম্পূর্ণ। অতএব, খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে প্রচুর ভোট হারাবার আশঙ্কা আছে। আর হিন্দু প্রার্থীর নাম যোগ করলে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ থেকেও আমরা বাঁচতে পারব। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে আসার সম্ভাবনা রয়েছে হিন্দু ভোটের এক বিরাট অংশ। মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়ে গেল। চমক আনতে সক্ষম হলো আমাদের প্যানেলটা। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথে একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তহবিলের সংকট। খরচের যেন আর শেষ নেই। অসংখ্য লিফলেট-প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার, শহর এবং শহরতলি ও চারপাশের গ্রামগুলোতে ছাত্রদের বাড়িতে বাড়িতে প্রচারাভিযান, সভা, মিছিল, মাইকিং, যাতায়াত, আপ্যায়ন মিলে অগুনতি খরচের খাত। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদলগুলোর অর্থায়নের সূত্র অনেক; তাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে অনুদান, বিত্তবান শুভাকাঙ্ক্ষীদের মোটা চাঁদা ইত্যাদি। নতুন সংগঠন হিসেবে আমাদের এসব সুবিধা ছিল না। কেন্দ্রীয় (আমাদের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক) সংগঠন থেকে অনুদান পাওয়া দূরে থাক, ছাত্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী শাখা সংগঠনগুলোকে উল্টো প্রাদেশিক সংগঠনে একটা নির্ধারিত কোটা অর্থ সাহায্য পাঠাতে হতো।

তাই এই নির্বাচনি তহবিল সংগ্রহের জন্য অন্য সূত্রের সন্ধান করতে হলো। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেশ কজন ধার্মিক বিত্তবান ব্যক্তি সাধ্যমতো সহায়তা করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। অবশেষে ঠিক করলাম একটা স্মরণিকা প্রকাশ করব। এর বিজ্ঞাপনের আয় প্রকাশনার খরচ পূরণ করেও ভালো একটা অঙ্ক উদ্বৃত্ত থাকবে বলে অনুমান করলাম। এই নতুন স্মরণিকায় সংগঠনের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বক্তব্য সমাজের কাছে পেশ করার বাড়তি সম্ভাবনাও ছিল। তাই স্মরণিকাটির নাম

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

দিলাম 'ব্যতিক্রম'। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের অভিযানে নামিয়ে দিলাম কর্মীদের। ফেনীর ছোট-বড় বেশ কিছু ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল, কিন্তু এসব মিলিয়ে আমাদের নির্ধারিত টার্গেটের কাছেও পৌঁছাল না। বাধ্য হয়ে আমি নিজে গেলাম চট্টগ্রামে। সংগ্রহ করলাম কয়েকটা ভালো মুল্যের বিজ্ঞাপন। দাওয়াখানা প্রেসে ছাপায় মুদ্রণ ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম হলো। ফলে নির্বাচনি তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করা সম্ভব হলো। প্রকাশনাটি ভিন্নধর্মী নাম, উঁচু মানের আঙ্গিক, প্রচ্ছদ ও বিষয়বস্তুর জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সহজেই।

নির্বাচনি প্রচারণা তখন তুঙ্গে। একদিন সকালের দিকে একটা গ্রুপ নিয়ে আমি রামপুরে নির্বাচনি প্রচারণা করছি। দুপুর ১২টার দিকে একজন কর্মী ছুটে এলো আমাকে ডাকতে। বলল, কলেজজুড়ে ভীষণ উত্তেজনা চলছে। প্রিন্সিপাল মান্নান সাহেব কলেজে যাওয়ার জন্য আমাকে খবর দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরে গিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, প্রথম বর্ষের ছাত্রলীগের জয়নাল হাজারী যে দাঙ্গাবাজ হিসেবে ইতোমধ্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে, সে সকাল বেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সহজ-সরল কর্মীর গায়ে হাত তুলেছে; এই খবর পেয়ে কলেজে ছুটে এসেছে আমাদের কর্মী ইলিয়াস। যদিও ইলিয়াস কোনো দিন কোনো মারামারিতে অংশ নিয়েছে এমন নজির নেই, তবু তার পরিবারের খ্যাতি, ছয় ফুট লম্বা বিশাল চেহারা আর তার সঙ্গে গগন ফাটানো গলার আওয়াজ মিলিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য সে ছিল যথেষ্ট। সে যখন কলেজের পুকুরের এপার থেকে ওপারে দৌড়াতে দৌড়াতে হেঁকে বেড়াতে লাগল: আয়, এখন বেরিয়ে আয় হারামজাদা, দেখে নিই তোকে একবার। ব্যস, যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে আছে। শিক্ষকেরাও ইলিয়াসের সামনে যেতে সাহস করছেন না। প্রিন্সিপাল সাহেবের ধারণা, শুধু আমি ছাড়া কেউ তাকে থামাতে পারবে না। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, ঠিক আছে স্যার, চিন্তা করবেন না, আমি এখনই আসছি। একটা রিকশা নিয়ে কলেজে পৌঁছে দেখি কোথাও কেউ নেই, শুধু ইলিয়াসের চড়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পুকুরপাড়ে গিয়ে তাকে পেলাম। বললাম, কী হচ্ছে এসব? সে তার কারণ দর্শাতে শুরু করল। বললাম, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। ওঠো এখন রিকশায়। সে অনুযোগ করতে লাগল: দাদু (তার গৃহশিক্ষকের অনুকরণে সেও আমাকে দাদু ডাকত), আপনার জন্য কিচ্ছু করা যাবে না। আর এভাবে ছেড়ে দিলে এই গুন্ডারা আমাদের মাথায় উঠবে। মুখে যাই বলুক, লেজ গুটিয়ে রিকশায় উঠে বসল ঠিকই। তাকে নিয়ে অফিসের দিকে রওনা হলাম। এবার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে লাগল সবাই। পরে কলেজে ফিরে দেখা করলাম প্রিন্সিপাল সাহেবের সঙ্গে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি একটা নিশ্চিত সংঘাতের সম্ভাবনা থেকে কলেজকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য।

নির্বাচনের সমস্যার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু যতই নির্বাচনের দিন কাছে ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই খালি হতে লাগল আমাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তহবিল। আমাদের মধ্যে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, তাদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল, আমাদের পক্ষে নির্বাচনের অর্থায়ন করা সম্ভব হবে না। নির্বাচন শেষে বিরাট ঋণের বোঝা সংগঠনের ঘাড়ে। প্রাদেশিক অফিসও বারবার সতর্ক করে দিচ্ছিল ব্যাপারটা। তাই প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, যেভাবেই হোক নির্বাচনে কোনো ঘাটতি রাখা যাবে না। নির্বাচনের এক দিন আগে বায়তুল মাল সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) আবুল কাশেম জানাল যে নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বড়জোর নির্বাচনের দিন কর্মীদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত খরচ চালানো যেতে পারে। তবে নির্বাচনের দিনে বৃহত্তম খরচের খাত হলো মাইক্রোফোন ভাড়া। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পার্টি তাদের নিজ নিজ নির্বাচনি স্টলে একটা মাইক ফিট করে রাখবে দিনভর। আর নিজ নিজ দলের গুণকীর্তন ছাড়াও স্লোগানে, চিৎকার, সমালোচনা ও খিস্তি-খেউড়ে প্রাণ ঝালাপালা করে তুলবে সবার। সমালোচনা আর পাল্টা জবাব আসত অপর পক্ষ থেকে একই সমান সুচালো ভাষায়। এই পাল্টাপাল্টি গালাগালি শিগ্‌গিরই ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া, হাতাহাতি এবং শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পর্যবসিত হতো। কলেজের সাধারণ শান্তির খাতিরে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় আছে কি না, ভাবছিলাম। সুযোগও শিগ্‌গিরই এসে গেল। নির্বাচনের আগের দিন প্রিন্সিপাল এম এ মান্নান সাহেব পার্টি লিডারদের পৃথক পৃথকভাবে পরামর্শের জন্য ডাকলেন। প্রত্যেকের কাছে তিনি নির্বাচনের দিন যাতে মারামারি না হয় তার গ্যারান্টি চাইলেন। জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় দল হিসেবে আমারও ডাক পড়ল সবার শেষে। তিনি বললেন, অন্য সব দল তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং তিনি আমার কাছেও একই ধরনের নিশ্চয়তা চান। বললাম, আপনি চাইলে তো অবশ্যই নিশ্চয়তা দেবো স্যার। তবে আপনিও জানেন এবং আমিও জানি এসব নিশ্চয়তা অর্থহীন। মারামারি লাগবেই এবং পরে পার্টির নেতারা আপনার কাছে এসে ওই কৈফিয়ত দেবে যে, তাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও মারামারি থামানো গেল না। প্রিন্সিপাল সাহেব অনেকটা অসহায় সুরে বললেন, তাহলে কী করা যায় বলে তুমি মনে করো? বললাম, মারামারি থামাবার ব্যবস্থা আপনার হাতে। মারামারি তো শুরু হয় মাইকে গালাগালি এবং পাল্টা গালাগালি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

থেকে। আপনি মাইক ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রস্তাবটা প্রিন্সিপাল সাহেবের মনঃপূত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাইক ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করে নোটিশ দিলেন। বিরোধী পক্ষরা হতবাক হয়ে প্রিন্সিপালের কাছে ছোটাছুটি শুরু করল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম— আমার নির্বাচনি তহবিল সমস্যারও একটা সম্মানজনক সমাধান হয়ে গেল।

পরদিন শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন হয়ে গেল। আসলে এর প্রধান কারণ ছিল প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর দাম্ভিক আত্মবিশ্বাস। ছাত্রদের চিন্তা কোন দিকে মোড় নিচ্ছিল, আন্দাজ পর্যন্ত তারা করতে পারেনি। আন্দাজ করতে পারলে গণ্ডগোল বাধিয়ে নির্বাচনটাই ভণ্ডুল করে দিতে তারা কোনো কসুর করত না। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিন্সিপাল সাহেব পার্টির লিডারদের তার কামরায় ডেকে আপ্যায়ন করলেন। জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকেরাও উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনার ও প্রিন্সিপাল সাহেব দুজনই এই প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। পার্টির নেতারাও ধন্যবাদের জবাবে বক্তব্য রাখলেন। তখন পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আমার সুযোগ এলো সবার শেষে। কিন্তু পট পরিবর্তন হয়ে গেল শিগ্‌গিরই। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমরা জিতে গেলাম।

নির্বাচনে জেতার পর ফেনীতে ইসলামী ছাত্রসংঘেরও কদরটা বেড়ে গেল রাতারাতি। অধ্যাপক, বিরোধী ছাত্রদল, স্থানীয় ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা— এককথায় সব মহলের চোখে মূল্য বেড়ে গেল ছাত্রসংঘের। মোবারকবাদের চিঠি পেলাম প্রাদেশিক সভাপতি জনাব নাজির আহমেদ ও নিখিল পাকিস্তান সভাপতি (নাজেমে আলা) সৈয়দ মনোয়ার হোসেন সাহেবের কাছ থেকেও। সেই স্বীকৃতি আমাদের দিলো গর্বভরা আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে নিতে শুরু করলাম শহরব্যাপী পদক্ষেপ। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে হয়তো বুঝতে পারতাম যে ওসব ঠিক আমাদের আওতায় পড়ে না। এর মধ্যে অন্যতম হলো রমজানের বিধিনিষেধের সর্বজনীন প্রয়োগ প্রচেষ্টা। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল শহর হিসেবে রমজান মাসে প্রকাশ্যে পানাহার যারা রোজাদার নয়, তারাও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত, অন্তত অর্ধেকেরও বেশি হোটেল-রেস্তোরাঁ দিনের বেলা বন্ধ থাকত। প্রতি বছর রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহে ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে 'রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন' শিরোনামে পোস্টারে, প্রচারপত্রে সারা শহর ঢেকে দেওয়া হতো। এ বছরের রমজানে শুধু ওইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে কর্মীরা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রাজি হলো না। ঠিক হলো, এবারের প্রচারে প্রকাশ্যে অনাহার ও নষ্ট হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে। প্রচারপত্র ছাড়াও মাইকে গোটা শহরে ঘোষণা দেওয়ার জন্য রিকশায় করে গ্রুপ পাঠানো হলো।

কিন্তু সমস্যা হলো নতুন এসডিও সাহেবকে নিয়ে। আগে যে এসডিও সাহেব ছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মোটামুটি ভালোই ছিল। যিনি নতুন এসেছেন, তার নাম আনিসুজ্জামান। জামান সাহেব বয়সে নবীন এবং কাজ করার ঝোঁক খুবই বেশি। আমাদের যে গ্রুপটি মাইকে প্রচারণা দিচ্ছিল, তাদের অ্যারেস্ট করার হুকুম দিলেন তিনি। খবর পেয়ে থানায় ছুটে গেলাম। ওসি সাহেব বললেন, এসডিও সাহেবের কাছে যেতে হবে। তিনি হুকুম না দিলে আমরা কিছুই করতে পারব না। বাধ্য হয় এসডিও সাহেবের বাংলোয় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি প্রথমে কোনো রকমের কথা শুনতেই চাইলেন না। বললেন, তুমি আবার কে? তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে কেন? আমি পরিচয় দিলাম এবং অনেকটা দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, ফেনীতে আপনাকে কাজ করতে হলে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশেই কাজ করতে হবে! যা হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি কথা শুনতে রাজি হলেন। ঘটনাটা পরিষ্কার করার পর তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, এখানকার শাসনের দায়িত্ব কি তোমার, না আমার? তুমি আবার লোকদের জোর করে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করার হুকুম দেওয়ার কে? বললাম, দেখুন এসডিও সাহেব, দায়িত্বটা তো আসলে ছিল আপনাদেরই, কিন্তু আপনারা তো সে দায়িত্ব পালন করছেন না, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের তা পালন করতে হচ্ছে। এসডিও সাহেব যুক্তি দিলেন, ধর্ম তো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়। কোরআনে আছে না, 'লাকুম দিনুকুম ওলিয়াদিন', তোমার ধর্ম তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম আমার সঙ্গে। হেসে বললাম, জি কোরআনে ঠিকই তা আছে, তবে সুরাটা কি শুরু থেকে পড়েছেন? অবাক হয়ে তিনি বললেন, কী আছে শুরুতে? বললাম এটা শুরু হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন' বলে; মানে, হে কাফেররা। আপনি যদি নিজেকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তাহলে আমার আপত্তি নেই, তবে এটা আপনার এবং মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়। লজ্জা পেয়ে জামান সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তোমার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে ভবিষ্যতে কথাবার্তা না বলে এ রকম কিছু করবে না। বললাম, আচ্ছা তাই হবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

উনিশ

কলেজে বিজয়ের এক অনিবার্য ফল হলো, অনেকেই আমাকে আসল যোগ্যতার চেয়ে অধিক মূল্যায়ন করতে শুরু করলেন। আজ বিনয়ভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় সেই সময় আমি যাদের ঐকান্তিক স্নেহে সিক্ত হয়েছি, তাদের মধ্যে ছিলেন ফেনীর প্রাচীনতম সাপ্তাহিক *তালীম* পত্রিকার মালিক ও ফেনী আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হজরত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব। অন্য পত্রিকাটি ছিল আওয়ামী লীগের খাজা আহমদ সাহেবের *আমার দেশ*। তালীম প্রাচীন হলেও তখন খুব ভালো চলত না। আব্দুল গফুর নামে এক ভদ্রলোক সম্পাদনা করতেন। কিন্তু সম্পাদনার মান ছিল খুবই গতানুগতিক। সংবাদ প্রবন্ধ তো থাকতই না, খবরও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। প্রায়ই এতে সম্পাদকের ঢাকা গমন ও প্রত্যাবর্তনের খবর থাকত। লোকেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করতে ছাড়ত না। প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, পত্রিকাটি তোমাকে সম্পাদনা করতে হবে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, আমি ছাত্র মানুষ, সময় কম, তা ছাড়া আমার সম্পাদনার যোগ্যতা কোথায়? প্রিন্সিপাল সাহেব কোনোমতেই শুনতে রাজি হলেন না। তিনি নিশ্চয়তার সঙ্গে বললেন যে সময় কম হলেও আমি এটা চালাতে পারব এই বিশ্বাস তার আছে। কয়েক দিন চিন্তাভাবনা করে তার কাছে আবার গেলাম, বললাম, ঠিক আছে হুজুর, সম্পাদনা আমি করব, তবে সম্পাদক হিসেবে নয়, কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে, আর আমার সঙ্গে আব্দুস সাত্তার সাহেবকে দিতে হবে সম্পাদনার জন্য। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই সাত্তার সাহেবকে প্রমোট করা আমাদের জন্য জরুরি ছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। বিস্তারিত পরিকল্পনা করলাম আর খাটুনি খাটলাম অনেক। সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সাহেব হলেও লেখালেখি প্রায় সারাটা আমাকেই করতে হলো। রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে সাত্তার সাহেব আনলেন অতি প্রয়োজনীয় সংযোগ ও গ্রাহক শ্রেণি। নতুন আঙ্গিকের তালীম পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো সহজেই। বিক্রিও বাড়ল আশাতীত। খুব খুশি হলেন মাওলানা। তবে বিচলিত হলেন প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ্তাহিক *আমার দেশ*-এর খাজা আহমদ সাহেব। তালীমের এই সাফল্য আরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়াল, নবীন বামপন্থি সাংবাদিক এবং কলেজ রোডের অভিজাত আধুনিক রেস্তোরাঁ রুচিতার মালিক এরশাদ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মজুমদার শুরু করলেন লাল নামফলকে প্রগতিশীলতার দাবিদার সাপ্তাহিক ফসল। ফেনীর পত্রিকা বাজারে কায়েম হলো রাজনৈতিক ভারসাম্য।

এ সময় আমি জায়গির থাকতাম কলেজের ইংরেজি বিভাগের হেড অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরীর বাসায়। চট্টগ্রামের পরাগলপুর চৌধুরীবাড়ির অধিবাসী সুবাদে চৌধুরী সাহেব ছিলেন আমাদের আত্মীয়। তাই আব্বাকে বলে তিনি একরকম আবদার করেই আমাকে নিয়ে এলেন তার বাসায় তার দুই মেয়ে স্বপ্না ও ঝরনাকে পড়াবার জন্য। স্বপ্না ক্লাস নাইনে আর ঝর্ণা ক্লাস সিক্সে পড়ত। এর আগে কিছুদিন শহরের খানিকটা বাইরে এয়ারপোর্ট পেরিয়ে বারাহিপুরে এক বাড়িতে জায়গীর ছিলাম। চৌধুরী সাহেবের বাসায় তার চাচাতো ভাই ও বাল্যবন্ধু নিজাম উদ্দিন চৌধুরীও সস্ত্রীক থাকতেন। দুই বন্ধু আবার ছিলেন ভায়রা, বিয়ে করেছিলেন বরিশালের দুই বোনকে। নিজাম চৌধুরীর বড় ভাই আমার জ্যাঠতুতো বোন মাফু বু'জানের স্বামী, সেই সুবাদে আমাদের ছিলেন নিকট আত্মীয়। জাহাঙ্গীর চৌধুরী সাহেব এবং নিজাম চৌধুরীর যৌথ মালিকানায় কলেজ রোড আর স্টেশন রোডের মোড়ে একটা বইয়ের দোকান ছিল। জাহাঙ্গীর সাহেবের মেয়ে ঝরনার নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল ঝরনা পুস্তকালয়। গুদাম কোয়ার্টার্সে তাদের বাসাটা বেশ বড় ও সুন্দর ছিল। বাসায় আরও থাকত তার এক ভাগিনা ফিরোজ। সে ছিল কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাই স্থান সংকুলানের জন্য বাসার ঠিক সামনেই আমার ও তাদের অপর এক যুবক আত্মীয়ের জন্য আরও একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন তারা। নওয়াব নামের এই চটপটে স্মার্ট ছেলেটা কোনো পারিবারিক কারণে অল্প বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করত তাদের বইয়ের দোকানে। মেয়ে দুটোকে আমি পড়াতাম বটে, তবে অনেকটা নামমাত্র। সম্ভবত আমার অপরিসীম ব্যস্ততা আঁচ করতে পেরেই তারা আরও প্রাইভেট শিক্ষক রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার ব্যস্ততার সীমা ছিল না। রাতে যেদিন আমি ঘরে থাকতাম, সেদিন গোটা পরিবারের সঙ্গে খাবারের টেবিলে যোগ দিতে হতো। জাহাঙ্গীর স্যার আর নিজাম ভাই আমাকে অনেকটা বন্ধুর মতো দেখতেন এবং খাওয়ার টেবিলে শুরু হয়ে যেত ধর্ম, রাজনীতি ও বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনা। ফিরোজ আর ভাবি অংশ নিতে কসুর করতেন না।

বছরের শুরু থেকেই কাজের চাপ বাড়ছিল চতুর্দিকে। ছাত্রসংঘের পরিচিতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে লেগে গেল নতুন শাখা গঠনের ধুম। প্রাদেশিক সংগঠনের সীমিত লোকবলের কারণে প্রায়ই আশপাশের শহরগুলোতে সফরের দায়িত্বও আমাদেরই পালন করতে হচ্ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

প্রাদেশিক অফিস এই দায়িত্ব অর্পণের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পেরে সাংগঠনিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে মনস্থ করল। দুটি কি তিনটি জেলা নিয়ে গঠন করা হলো অঞ্চল। ওই অঞ্চলের কোনো অগ্রসর শাখার সভাপতিকে নিয়োগ করা হলো ওই এলাকার আঞ্চলিক প্রতিনিধি। আমার ওপর চাপানো হলো নোয়াখালী-কুমিল্লার দায়িত্ব। ফল যা হবার তাই হলো। লেখাপড়া লাটে উঠল, নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও আর রইল না।

১৯৬৫ সালটা আবার মাথায় করে বয়ে আনল যুদ্ধ। শিগ্গিরই পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল পশ্চিম সীমান্তে। জানুয়ারি থেকেই গুজরাটের ঊষর একখণ্ড মরুভূমি 'রান অব কচ্ছ' নিয়ে উত্তেজনা শুরু হলো। বছরের শুরু থেকেই ভারত কর্তৃক জবরদখল করে রাখা এই অঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক টহল দিতে শুরু করল। তেড়ে এলো ভারত। হোক না ধূসর মরুভূমি, কিন্তু জায়গা তো বটে। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী'। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হেরাল্ড উইলসন এগিয়ে এলেন মধ্যস্ততা করতে। জুন মাস নাগাদ উভয় পক্ষই বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব একটা ট্রাইব্যুনালের হাতে সোপর্দ করতে সম্মত হলো। ট্রাইব্যুনালের রায় এলো ১৯৬৮ সালে। পাকিস্তান পেল ৩৫০ বর্গমাইল, যদিও প্রথমে দাবি ছিল ৩৫০০ বর্গমাইলের। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল কি পারে যুদ্ধের চুলকানি থামাতে! উভয় পক্ষই সুযোগ খুঁজতে শুরু করল নতুন করে লড়াই বাধাবার। ১৯৬২ সালে চীনের কাছে হেরে যাওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য কোনো না কোনো নতুন যুদ্ধ বাধিয়ে নিজেদের সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানের কারণ অবশ্য আরও লজ্জাকর। আর তা হলো সেনাশাসিত এই দেশের চরম সামরিক মূর্খতা। শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক আজব সামরিক স্ট্র্যাটেজির প্রবক্তা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে লাহোরে এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রথম জিওসি এবং তৎকালীন কমান্ডার-ইন-চিফ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক আজগুবি সমরনীতি প্রস্তাব করেছিলেন, আর তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়। ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচাতে হলে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধ বাধাতে হবে। তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সহজেই দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তারপর ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে ফেললেও তা আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এবার প্রমাণ হলো যে সেই উদ্ভট সমরনীতি তার উর্বর মস্তিষ্কে তখনো ঘুরঘুর করছে। ভারত তখন অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করেনি। তবে পাকিস্তানের নেতৃত্বের মনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কোনো চিন্তা ভুলেও উদিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আইয়ুব খান ঠিক করলেন, কাশ্মীর

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সীমান্তে এক ত্বরিত হামলা চালালে ভারত তা প্রতিহত করতে পারবে না। আর ভারতের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ কাশ্মীরবাসী এমন হামলায় শুধু অভিনন্দন জানাবে না; বরং এক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যমে উৎখাত করবে হিন্দুস্তানি শাসন। এই পরিকল্পনা মোতাবেক অধিকৃত কাশ্মীরে পাঠানো হলো বেসামরিক পোশাকে দলে দলে অনুপ্রবেশকারী। অধুনা ডিক্লাসিফাইড এই সময়ের মার্কিন এস্টেট ডিপার্টমেন্টের এক চিঠিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইয়ুব খান সাহেবের হঠকারী সিদ্ধান্তে যুদ্ধ তো বেধে গেল, কিন্তু ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের প্রস্তুতি ছিল সত্যিই অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। পাকিস্তানের পদাতিক বাহিনী ছিল ২ লাখ ৬০ হাজার। আর ভারতের পদাতিক বাহিনী তখন ৭ লাখ। ভারতের ৬২৮টি সাঁজোয়া বাহিনীর মোকাবিলায় পাকিস্তানের ছিল ৫৫২। পাকিস্তান মোটে ২৮০টি জঙ্গিবিমান নিয়ে নামল ভারতের ৭০০ জঙ্গিবিমানের মোকাবিলায়। বলা যেতে পারে যে শুধু ট্যাংকের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান ভারত থেকে অতি সামান্য ভালো ছিল। ভারতের ৭২০টি ট্যাংকের মোকাবিলায় পাকিস্তানের ছিল ৭৫৬টি।

সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে আসল যুদ্ধ শুরু হয়ে শেষ হলো ২১ সেপ্টেম্বরে। সতেরো দিনের এই যুদ্ধে কে জিতল কে হারল তা নিয়ে মতভেদের সীমা নেই। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনেরা দেশবাসীকে জানাল যে যুদ্ধে পাকিস্তানেরই জয় হয়েছে। কিন্তু পরে দেখা গেছে যে যুদ্ধটা অনেকটা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। উভয় পক্ষের অবিশ্বাস্য দাবি ও পাল্টা দাবি ছিল হাস্যকর। তবে নিরপেক্ষ তথ্যমতে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ছিল অনেকটা সমান সমান। এই হিসাব অনুযায়ী যুদ্ধে পাকিস্তানের নিহত সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮০০ আর ভারতের ৩ হাজার। পাকিস্তান হারায় ২০০ থেকে ৩০০ ট্যাংক আর ভারতের ১৫০ থেকে ১৯০টি। এই হিসাবে শুধু বিমানযুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল সত্যিই ভালো। পাকিস্তান ধ্বংস করে ভারতের ৬০ থেকে ৭৫টি জঙ্গিবিমান আর সেই তুলনায় ভারত ধ্বংস করতে সক্ষম হয় পাকিস্তানের মাত্র ২০টি জঙ্গিবিমান। আন্তর্জাতিক পর্যালোচনা অনুযায়ী যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের ওপরে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই পরাস্ত হয়। তবু যুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য ও অপরিসীম উদ্দীপনা সারা দেশকে সত্যিই উজ্জীবিত করে তুলেছিল। ঘরে-বাইরে একটা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জোয়ার নেমে এসেছিল যেন। বেতারে, টেলিভিশনে, সিনেমা-থিয়েটারে মুসলমানের অতীত ঐতিহ্য ও বিজয়ের কাহিনিসংবলিত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নাটক ও প্রদর্শনী দেশকে সত্যিই জাগিয়ে তুলেছিল। কবিরা রচনা করেছেন জাগরণের সাড়া জাগানো কবিতা, গায়কদের কণ্ঠে বজ্রনিনাদে বেজে ওঠে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো আগুনঝরা গান। ঢাকা বেতারের অমর শিল্পী আব্দুল জব্বার যখন গাইলেন, 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ জিন্দাবাদ, হজরত আলীর বিপ্লবী সুর তোর দিলে আজ হউক আবাদ'। তখন আকাশবাণী কলকাতা করুণ সুরে গাইছিল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে'। মূল যুদ্ধ যদিও হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, তবু পূর্ব পাকিস্তানে আলোড়ন ও উত্তেজনার যেন তুফান বয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা দেখে ধারণা করাই সম্ভব ছিল না যে, এ দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি কখনো কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে এবং অতি শিগ্‌গির এই দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হতে যাচ্ছে। যাহোক, সতেরো দিনের যুদ্ধ শেষ হলো। রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘ যুদ্ধ বিরতির হুকুম জারি করল। এরপর আমেরিকার অনীহার সুযোগ নিয়ে রুশ পলিটব্যুরোর সেক্রেটারি জেনারেল (প্রধানমন্ত্রী) আলেক্সি কোসিগিন দ্রুত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিলেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ডাকা হলো শান্তি সম্মেলন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী দুই দেশের পক্ষ থেকে অংশ নিলেন। স্বাক্ষরিত হলো ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি। শাস্ত্রী দস্তখত করলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিল। তবে দেশে ফেরার আগেই তাসখন্দে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করায় ভারতে শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে একটা সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা ছিল ভিন্ন। সরকারি কর্তৃপক্ষের অপপ্রচারে দেশের সাধারণ জনতা তো বটেই, রাজনৈতিক দলের নেতারাও যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন করতে পারেননি। ফলে সারা দেশে তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে শুরু হলো তুমুল আন্দোলন। আইয়ুব খানের দুর্ভাগ্য যে নির্বাচনের পর আন্দোলনের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে যুদ্ধ তিনি লাগালেন, সেই যুদ্ধই বয়ে আনল তার জন্য নতুন সরকারবিরোধী আন্দোলনের স্রোত। তার উচ্চাভিলাষী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পদত্যাগ করলেন। আর সফর করে বেড়াতে শুরু করলেন সারা দেশে। পথে পথে নাটকীয় কান্নায় রুমাল ভেজালেন ডজন ডজন। জামায়াতে ইসলামীসহ বাদবাকি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দও সারা দেশে সফর করলেন। আমরা স্লোগান দিলাম, 'তাসখন্দ দাসখত মানি না, মানি না'।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বিশ

মানা না-মানাটা অবশ্য রাজপথের স্লোগান দেওয়া জনতার অপেক্ষায় রইল না। তাসখন্দ যথারীতি কার্যকর হলো। তবে দুই দেশের রাজনীতিতে এটা আনল এক বিপুল পরিবর্তন। পাকিস্তানে শুরু হলো রাজনৈতিক আন্দোলন। কেন্দ্রীয় নেতারা এলেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে। এলেন মাওলানা মওদূদীও। মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় অত্যন্ত পুলকিত হলাম। এর আগে তাকে কখনো দেখিনি। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য তিনি রেলযোগে ফেনী হয়ে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। মাওলানা মওদূদীকে বহনকারী ট্রেনটা ফেনী স্টেশন দিয়ে পার হচ্ছিল প্রায় মধ্যরাতে। আমরা বিপুলসংখ্যক ভক্ত-অনুরক্ত সমবেত হলাম রেলস্টেশনে। রেলগাড়িটা খুব বেশি সময় ফেনীতে অবস্থান করার কথা নয়। কিন্তু জনতার ভিড় দেখে মাওলানা তার কামরা থেকে বেরিয়ে দরজায় এলেন। সালাম ও মুহুর্মুহু স্লোগান দিয়ে আমরা তাকে অভিনন্দন জানালাম, 'মাওলানা মওদূদী জিন্দাবাদ'। পরদিন সকালে চট্টগ্রামে গেলাম। সন্ধ্যায় আন্দরকিল্লার জামায়াত অফিসে এক ছোট পরিচয় বিনিময় অনুষ্ঠানে আমাকে মাওলানার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম আযম। মাওলানা রসিকতা করে মন্তব্য করলেন, নামের আগে চৌধুরী তো পশ্চিম পাকিস্তানে হয়, পূর্ব পাকিস্তানেও হয় তা তো জানতাম না। গোলাম আযম সাহেবও কম যান না, তিনি বললেন, 'মাওলানা, পূর্ব পাকিস্তানে তো নামের আগে-পরে দুই দিকেই হয়, যেমন খান আবদুস সবুর খান।' হেসে উঠলেন মাওলানা।

পরদিন বিকেলে লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগ দিতে গেলাম। বিশাল ময়দান, লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলারও ঠাঁই নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চতুর্দিক। কিছু দূরত্বে উঁচু বাঁশের ওপর লাগানো হয়েছে লাউড স্পিকার। আর প্রতিটি লাউড স্পিকারের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন দুজন কর্মী। ভাবলাম, একটা জরিপ চালিয়ে দেখা যাক এসব কর্মীর পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান। হেঁটে হেঁটে আলাপ-পরিচয় করলাম সবার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখলাম, এদের মধ্যে অধিকাংশই ভালো ভালো পেশায় নিয়োজিত আছেন। কেউ কলেজের অধ্যাপক অথবা স্কুলের শিক্ষক, কিংবা কোর্টের উকিল অথবা ছোট ব্যবসায়ী। কিছুসংখ্যক ভাই শ্রমজীবীও ছিলেন। ভাবলাম, এদের সবাইকে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এই মাইক পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োগ না করে বোধ হয় গণসংযোগ এবং দাওয়াতের কাজে অনেককে ব্যবহার করা যেত। তা ছাড়া অধ্যাপক ও উকিল সাহেবদের শারীরিক গড়ন দেখে মোটেই আস্থা হলো না যে গন্ডগোল লাগলে এরা কোনো রকমের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন। যাই হোক, সিদ্ধান্ত নেতৃত্বের, আমার করার কিছু ছিল না। অবশ্য গন্ডগোলের সম্ভাবনাও ছিল। চতুর্দিকে গুজব ছিল যে আইয়ুব-মোনায়েমের কনভেনশন লীগের গুন্ডা বাহিনী হামলা করতে আসবে তাসখন্দবিরোধী এই জনসভা ভঙ্গ করে দেওয়ার জন্য। একপর্যায়ে কারা যেন একটা সাপ ছেড়ে দিলো সভার চলাচলের রাস্তার ওপর। কিছু ছোটাছুটি হলো বটে, কিন্তু সভাস্থলে খুব শিগ্‌গিরই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলো। সভা শেষে খাওয়াদাওয়ার পর রাতের ট্রেনে মাওলানা মওদূদী ফিরে যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে ভিড় লেগে গেল কর্মীদের। ট্রেন ছাড়ার আগে দেখলাম চট্টগ্রাম বিভাগীয় জামায়াতের আমীর আব্দুল খালেক সাহেব ট্রেনের সিঁড়িতে উঠে দুপাশের হ্যান্ডেল দুইটা ধরে নিতান্ত শিষ্যের মতো মাওলানা মওদূদীর সঙ্গে কথা বলছেন। মাওলানার আলোকদীপ্ত চেহারার দিকে দেখছেন আর বারবার চোখ মুছছেন। আব্দুল খালেক সাহেব ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। শক্ত মানুষ হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর, সহজে গলে যাবার লোক নন, অথচ তাকেই এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে আশ্চর্য হলাম। নেতার প্রতি এ রকমের অঢেল, অকৃত্রিম ভালোবাসাভরা শ্রদ্ধা সাধারণ কোনো রাজনৈতিক দলের হতে পারে না। এটা শুধু জামায়াতে ইসলামীতেই সম্ভব। সিলেট ও কুমিল্লা সফর শেষ করে মাওলানা মওদূদী ফেনীতেও এলেন জনসভা করতে। ফেনীর জনসভার জন্য শহরের সবচেয়ে বড় মাঠ মিজান ময়দান নেওয়ার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু মিজান ময়দান কমিটির সভাপতি ছিলেন স্থানীয় এসডিও সাহেব। ওপরের নির্দেশে তিনি মিজান ময়দানে জনসভার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। বাধ্য হয়ে আমরা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ময়দানে সভার আয়োজন করলাম। সভায় লোকসমাগম এত বেশি হলো যে জনতা মাঠ পেরিয়ে মসজিদের চারপাশে এমনকি রাস্তার ওপরও জড়ো হতে বাধ্য হলো। পররাষ্ট্রনীতির ওপর বক্তৃতা হলেও মাওলানা মওদূদী বক্তৃতায় রসিকতা আনতে ছাড়লেন না। কোসিগিন কীভাবে আইয়ুব খান সাহেবকে চুক্তিটি কবুল করতে বাধ্য করেছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলানা বললেন, সম্ভবত কোসিগিন আমাদের প্রেসিডেন্ট বাহাদুরকে বলেছেন, 'শাস্ত্রী হালকা দুবলা মানুষ, তা ছাড়া তাকে দেশে ফিরে গিয়ে তার পার্লামেন্টে জবাবদিহিও করতে হবে। আপনি মাশাআল্লাহ বিশাল শক্তিমান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পুরুষ। সারা পাকিস্তানে কেউ আপনার কাছে জবাব চাইতে সাহস করবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং আপনিই দয়া করে প্রথমে মেনে নিন।' সভায় হাসির রোল পড়ে গেল।

রাজনৈতিক ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ছাত্রসংঘের কাজের চাপও প্রতিদিনই বাড়ছিল। স্থানীয় সংগঠনের কাজ অগ্রসর কর্মী বাহিনীকে দিয়েই চালিয়ে নিচ্ছিলাম। এদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিল তারা হলো আবুল কাশেম, গোফরান, মাহবুব মজুমদার, মৌলবি মোস্তফা, আবু নাসেরসহ আরো অনেকে। তবু সংগঠনের কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় হচ্ছিল। আমি মূলত প্রশিক্ষণ ও কর্মী গঠনের দিকটাই দেখছিলাম। তবে নির্বাচিত প্রতিভাবান ছাত্রদের দাওয়াত দেওয়ার কাজটা আমার একটা হবির মতো ছিল। যে কজনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নির্বাচন করেছিলাম, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মোস্তফা শওকত ইমরান, জিল্লুর রহমান ও আবুল খায়ের। ইমরান ও জিল্লুর ফেনী পাইলট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাশ করে প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছিল। তাদের জীবনে ও পরিবারে ইসলামের এমন কোনো ছোঁয়া লাগেনি। তবে জানার ও গ্রহণ করার আগ্রহ ছিল তাদের অপরিসীম। কোনো সভায় আমার বক্তৃতা শোনার পর আমার সঙ্গে তারা দেখা করে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাদের প্রতিভাদীপ্ত চোখে দেখলাম আগামীর বিপুল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। ইমরানের বাবা ছিলেন এলএমএফ ডাক্তার। কলেজের কাছেই মাস্টারপাড়ায় তাদের একটা সুন্দর একতলা বাসা ছিল। ওর আব্বা তথাকথিত প্রগতিবাদী চিন্তার ধারক ছিলেন। ইসলাম তার পছন্দের তালিকার শীর্ষে স্থান পেত না। ফলে সেভাবেই ছেলেকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু ইমরান ছিল অত্যন্ত শান্ত, নম্র ও লাজুক প্রকৃতির ছেলে। ঠিক সে ধরনের ছেলে, যারা ইসলামের কাজের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। আর ইসলাম জানার আগ্রহ তার ছিল অপরিসীম। নিজের আগ্রহেই সে আমার সঙ্গে বসবার অনুমতি চাইত। আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিতাম আমি। কয়েক বৈঠকের পরই পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইমরান ইসলামের কাজের জন্য তৈরি। প্রথমে তাকে কিছু বই পড়তে দিলাম। ভালো ছাত্র হিসেবে খুব দ্রুত সে বইগুলো পড়ে ফেলত। কিন্তু পড়ে শেষ করে পরবর্তী বৈঠকে বইয়ের বিষয়ের ওপর নিয়ে আসত নানা প্রশ্ন। ক্রমেই সে সংগঠনের অন্যান্য কাজের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। এত দিন শুধু বিশেষ ও সাধারণ সভাগুলোতে কখনো কখনো তাকে আসার জন্য দাওয়াত দিতাম। কিন্তু সে চাইল কর্মী বৈঠক, শিক্ষা বৈঠক, ট্রেনিং ক্যাম্পসহ অন্যান্য কর্মসূচিতেও অংশ নিতে। ইতোমধ্যেই সে নামাজ এবং অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে নিয়মিত হয়ে উঠছিল। একদিন নিয়ে এলো এক আজব প্রশ্ন। বলল, আব্বা তো আমাকে নাচের ক্লাসে পাঠান, আমি কি এখন থেকে নাচের ক্লাসে যাওয়া বাদ দেবো? আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! গানের ক্লাসে হলেও একটা কথা ছিল, নাচের ক্লাসে! তাও আবার ছেলেকে? প্রথমে তো ঠিকই করতে পারলাম না কী জবাব দেবো। বাবার সঙ্গে এখনই দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিলে হয়তো তিনি তার ইসলামের কাছে আসাটাই বন্ধ করে দেবেন এই আশঙ্কায় বললাম, না বাদ দেওয়ার দরকার নেই, এখনো যেভাবে তিনি চান সেভাবেই চলতে থাকো, আর ইসলামি পড়াশোনা চালিয়ে যাও, তারপর দেখা যাবে। তাই হলো, কয়েক মাসের মধ্যে ইমরান সংগঠনের কাজে সম্পূর্ণ নিয়মিত হয়ে গেল। সহজে নামাজের জামাত ছাড়ত না। কর্মীসভায়ও যোগ দিতে শুরু করল। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, নাচের ক্লাসে যাও এখনো? সে বলল, না ছেড়ে দিয়েছি। বললাম, আব্বা রাগ করেননি? সে জবাব দিলো, শুরুতে কিছু করেছিলেন, এখন মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। ব্যস, ইসলামে ইমরানের অগ্রযাত্রা শুরু হলো। জিল্লুর অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মেধাবী, সদা চঞ্চল, খেলাধুলাপাগল ও বহির্মুখী; ইমরানের সম্পূর্ণ উল্টো। তাকেও সময় দিলাম যথেষ্ট। কিন্তু শিগ্গিরই সে পিছুটান দেখাতে লাগল। তার বন্ধু চয়নের ধরন দেখেই বোঝা গেল যে তার ঝোঁক সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। সামনে সে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে ব্যবহার করত বটে, তবে এড়িয়ে চলতে যে চাইত, তা ছিল পরিষ্কার। পরে অবশ্য দুই বন্ধুই ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সেখানে ইমরান হলো ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা আর জিল্লুর ছাত্র ইউনিয়নের।

শেষের দিকে ফেনী কলেজের একটা নতুন বিপদ বাধল। কলেজের প্রিন্সিপাল জি এম এ মান্নান সাহেবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হলো। আন্দোলনটা ঠিক কোনো ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে নয়; বরং সাধারণ ছাত্রদের মধ্য থেকে একটা গ্রুপ সোচ্চার হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ আনল নানা রকম, দুর্নীতির অভিযোগসহ। অথচ এর মধ্যে সত্যতা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু বেশি দিন এক জায়গায় থাকলে যেভাবে মানুষ জনসমর্থন হারায়, ঠিক সেভাবেই মান্নান সাহেব সমর্থন হারালেন। ইসলামী ছাত্রসংঘের মধ্যেও এক গ্রুপ তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল কলেজ ছাত্র মজলিশের সহসভাপতি সৈয়দ শফিউল্লাহ। শফিউল্লাহ মানুষ অত্যন্ত সরল ছিল, তবে কোনো একটা জিনিস তার মাথায় চেপে বসলে তা থেকে তাকে ফেরানো সহজ কাজ ছিল না। এমনিতেই বিরোধিতা বাঙালির শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কোনোভাবে কোনো বিরোধিতার সুযোগ পেলেই তারা তাতে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মেতে ওঠে সহজে। এক্ষেত্রেও একই রকম প্রবণতা দেখা গেল। অনেক চেষ্টা করেও আমাদের কর্মীদের এই আন্দোলন থেকে ফেরানো গেল না। ফলে বাধ্য হয়েই আমাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাদের মতে সায় দিতে হলো। মান্নান সাহেব ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত আঘাত পেলেন আমার সিদ্ধান্তে। আমি নিজেও নিতান্ত ব্যথিত মনেই এ কাজ করতে বাধ্য হলাম। যাক, মান্নান সাহেব শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন। তার বিদায়ের পর মনের ভেতর কেমন যেন একটা বেদনাভরা শূন্যতা বোধ করতে থাকলাম কিছুদিন। বুঝলাম, নেতৃত্ব মানে শুধু অনুসারীদের নিজের মর্জিমতো পরিচালনা করাই নয়, কখনো কখনো অনুসারীদের মর্জিমতো নিজেও পরিচালিত হওয়ারও প্রয়োজন হয়, এমনকি যদি সেই সিদ্ধান্ত ভুল হয়, এটাই গণতন্ত্র।

ইতোমধ্যে ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক অফিস থেকে ডাক এলো ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফেনী ছাড়তে হবে এমনটা কখনো ভাবিনি। এবার দেখলাম মনের অজান্তেই ছোট্ট এই মফস্বল শহরটাকে কেমন যেন ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ফেনীর অলিগলি, দিঘি, বাজার এমনকি কলেজ, স্কুল, মাদরাসা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রেলস্টেশন, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও কেমন যেন মনের ভেতরে জায়গা করে নিয়েছিল। এই শহরের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে আছে আমার অনেক স্মৃতি। শহর তো বটেই, এমনকি ফেনীর বাজারেও কেমন যেন জড়িয়ে ছিল এক মোহময় আবেশ। তাজা তরিতরকারি, শুঁটকি মাছসহ অন্যান্য সাওদার লেনদেনে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা কর্মমুখর সওদাগরপট্টির গলিতে গলিতে দিনের শেষে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ক্যাশবাক্সটা সামনে নিয়ে নিজ নিজ গদিতে বসে হিসাবের খাতায় লাভ-লোকসানের খতিয়ান লিখতেন। দিনের আলো বদলে হালকা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে উঠত দোকানঘরে আর রাস্তায়। সেই স্তব্ধ সন্ধ্যা এবং এক ভিন্ন রকমের আবেশ ছড়িয়ে দিত শহরের পথে পথে। সুরত মহল সিনেমার সামনে মাইকে বাজত সেই সময়ের সেরা গানগুলো। দলে দলে যুবক জমা হতো পাঁচগাছিয়া রোডের ওপর সেই গান শুনতে। স্বল্প ব্যয়ে অবসর বিনোদনে এর চেয়ে যুগোপযোগী ব্যবস্থা আর কিছু ছিল না তখন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

একুশ

স্থান বদল যেন আমার বিধিলিপি, জন্ম থেকেই স্থান বদলেই চলছি, আরও কতবার বদলাতে হবে তার খবর তখনো কি আমি জানি? কথা উঠল আমাকে ঢাকায় যেতে হবে। আগেও একবার ঢাকায় গিয়েছিলাম। স্থায়ীভাবে নয়, ছাত্রসংঘের বিশেষ এক কাজে। ছাত্রসংঘের তখন দপ্তর সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। সংগঠনের ঢাকা অফিস ছিল ৮০ নম্বর হোসেনী দালান রোডে। প্রাদেশিক দায়িত্বশীলদের কারো সঙ্গে তখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। ঠিক হলো, ফুলবাড়িয়া স্টেশনে নেমে সেখান থেকে রিকশায় করে আমি হোসেনী দালান রোডে চলে আসব, সেখানে নিজামী ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। এমনিতেই রাত ১২টায় ট্রেনটি পৌঁছার কথা, কিন্তু পথে বারবার দেরি হওয়ায় ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রায় রাতের আড়াইটা বেজে গেল। ভয় হলো, এত রাত পর্যন্ত নিজামী ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন না। তবু একটা রিকশা নিয়ে রওনা হলাম। কাছে এসে রিকশাওয়ালা একটা সাদা একতলা দালানের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, এটাই ৮০ নম্বর। তাকিয়ে দেখি একটা খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে বাতির আলো দেখা যাচ্ছে। কাছে এলে জানালা থেকে ভেসে এলো কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর আওয়াজ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক যুবক গভীর মনোনিবেশে তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে। শান্ত সমাহিত সেই তিলাওয়াতে ছিল এক তাকওয়াভরা আকুতি। আয়াতগুলোও বেশ অর্থসমৃদ্ধ, সুরা আলে ইমরানের ১৯০ থেকে ১৯৪ নম্বর আয়াত, অভিভূত হয়ে শুনলাম। অবশ্য তখনো ভাবতে পারিনি যে তিলাওয়াতকারীর জীবনটা একদিন এই আয়াতের আলোকেই রঙিন হবে। সেটা ছিল ঢাকায় স্বল্পকালীন সফর, এরপর কয়েক মাসের মধ্যেই ডাক এলো ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার।

এলাম ঢাকায়। মস্ত বড় এই প্রাদেশিক রাজধানী, ফেনী যদি শহর হয়, ঢাকাকে বলতে হবে মহানগরী। পথে রাজপথে, সড়কে-গলিতে, ভবনে-ইমারতে সুশোভিত এই বিশাল শহর। ঢাকা কেন নাম হলো জানি না, আমার তো মনে হলো এখানে রাখা ঢাকা কিছু নেই, সবকিছু খোলামেলা, উন্মুক্ত। প্রাদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে আসায় আমার থাকার জায়গা ঠিক হলো প্রাদেশিক

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

অফিসের সঙ্গে ৩৭ নম্বর আগামসিহ লেনের মেসে। সেই মেসের বাদবাকি বাসিন্দারা ছিলেন সৈয়দ একরামুল হক ভাই, শেখ নুরুদ্দিন ভাই, গোলাম সারওয়ার ভাই ও মোহাম্মদ ইলিয়াস। পরে নুরুদ্দিন ভাই চলে গেলে তার শূন্যস্থানে এলেন মতিউর রহমান নিজামী ভাই, অবশ্য কিছু সময়ের জন্য সৈয়দ শাহ জামাল চৌধুরী এবং আশরাফ আলী খান ফোরকান ভাই এ মেসের বাসিন্দা ছিলেন।

আগামসিহ লেনের প্রাদেশিক অফিসে শুরুর দিনগুলো ছিল ব্যস্ততায় ভরা। এক বছর কোনো ক্লাস ছিল না, পরীক্ষায় ভালো না করায় দ্বিতীয়বার বি. এ. পরীক্ষা দেবো ঠিক করলাম। তাই ক্লাস নেই। অফিসের পাশেই থাকার ব্যবস্থা ছিল বলে যাতায়াতেও কোনো সময় ব্যয় হতো না। সকালে যেতাম আগামসিহ লেন মসজিদে ফজরের নামাজের জন্য। ইসলামী ছাত্রসংঘে এসে যেসব ভালো অভ্যাসের উৎসাহ পেয়েছি, তার মধ্যে একটি হলো মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা। এমনকি 'তাকবিরে উলা' অর্থাৎ, প্রথম তাকবিরের সঙ্গে নামাজে যোগ দেওয়ার জন্যও উৎসাহ দেওয়া হতো প্রচুর। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে হাজির হওয়াটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। অফিসে প্রকাশনী বিভাগের কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে প্রাদেশিক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অফিস সম্পাদককেও সহায়তা করতে হতো। তা ছাড়া ঢাকা সিটি শাখা থেকে সাহায্যের আবেদন আসত যথারীতি। তাই দিনটা কোথা দিয়ে যে পার হয়ে যেত আন্দাজও করতে পারতাম না। প্রায় প্রতিদিনই মফস্বলের জেলাগুলো থেকে শাখা দায়িত্বশীল ও কর্মীরা আসত দেখা করতে। আর ঢাকা শহর শাখার কর্মীরা তো লেগেই আছে সব সময়। ঢাকা শহরের হলগুলোতেও স্থানীয় শাখার কর্মসূচিতে অনেক সময় যোগ দিতে হতো। আমার স্বভাবসুলভ সামাজিকতা ও কর্মী ভাইদের অনাবিল আন্তরিকতায় গড়ে উঠত ভ্রাতৃত্বের এক অটুট বন্ধন। সংঘবদ্ধ জীবনের এটাই বোধকরি সবচেয়ে বড় পাওয়া।

ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রকাশনীর দায়িত্বশীল হিসেবে আমাকে প্রায়ই বিভিন্ন সুধীজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য যেতে হতো। তবে সাহিত্যচর্চার ঝোঁক থাকায় এমনিতেই কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আমার নিজের মধ্যেই ছিল। কবিদের মধ্যে কবি জসীমউদ্‌দীন, তালিম হোসেন এবং বিশেষ করে কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাদের বাসভবনে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। কবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে প্রথম

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সাক্ষাৎ তো করেছিলাম ফেনী কলেজের ছাত্র থাকাকালেই খুব সম্ভবত ১৯৬৪ সালে। তার কবিতা ভালো লাগত বিষয়বস্তু, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সবুজ-সজল পল্লি-বাংলার চিত্রের মনোরম প্রতিফলনের জন্য। তাকে আমার লেখা দু-একটা কবিতাও সেদিন দেখিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে পড়লেন এবং অনেকগুলো মূল্যবান উপদেশ আমাকে দিলেন। এ ছাড়া তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতার ব্যাপারে আমার মনে যেসব উৎসুক ছিল, সেসব নিয়েও আলোচনা হলো অনেক। আলোচনার একপর্যায়ে তার কলেজছাত্রী এক মেয়ে এসে যোগ দিল, নামটা খুব সম্ভবত ছিল হাসনা। কবি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে সম্ভবত প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী মওদুদ আহমদ সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ফররুখের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। আমাদের মনের জগতে ফররুখ তখন কাব্যের, সাহিত্যের এবং মুসলিম মনন ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল তারকা, নিঃসন্দেহে সে যুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। কবিতার প্রতি পঙ্‌ক্তি পাঠকের মনের কপাটে আঘাত হানত উদ্দাম জলস্রোতের মতো। শব্দচয়ন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বিষয়বস্তুতে তিনি আনতে পারতেন মরুভূমির লু হাওয়ার আমেজ। মাইকেল মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের শক্তিমান কবি সম্ভবত দ্বিতীয়টি আসেনি। তার কিছু একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অনেকেই আকুল ছিল, আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না। প্রায়ই যেতাম তার নিউ ইস্কাটনের বাসায়। দোতলার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় তার বড় পরিবার নিয়ে কবি এক অত্যন্ত সাদাসিধে দরবেশের মতো জীবনযাপন করতেন। এতে প্রাচুর্যের ছিল না কোনো চিহ্ন, কিন্তু সেই প্রাচুর্যহীন অনাড়ম্বর জীবনেও পরিচ্ছন্নতা ও আত্মসম্ভ্রমের ছিল নির্ভুল নিশানা। মনে আছে, কবির উদাত্ত গলায় কবিতা আবৃত্তি শুনতে শুনতে কত যে কাপ চা আর তার স্ত্রীর তৈরি তালের পিঠা উপভোগ করেছিলাম, তার সীমা নেই। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি কবির রচনাও তিনি তার দরাজ উদাত্ত গলায় আবৃত্তি করে শোনাতেন আমাদের। তাছাড়া চলত সাহিত্য সমালোচনার পালা। দেশ, জাতি ও মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপারে কবির গভীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আর আমাদের মতো আগ্রহী তরুণদের মধ্যেও সেই চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য ছিলেন তিনি ব্যাকুল। মাঝে মাঝে আমরা ছোটখাটো সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতাম। মনে আছে, বন্ধুবর সানাউল্লাহসহ *দিশা* নামে একটা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করার সময় কবির কাছে একটা কবিতা লিখে দেওয়ার আবদার করলাম। কবি নির্দ্বিধায় একটা কবিতা আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। দেশটাকে খোলাফায়ে রাশেদার আদলে এক সুখী-সুন্দর সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

জন্য ছিলেন তিনি সদাউদগ্র-উৎসুক; যা তার অন্য এক কবিতার ছোট্ট দুটো পঙ্‌ক্তিতে ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে:

'আউশ ধানের দেশে মদিনার রক্ত গোলাপ
নতুন আশার পূর্ণতা নিয়ে মেলবে কলাপ।'

তাই ইসলামের বিজয় ও অগ্রগতির পথে বাধা হতে পারে এমন কিছু তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। মনে আছে, মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবের লেখা তিনি পছন্দ করলেও তার একটা বইয়ের ব্যাপারে একদিন তিনি প্রচণ্ড আপত্তি করলেন— সে বইটা ছিল মাওলানার 'সুন্নাত ও বিদআত'। ওলামা মাশায়েখের সমালোচনা এবং দেশের সাধারণ ইসলামি শ্রেণির হৃদয়ে আঘাত লাগতে পারে এমন লেখা মোটেই সময়োপযোগী হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আর একবার সুধী, রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতাদের এক আলোচনা বৈঠকে তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘের সমালোচনা করে বক্তৃতা করার জন্য 'মাসিক মদিনা' সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খানের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন।

রাজনীতির অঙ্গনেও আমার যাতায়াত ছিল। নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন সর্বদলীয় বৈঠক, প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভায় প্রায়ই হাজির হতে হতো। সেই সুবাদে বহুবার জনাব নুরুল আমিনের নিউ ইস্কাটনের বাসভবনে, মৌলবি ফরিদ আহমেদ সাহেবের বাড়িতে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অফিস ইত্যাদিতে যাতায়াত করতে হতো।

বেশ কিছুদিন থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে ইসলামি চেতনার অনুপস্থিতিটা অনুভব করা হচ্ছিল তীব্রভাবে। এ সময় ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব খুররম জাহ মুরাদ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও মুরাদ ভাই ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক বহুমুখী প্রতিভা। ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির জার্নাল হিসাবে একটা উঁচুমানের বাংলা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ তার অনেক দিনের স্বপ্ন। কিন্তু সমস্যা হলো, আইয়ুব খানের বাক্‌স্বাধীনতার শ্বাসরোধকারী এই সময়ে পত্রিকার ডিক্লারেশন পাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এ ব্যাপারে খুররম ভাইয়ের সঙ্গে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। আমি বললাম, একটা অন্য উপায়ে ডিক্লারেশন জোগাড় করা যায়, তা হলো ডিক্লারেশন আছে এমন কোনো পত্রিকা যদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তার ডিক্লারেশন কিনে নেওয়া সম্ভব। খুররম ভাই বললেন, তোমার জানা যদি এমন কোনো পত্রিকার মালিক থাকেন, যারা ডিক্লারেশন বিক্রি করতে রাজি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হবেন, তাহলে আলোচনা করতে পারো। আমি বললাম, যতদূর জানি মৌলবি ফরিদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী মোহতারেমা রেজিয়া বেগমের একটা পত্রিকা আছে *পৃথিবী* নামে। এখন সম্ভবত নিয়মিত বের হচ্ছে না। তারা মাত্র কয়েক পাতা মাঝে মাঝে বের করে ডিক্লারেশন টিকিয়ে রাখছেন, ভাবি আমাকে খুব স্নেহ করেন, খুব সম্ভব চেষ্টা করলে এটা নেওয়া যেতে পারে। খুররম ভাই বললেন, ফরিদ সাহেবের বাসায় তো তোমার যাতায়াত আছে, চেষ্টা করে দেখো না, দাম যাই হোক না কেন, জোগাড় করা যাবে। চলে গেলাম একদিন ফরিদ আহমদ সাহেবের ধানমন্ডির বাসায়। ভাবি সাহেবা খুব আদর করে খাওয়ালেন। খেতে খেতে 'মাসিক পৃথিবী'র খোঁজখবর করলাম। আমার সন্দেহটা সত্য। ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবটা পেশ করলাম। ভাবি বললেন, টাকা-পয়সা লাগবে না, তুমি যদি দায়িত্ব নিতে রাজি হও তাহলে বিনা পয়সায় আমি দিয়ে দিতে রাজি আছি। তবে শর্ত হলো, পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে এবং ডিক্লারেশনটা যেন বাজেয়াপ্ত না হয়ে যায়, তার গ্যারান্টি দিতে হবে। খুশি মনে ফিরে এসে খুররম ভাইকে খবরটা দিলাম। অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে তৈরি হয়ে যাও, তোমাকেই পত্রিকার সম্পাদনা করতে হবে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! বললাম, উঁচুমানের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করার যোগ্যতা আমার নেই। আপনি যোগ্য কোনো সম্পাদক খুঁজে নিন। খুররম ভাই তিরস্কারের সুরে বললেন, তুমি খামাখা নিজের যোগ্যতার অবমূল্যায়ন করো। তুমি না কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করে। আর ঢাকায়ও সবাই তোমার সাহিত্যিক যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করে। কোনো অজুহাত চলবে না, সম্পাদনা তোমাকেই করতে হবে। খুররম ভাই যাই বলুন না কেন, আমার নিজের যোগ্যতা ও মেধার আন্দাজ আমার চাইতে বেশি আর কার ছিল? শেষমেশ নিরুপায় হয়ে অনুরোধ করলাম সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' সম্পাদক, সুলেখক, চিন্তাবিদ জনাব আব্দুল মান্নান তালিব সাহেবকে সম্পাদক করে আনুন। অমি তার সঙ্গে কার্যকরী সম্পাদক (ম্যানেজিং এডিটর) হিসেবে সহযোগিতা করতে পারি। খুররম ভাই এতেই রাজি হয়ে গেলেন। লেগে গেলাম পৃথিবী প্রকাশনার কাজে। খুব সম্ভবত যশস্বী শিল্পী হাশেম খানকে দিয়ে ডিজাইন করালাম একটা আকর্ষণীয় আধুনিক প্রচ্ছদ। কতগুলো উঁচুমানের বেশ কজন সাংবাদিক ও লেখকের দুয়ারে ধরনা দিয়ে জোগাড় করা প্রবন্ধ সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হলো 'মাসিক পৃথিবী'র প্রথম সংখ্যা। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা আকুল হয়ে তাকিয়ে ছিলেন এর প্রকাশনার জন্য। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল এটা শুধু আমাদের পরিসরেই সীমিত না থেকে সাহিত্যামোদী

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বুদ্ধিজীবী মহলেও যেন এই পত্রিকা স্থান করে নিতে পারে। ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করে প্রথম কপি দেখিয়ে অনেককে রাজি করলাম এর পরিবেশক হতে। আমাদের কর্মী ও সমর্থকদেরও উৎসাহিত করলাম পৃথিবী অফিস থেকে না কিনে তারা যেন শহরের নিউজ এজেন্সি থেকে তাদের কপি কেনেন। তাদের দেখাদেখি সাধারণ ক্রেতারাও 'মাসিক পৃথিবী' কিনতে শুরু করল। উৎসাহিত হলো নিউজ এজেন্টরা। আর একবার যে এটা কিনল, সে তাকিয়ে থাকল পরবর্তী সংখ্যা কখন বেরোবে তার পথ চেয়ে। আমি টাইম, নিউজউইকসহ বেশ কিছু বিদেশি পত্র-পত্রিকাও ঘাঁটতাম। এগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বিশেষ করে সংবাদ বিশ্লেষণমূলক আর্টিকেলগুলোর দিকে আমার নজর গেল। ভাবলাম এই মানের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর লেখা দিতে হবে। সম্পাদকের বৈঠকে প্রস্তাব করার পর সবাই জিজ্ঞেস করলেন, এই মানের লেখার লোক কই আমাদের? আশ্বাস দিয়ে বললাম, লোক আমার কাছে আছে। মনে মনে ভাবলাম, ভাই আব্দুল মালেককে এ কাজে লাগাব। আব্দুল মালেকের যোগ্যতার কিছুটা ধারণা আমার আছে। আমি জানতাম, চেষ্টা করলে উঁচুমানের লেখা তার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালেক ভাই সম্মত হলেন সাম্প্রতিক বিষয়ে লিখতে। পড়াটা ছিল আব্দুল মালেকের নেশা। শুধু যে বই পড়তেন তাই নয়, সদরঘাটে ঘুরে ঘুরে পুরোনো পত্রপত্রিকার কপি তিনি সংগ্রহ করতেন এবং গভীর মনোনিবেশসহকারে এগুলো পাঠ করে যেতেন। মনে আছে, প্রথম লেখাটা তিনি তৈরি করলেন কারাকাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র সম্মেলনের ওপর। তালিব ভাই আর আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম লেখাটা পড়ে। প্রকাশ করলাম লেখাটা, শিরোনাম দিলাম 'কারাকাসে সমুদ্র-মন্থন'। একরকম হুলস্থূল পড়ে গেল সুধী পাঠক মহলে। বেশ কজনই জানতে চাইলেন, কে এই আব্দুল মালেক? তারপর একের পর এক লিখে চললেন আব্দুল মালেক সাম্প্রতিক সংবাদ পর্যালোচনা প্রবন্ধ।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বাইশ

সারা দেশে তখন চলছিল এক উত্তপ্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, সভা-সমাবেশ, হরতাল, মিছিলে কাটত দিনগুলো। ভারতের সঙ্গে ১৭ দিনের যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ কোনো সংঘর্ষের সময় গোটা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার ব্যাপারে প্রচুর ভয় ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের নানাবিধ সমস্যার ব্যাপারে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে দাবি-দাওয়া পেশ করে আসছিলেন। ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে এক মহাজাতীয় সম্মেলন (Grand National Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আতাউর রহমান খান। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দফার আকারে দেশবাসীর সামনে পেশ হয়ে থাকে। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী পুরান ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনিও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বক্তৃতা পরবর্তী সময়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান' নামে পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধের পরে এসব দাবিদাওয়া বিভিন্ন দফার আকারে রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনগুলো পেশ করতে শুরু করে। এই দফার রাজনীতিতে যদিও আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের 'ছয় দফা' সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে, তবে ধারাক্রমিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) সাত দফা ঐতিহাসিকভাবে সর্বপ্রথম পেশ করা হয়। যুদ্ধের পরপরই সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গভর্নর হাউজে (বর্তমান বঙ্গভবন) তিনি এক বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি জনাব খায়রুল কবিরের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, অসন্তোষ ও দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে একটি সাত দফা কর্মসূচি তৈরি করেন এবং গভর্নর হাউজের সভায় এই দলিল পেশ করেন ফ্রন্টের নেতা জনাব নুরুল আমিন। পরে ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ এক

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সংবাদ সম্মেলনে জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব অলি আহাদ এই দলিল জাতির সামনে পেশ করেন। পরের মাসে ৩০ এপ্রিল তারিখে জনাব নুরুল আমিনের নিউ ইস্কাটনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ফ্রন্টের বৈঠকে এই সাত দফা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। তাসখন্দ ঘোষণার (যার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে) বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলন করেন। সম্মেলনে এনডিএফের নেতা জনাব নুরুল আমিন জনগণের সার্বভৌমত্ব ও শাসনতান্ত্রিক জটিলতার আশু সমাধান করে পূর্ব পাকিস্তানের দাবিদাওয়া পূরণের আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এমনকি ঢাকায় ফিরে এসে মুজিব তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের দাবিদাওয়া সমর্থন করার জন্য জনাব নুরুল আমিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানও একই ধরনের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং প্রতিবাদে সম্মেলন বর্জন করেন। ঢাকায় ফিরে এসে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) শেখ মুজিব এক সংবাদ সম্মেলনে তার লাহোর সম্মেলন বর্জনের কারণ বর্ণনা করেন এবং সম্মেলনের জন্য তৈরি করা দাবিগুলো জনসমক্ষে পেশ করেন। ছয় ভাগে বিভক্ত করা এই দাবিনামাই পরে ৬ দফা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ১৮ ও ১৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এই ৬ দফাকে দলের কর্মসূচি হিসেবে অনুমোদন করে। তারপর মার্চের ২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভায়ও এর অনুমোদন নেওয়া হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ছয় দফা এনডিএফের সাত দফার সাত নম্বর দফা (যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভার নির্বাচন দাবি করা হয়) বাদে বাকি অংশের হুবহু অনুলিপি মাত্র। এ ছাড়া ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে প্রধান ছাত্রসংগঠনগুলোও এমনকি আইয়ুব-মোনায়েমের পদলেহী ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনসহ (এনএসএফ) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছাত্রদের দাবিদাওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবিদাওয়া মিলিয়ে এগারো দফা ঘোষণা করে। এই এগারো দফাতেই সরাসরি ছাত্রদের দাবিদাওয়া ছাড়া বাদবাকি সব ছিল ছয় দফা ও সাত দফার অনুরূপ। আইয়ুব ও মোনায়েম খানের নেওয়া পরপর একরাশ ভ্রান্ত ও আহাম্মকিমূলক পদক্ষেপ ছয় দফার রাজনীতিকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দেয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামি আন্দোলন, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী জনমতের সপক্ষে এসে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবিদাওয়ার আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ে। অথচ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পূর্ব পাকিস্তানের দাবিদাওয়ার প্রথম আওয়াজ তোলেন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরের বক্তৃতায়। এই বক্তৃতা সেসময় জামায়াতে ইসলামী 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান' নামে একটা পত্রিকায় প্রকাশ করে। কিন্তু তা ছিল ১৯৫৬ সালের ব্যাপার। ইতোমধ্যে জনগণ সে কথা ভুলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু দেশে যখন ৬ দফার সয়লাব চলছে, তখন কারা যেন আমাদের উসকানি দিলো যে প্রধান ও সমূহ বিপদ হলো কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রর হুমকি। এর বিরুদ্ধে বিপুল জনমত তৈরি না করলে দেশ একদিন ইসলামবিরোধীদের হাতে চলে যেতে পারে। সুতরাং আমরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ চটি বই প্রকাশ করে দেশজুড়ে তা বিতরণ করতে থাকলাম। আমাদের জনমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ভুল সিদ্ধান্তের এটা একটা অন্যতম নমুনা।

৬ দফার বাণী সারা দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সর্বত্র সফর শুরু করেন। ভয় পেয়ে গভর্নর মোনায়েম খান মুজিবকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। মার্চ মাসে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার পথে একুশে এপ্রিল যশোরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ময়মনসিংহে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে সিলেট জেলগেট থেকে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর নারায়ণগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পর ৮ মে রাতে নিজ বাসভবন থেকে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি মুক্তির আদেশ পেলেও কারাগারের দরজা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে তাকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়। এই পুনঃপুন গ্রেপ্তার এবং সেইসঙ্গে পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ ব্যাপক প্রচারের ফলে জনমনে ৬ দফা ও মুজিবের পক্ষে বিপুল সাড়া জাগায়। ফলে ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়ে যায় মুজিব ও আওয়ামী লীগ। ১৫ জুন *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন গ্রেপ্তার হন এবং ১৬ জুন পত্রিকাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এখানে সম্ভবত ৬ দফা (এবং সাত দফার) সংক্ষিপ্তসার পেশ করলে পাঠকদের জন্য ব্যাপারটা বুঝতে সহজ হবে। দফাগুলো হলো—১. ফেডারেশন পদ্ধতির সরকার, ২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ৩. হয় পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা অথবা অঞ্চলগুলোর মুদ্রা পাচার না হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া, ৪. প্রদেশের হাতে কর ধার্য করার ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রদেশের ওপর লেভী (কর) ধার্য করার ক্ষমতা, ৫. বৈদেশিক মুদ্রার প্রদেশভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ ও ৬. দেশরক্ষার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

খাতিরে প্রদেশের মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া রাখার অনুমতি। দেশকে একত্রে রাখতে হলে এগুলো সম্ভবত খুব বেশি কিছু ছিল না। মনে আছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় সংহতি সমর্থক দলগুলো দুই মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে দেশকে আলাদা করার ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস দেখছিলেন। পরে বিলাতে এসে দেখলাম ব্রিটেন তার ভিন্ন প্রদেশ স্কটল্যান্ডকে শুধু ভিন্ন কারেন্সির অনুমতিই নয়, এমনকি স্কটিশ পাউন্ড নোটগুলোতে একপাশে রানির ছবি এবং অন্য পাশে উইলিয়াম মরিস, রবার্ট ব্রুসসহ বিভিন্ন ব্রিটিশবিরোধী স্কটিশ বিদ্রোহী নেতাদের ছবিও ছেপেছে। এতে যুক্তরাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি বরং দেশটাকে একসূত্রে বেঁধে রাখার এটাই সম্ভবত বুদ্ধিমান ব্যবস্থা হিসেবে এরা দেখেছেন। আমাদের দেশে না ৬ দফার প্রবক্তারা এ ধরনের কোনো উদাহরণ সে সময় দিতে পেরেছেন, না এর বিরোধীরা বিদেশ থেকে এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখে নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য পুনর্গঠন করতে পেরেছেন।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে সারাদেশে আন্দোলনের তুমুল তুফান শুরু হয়। বিরোধীদলগুলো ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় এবং পরদিন ৮ ডিসেম্বর সারা দেশে হরতাল ও আন্দোলনের ডাক দেয়। ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রতিবাদ মিছিল বের করার ডাক দেওয়া হয়। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে আমরা এক মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু সামান্য কিছুদূর না যেতেই শুরু হয় পুলিশের অবিরাম লাঠিচার্জ এবং লাল রং ছিটানোর পালা। মোনায়েম খাঁর পেটুয়া বাহিনী এতটুকুতেই থামল না, বেপরোয়া লাঠিচার্জের নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচতে অনেকেই আশপাশের দোকানে, অফিসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু সেখানে ঢুকেও জামায় পুলিশের গাড়ি থেকে ছিটানো লাল রং, দেখে দেখে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। মিছিল পুরানা পল্টনে সিটি আওয়ামী লীগ ও ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিসের সামনে পৌঁছালে হামলা হলো আমাদের ওপর। সেখানে আরও কজনসহ আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। এর আগেই পুলিশের লাঠিচার্জে আমি প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছিলাম। ডান হাত ও বাঁ পা থেকে রক্ত ঝরে পুলিশের রং ছাড়াও সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং শনাক্ত করতে পুলিশের বেশি বেগ পেতে হলো না।

গ্রেপ্তার করার পরে আমাদের নেওয়া হলো রমনা থানায়। সেখানে অফিসের পেছনে একটা বড় হাজত কামরায় ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হলো গ্রেপ্তারকৃত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মিছিলকারীদের। সেদিন বোধহয় ছিল রমজানের ২২ তারিখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়াও দীর্ঘ মিছিলের ক্লান্তি এবং তার ওপরে আঘাতের ব্যথা; স্বভাবতই শরীরটা চাইছিল কিছু বিশ্রাম। কিন্তু সেই ঘরভর্তি কয়েদিদের ভেতরে শোয়া তো দূরে থাক, পা ফেলার জায়গাও ছিল না। ক্ষতবিক্ষত হাত-পাগুলোতে রক্ত মুছে ব্যান্ডেজ লাগাবার কোনো ব্যবস্থা হলো না। কোনোভাবে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে সময় কাটাতে হলো। ইফতারের সময় কোনো ধরনের খাবারের ব্যবস্থা তো হলোই না, অনেক বলাবলির পরে একটু পানির জোগাড় হলো মাত্র। রাত বোধকরি নটা-দশটার দিকে ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতাদের একটা দল আমাকে দেখতে এলেন। এর মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ঢাকা শহর সভাপতি আব্দুল মালেক, যিনি পরে শহিদ হয়েছিলেন এবং আরও অনেকে। তারা সঙ্গে করে খাবার ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন প্রচুর। কোনোরকম নিজেও খেলাম এবং যতদূর সম্ভব আশপাশের কয়েদি ভাইদেরও শরিক করলাম। এভাবেই কাটল বাকি রাত এবং পরের দিনের সকাল। দুপুরের দিকে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানালেন, আমিসহ আরও কয়েকজনকে বিকেলের দিকে ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। সময়মতো হাতকড়া লাগিয়ে পুলিশের ভ্যানে করে পুরান ঢাকার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। কোর্টে প্রবেশ করতেই দেখি ছাত্রসংঘের অনেকেই আগে থেকে কোর্ট ভবনের ভেতরে জায়গা করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে আমাদের শুনানি শুরু হলো, আমার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে এলেন প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট এবং রাজনীতিবিদ সাইয়েদ আজিজুল হক নান্না মিয়া। শুরুতেই তিনি আদালতের কাছে আমাদের হাতকড়া পরিয়ে আনার বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন। হাকিম দেখতে চাইলেন হাতকড়া। আমরা হাত তুলে দেখালাম, সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেশ রাগের সুরে হাতকড়া খুলে ফেলার হুকুম দিলেন। নান্না মিয়া ছিলেন অত্যন্ত রসিক মানুষ, তিনি বক্তব্য শুরু করলেন এই বলে যে, 'মাননীয় আদালত, আমাদের দেশে সাধারণত শালারা ভগ্নিপতিদের গায়ে রং ছড়ায়, আমি জানি না আমার মক্কেলের সঙ্গে আইয়ুব খান সাহেবের সম্পর্কটা কী, তাদের গায়ে কেন রং ছড়ানো হলো, হাসির রোল পড়ে গেল কোর্টে, যাই-হোক পরিশেষে আমাদের তৎক্ষণাৎ জামিনে মুক্তি দেওয়ার হুকুম দেওয়া হলো। সে পর্যন্ত আমি ছিলাম ইসলামী ছাত্রসংঘের সর্বপ্রথম বন্দি। সুতরাং বেশ ঘটা করেই বন্ধুরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ছাত্রসংঘ অফিসে। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে আহত হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা

www.nagorikpathagar.org

CS CamScanner

দেওয়া হলো। আহত ডান হাতটা একটা ব্যান্ডেজে লটকে দেওয়া হলো গলার সঙ্গে। পড়লাম এক বিব্রতকর অবস্থায়। কারণ বেশ কিছুদিন তা নিয়েই ঘুরে বেড়াতে হলো চতুর্দিকে। আঘাতের পরিমাণ যত সামান্যই হোক, সংগঠনের প্রথম পুলিশি নির্যাতনের শিকার হিসেবে কর্মীদের চোখে রাতারাতি আমি হয়ে উঠলাম রীতিমতো এক আকর্ষণীয় ব্যক্তি। বিভিন্ন শাখা থেকে বক্তৃতার দাওয়াত আসতে থাকল ক্রমাগত। যাই হোক, আন্দোলনের চাপে একসময় এই উৎসাহেও ভাটা পড়তে দেরি হলো না।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তেইশ

জুলুম, নির্যাতন, গ্রেপ্তার এবং হাজারো বাধা অতিক্রম করে আন্দোলন এক জনপ্রিয়তার শীর্ষে এসে পৌঁছাল। বিরোধী দলগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করল। ৭ ও ৮ জানুয়ারি (১৯৬৯) তারিখে এক সম্মেলনে গঠন করা হলো গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি— সংক্ষেপে 'ডাক'। পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী দাবিদাওয়ার সঙ্গে গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি, বাজেয়াপ্তকৃত সংবাদপত্রগুলো পুনরায় প্রকাশনার অনুমতি ইত্যাদি দাবি যোগ করে এক নতুন আট দফা দাবি ঘোষণা করল এই সংগ্রাম কমিটি। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হলো ১৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী দাবি দিবস। ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও মিছিল-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আহত ছাত্রসভায় বিপুল ছাত্রসমাগম হলো। সভার শেষে মিছিল শুরু হলে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী মিছিলের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে বাধাদানের চেষ্টা করলে মূল মিছিল ভেঙে গেলেও খণ্ড খণ্ড মিছিল হিসেবে ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঢাকায়। রাজধানী হয়ে উঠল এক মিছিলের নগরী। এ ধরনের একটা খণ্ড মিছিল মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছালে পুলিশ ও ইপিআরের সঙ্গে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই ছাত্ররা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে দুপুর ২টা বাজার একটু আগে ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামান শাহাদাত বরণ করে। ছাত্ররা চেষ্টা করেও মেডিকেল কলেজ থেকে আসাদের লাশ ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়, এরপর মেডিকেল কলেজের সামনে তারা কালো পতাকা উত্তোলন করে এবং এক সংক্ষিপ্ত শোকসভা ও এক মিনিট নীরবতা অবলম্বন করে কর্মসূচি শেষ করে।

২১ জানুয়ারি দুপুরে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় আসাদের গায়েবি জানাজা। পুরো পল্টন ময়দান ছাত্র-জনতায় ভর্তি হয়ে যায় দুপুর থেকেই। ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জানাজার শোকসভায় ছাত্রনেতারা একে একে বক্তৃতা করেন। আমরা চেষ্টা করলাম ইসলামী ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে সংঘের পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি জনাব

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মতিউর রহমান নিজামীকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে তোফায়েলের কাছে আমাকে পাঠানো হলো, কিন্তু তোফায়েল এই প্রস্তাবে রাজি হতে অস্বীকার করল। কিন্তু কিছু পরে আবার আমার কাছে অনুরোধ করল যে জানাজা পড়াবার জন্য আমরা যেন কোনো মাওলানা সাহেবকে দিই। বললাম, কোনো অসুবিধা নেই, ছাত্রসংঘের সভাপতি নিজামী সাহেব জানাজা পড়াবেন। এদিকে নিজামী ভাইকে বললাম, জানাজা পড়ার পরে মোনাজাতে আপনি আপনার পুরো বক্তব্য দিয়ে দেবেন। ফলে তাই হলো, জানাজার পরে নিজামী ভাই লম্বা বক্তব্যে সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ইসলামী ছাত্রসংঘের ভূমিকা, আপসহীন সংগ্রামের ডাক দিয়ে বক্তৃতা করতে থাকলেন। তোফায়েল আহমেদ পাশে দাঁড়ানো আমার দিকে বারবার মুখ ফিরিয়ে ভ্রু কুঁচকাল, মোনাজাতের মধ্যে কিছু আর বলার সাহস করল না।

সভায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো ২২ জানুয়ারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে অপরাহ্ণ সাড়ে বারোটায় গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠান। ২৩ জানুয়ারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বটতলা থেকে মশাল মিছিল। সভা শেষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সারা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ল।

আইয়ুব মোনায়েমের জালেমশাহির লাঠিচার্জ, গোলাগুলি ও কারফিউর তোয়াক্কা না করে উদ্দীপ্ত সব ছাত্রসমাজ ও সংগ্রামী জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে এক দুর্বার আন্দোলনে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২৪ জানুয়ারির হরতাল রাজধানী ঢাকায় এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের প্লাবন বইয়ে দেয়। জনতার দুর্জয় মিছিলে সেক্রেটারিরা এর পাশে পৌঁছালে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী বেপরোয়া গুলি চালালে নির্মমভাবে নিহত হয় তিনজন আর আহত হয় ১৫ জন। বিক্ষুব্ধ জনতা শহিদের মৃতদেহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেয় এবং পল্টন ময়দানে যথারীতি নামাজে জানাজা আদায় করার পর জঙ্গি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। প্রতিশোধ নেওয়ার অগ্নিশপথে দীপ্ত জনতা সরকারি মালিকানার পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় আইয়ুব শাহির পা-চাটা গভর্নর মোনায়েম খান রেডিও পাকিস্তান থেকে তার স্বভাবসুলভ সাধু ভাষায় দেওয়া ভাষণে বলে, 'দুষ্কৃতকারীরা দৈনিক পাকিস্তান আপিসে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সেই জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হইল এবং রাত আটটা হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফিউ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

জারি করা হইল।' সারা পূর্ব পাকিস্তানে রেল ও অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে গেল। একে এককথায় বলা যেতে পারে পূর্ব পাকিস্তান বন্ধ। পরদিন ২৫ জানুয়ারিও কারফিউ অমান্য করে এক জঙ্গি মিছিল তেজগাঁও এলাকার নাখালপাড়ায় পৌঁছালে সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান আরও কয়েকজন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৬ তারিখ থেকে তিন দিনের জন্য হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (DAC)-এর আহ্বানে ঢাকায় গোলাগুলির প্রতিবাদে সারা পাকিস্তানে প্রতিবাদ, ধর্মঘট, মিছিল, জনসভা ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ফলে ২৭ তারিখে করাচিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ছয়জন শাহাদত বরণ করে।

বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে চিঠি লিখে জানালেন যে, ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধীদলীয় নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হতে চান। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা জানালেন যে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে তাকেও দাওয়াত না করলে তারা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। তার আগমন উপলক্ষ্যে ছাত্ররা তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান ৮ ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা করেন। দফায় দফায় বেশ কিছু রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জুলুমও চলতে থাকে। একইভাবে ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্রুদ্ধ জনতার রোষের সামনে আইয়ুব খান জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং ঘোষণা দেন যে, তার গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে শেখ মুজিব রাজি হয়েছেন। কিন্তু এতেও দেশজোড়া আন্দোলন-বিক্ষোভের বন্যা থামানো সম্ভব হলো না। গোলাগুলি ও হতাহতের মিছিলের সয়লাবে ঊর্মিমুখর হয়ে উঠল সারা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯ এবং ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিলের পরে বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন মন্ত্রীর বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। যদিও আইয়ুব খানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন জিওসি জেনারেল মুজাফফরুদ্দীন জেলখানায় মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালে তিনি বন্দি অবস্থায়ও পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য গোলটেবিল বৈঠকে হাজির হতে রাজি হন। তিনি ভেবেছিলেন খবরটা গোপন থাকবে, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যেভাবেই হোক খবরটা আর গোপন থাকেনি। খবরের কাগজে এ ব্যাপারে লেখালেখি শুরু হয়ে গেলে শেখ মুজিব বেঁকে বসেন এবং বলেন তিনি জেলখানা থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া কোনোভাবেই গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না। শেষমেশ ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। রাও ফরমান আলীর বক্তব্য অনুসারে তিনি এই উত্তাল বিক্ষোভের মধ্যে মুজিবকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নেন। অবশ্য এর আগে ১২ ফেব্রুয়ারি এক রেডিও ভাষণে আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে তিনি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। পরে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য তিনি মোনায়েম খানকেও পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। মুক্তির পর শেখ মুজিব মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে এক দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। ভাসানী মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যেতে নিষেধ করেন। তার কথায়— শোষক ও শোষিত এক টেবিলে আলোচনায় বসলে শোষকেরই জয় হয়, শোষিতের নয়। যদিও প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল আগরতলা মামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকে নিয়ে পল্টনে সংবর্ধনাসভা হবে। কিন্তু শেখ মুজিব সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়ে তার এই গৌরবে অন্যদের শরিক করতে চাইলেন না। তিনি জেল থেকে বের হয়েই আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রেসকোর্সে সভা করতে হুকুম দিলেন। ২৩ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো মুজিবের গণসংবর্ধনা। ছাত্রনেতারা তাদের ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য মুজিবকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। সম্ভবত মুজিবের স্বার্থপরতা ও আপসকামী মনোবৃত্তির আশঙ্কা করে তারা সভাতেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে মুজিবকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় প্রেসিডেন্টের গেস্ট হাউজে বসল এই গোলটেবিল বৈঠক। এতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যোগ দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী, মৌলবি ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং অধ্যাপক গোলাম আযম। ঘণ্টাখানেক বৈঠক চলার পর ঈদুল আজহার জন্য ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি করে দেওয়া হলো। ভুট্টো ও ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। তারা লাহোরের মুচি গেটে এক জনসভায় গোপনে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। ভুট্টো-ভাসানীর অনুপস্থিতিতে গোলটেবিল বৈঠকে মুজিবের মিলে গেল প্রধান স্থান। ১০ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত চলল গোলটেবিল বৈঠক। সবাই নিজ নিজ দলের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কর্মসূচি অনুযায়ী দাবিদাওয়া পেশ করলেন। মুজিবের দাবি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দিলে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে বলে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। ফলে সৃষ্টি হলো এক অচল অবস্থা। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব খান শেখ মুজিবের বিশেষ বন্ধু তথাকথিত ২২ পরিবারের অন্যতম ইউসুফ ও মাহমুদ হারুনের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। তাদের চেষ্টায় প্রেসিডেন্ট হাউজে আন্তরিক পরিবেশে আইয়ুব মুজিবের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এ প্রসঙ্গে মেজর (অব) মো. আফসার উদ্দিন তার *আমার দেখা ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ* বইতে আইয়ুবের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন: 'আন্দোলন প্রমাণ করল দেশবাসী আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে রাষ্ট্রপতি পেতে চায়। আমিও শান্তিপূর্ণভাবে বিনা রক্তপাতে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে রক্তপাত এড়াবার জন্য কোনো রাজনীতিবিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, যিনি সব রাজনীতিবিদের মনোনীত নেতা হবেন এবং তিনি অতি সহজেই দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত সব রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু শেখ মুজিব বারবার এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাই আজ তাকে বাসায় রেখে আমি সরকারি ফাইলপত্র দেখিয়ে যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে দেশের এই পরিস্থিতিতে তিনি দায়িত্ব নিয়ে দেশকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু মুজিব অত্যন্ত অসহায়ের মতোই বললেন যে ছাত্রনেতাদের নির্দেশ অমান্য করে তিনি ঢাকায় ফিরে যেতে পারবেন না। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি ছাত্রদের নেতা না ছাত্ররা আপনার নেতা? শেখ সাহেব এর কোনো উত্তর দেন নাই। আমি (আইয়ুব খান) গোপন সূত্রে জানলাম যে শেখ মুজিবুর রহমান ইতোমধ্যে দুবার গোপনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নির্বাচনের পরে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকবেন আর শেখ মুজিবুর রহমান হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই গোপন আঁতাতের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান আমার নিকট থেকে শাসনক্ষমতা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।' সামরিক জান্তাদের যে দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী ছিল এবং আইয়ুবকেও পছন্দ করত না, তারা আইয়ুব মুজিব আলোচনার প্রতি চূড়ান্ত আঘাত হানলেন এবং গোপনে মুজিবকে বললেন যে আপনি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সামনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারবেন, পেছনের দরজা দিয়ে আসতে হবে না। মুজিব এই টোপ সহজেই গিলে ফেললেন। অন্যদিকে সেনা সদর দপ্তরে এবং প্রেসিডেন্ট হাউজে কোন দিন কী ঘটছে তার সব খবরই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ভুট্টোর কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেত তার বিশেষ বন্ধু জেনারেল পিরজাদার মাধ্যমে। ফলে শুধু গোলটেবিল বৈঠকই নয়, আইয়ুব-মুজিব আলোচনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে মুজিব তড়িঘড়ি ডাকলেন এক সংবাদ সম্মেলন। এতে তিনি বিষোদ্‌গার করলেন পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণকারী নেতাদের বিরুদ্ধে। এই চারজন নেতা ছিলেন এনডিএফের জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আব্দুস সালাম খান, পিডিএমএসের সেক্রেটারি জেনারেল মাহমুদ আলী এবং মৌলবি জনাব ফরিদ আহমেদ। মুজিব বললেন, গত ২২ বছরের ইতিহাসে যে সনাতন কুচক্রী মহল গণদাবির বিরুদ্ধে চিরকাল চক্রান্ত করে এসেছে, তারা এখনো সক্রিয় রয়েছে। তিনি জনতাকে উসকে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করলেন যে এই চার নেতার বিরোধিতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি গোলটেবিল বৈঠকে পাশ করানো গেল না। ব্যস, আর যায় কোথায়, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতারা তো আগেই জাতীয় নেতাদের কোণঠাসা করার জন্য তৈরি। শেখ মুজিবের উসকানিতে এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। যে নেতারা একদিন মুজিবকে ছাড়া গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না বলে চাপ দিয়ে তার মুক্তি আদায় করেছিলেন, আজ তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন শেখ মুজিব। সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা অলি আহাদ তার জাতীয় রাজনীতি বইতে লিখেছেন: '২৩শে মার্চ ভোরবেলা ঢাকার লালমাটিয়ায় নিজ বাড়ির নিকট থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ স্ত্রী-কন্যার চোখের সামনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা মাহমুদ আলীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে ধানমন্ডিস্থ আবাসিক এলাকার ১৯ নম্বর সড়কে আটক করে রাখে এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না তাকে দিয়ে এই মর্মে বলপূর্বক এক অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিয়ে নেওয়া হয়।'

আইয়ুব খানের পোড়া কপালে জোড়া লাগার আর কোনো সম্ভাবনাই বাকি রইল না, তিনি শিগ্‌গিরই বুঝলেন এসব মলমেও কোনো কাজ হবে না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবকে জড়িয়ে তিনি তাকে জিরো থেকে হিরো বানিয়ে দিলেন। মুজিব তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। এখন ছোটখাটো পুরস্কারের দিকে তার নজর নেই। তিনি দেখছেন আরও অনেক বড় স্বপ্ন। আর সেই সঙ্গে ছিলেন চরমপন্থি ছাত্রনেতাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। রাজনৈতিক সমঝোতার আর কোনো সম্ভাবনাই বাকি রইল না। নিজের পুরোনো অভিজ্ঞতা দিয়ে আইয়ুব সহজে বুঝে ফেললেন যে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। ইয়াহিয়া খান এবং তার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সঙ্গী-সাথি পদস্থ জেনারেলরা সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করছেন। নিয়তির পরিহাস এমনই, ১৯৫৮ সালে তিনি যেভাবে হাতিয়ার দেখিয়ে ইস্কান্দার মির্জাকে গদিছাড়া করে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন, সেই হাতিয়ার আজ তার ঘাড়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। তিনি সময় থাকতেই নিজেই পদত্যাগ করে ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত করলেন। মার্চের মাঝামাঝি আইয়ুব খান মন্ত্রিসভার এক বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে তিনি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলেন এবং বললেন, সামরিক শাসন জারি করা ছাড়া দেশকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই। মন্ত্রীরা কোনো কথা বললেন না, তাকিয়ে রইলেন ইয়াহিয়া খানের দিকে। ইয়াহিয়া একাকী আইয়ুবের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন। ইয়াহিয়া আগেই বাদবাকি সামরিক জান্তার সঙ্গে পরামর্শ করে তার দাবিনামা ঠিক করে এনেছিলেন। তার শর্তগুলোর মধ্যে ছিল: উভয় প্রদেশের গভর্নরদের বরখাস্ত করতে হবে, জাতীয় পরিষদ ও দুটি প্রাদেশিক পরিষদকে বাতিল করতে হবে এবং শাসনতন্ত্র বাতিল করতে হবে। নিরুপায় আইয়ুব সব কয়টি শর্ত মানতে বাধ্য হলেন, শুধু শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সামান্য আপত্তি করলেও ইয়াহিয়া তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। আবার বিপ্লব হয়ে গেল নীরবে। মনে আছে, পরদিন ২৫ মার্চ রাত ৮টায় বকশী বাজারের পপুলার রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে বসেছি। রেস্তোরাঁর রেডিওতে জাতীয় উদ্দীপনাময় সংগীত চলছিল। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো যে এখনই একটি নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উর্দুতে ঘোষণা হলো: 'খাওয়াতিন ও হজরাত সদরে মামলুকাত'— 'ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ দেশের প্রেসিডেন্ট'। আইয়ুব ইংরেজিতে বক্তৃতা করলেন। বললেন, আমার প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটাই আপনাদের সামনে আমার শেষ ভাষণ।' তিনি বললেন, পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে, ইচ্ছামতো সন্ত্রাস ও ঘেরাও শুরু হয়েছে, প্রশাসনিক সংস্থাগুলো বিকল করে দেওয়া হয়েছে, জবরদস্তির মাধ্যমে দাবি আদায় করা হচ্ছে, সত্য কথা বলার সাহস কারও নেই। দেশের খেদমতে কেউ এগিয়ে এলে তাকেও ভয় দেখিয়ে দমন করা হচ্ছে। এই উন্মত্ততা রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।' শুনতে শুনতে মনটা তিক্ততায় ভরে গেল। মনে মনে বিড়বিড় করলাম, এসব অরাজকতা তো আপনারই নিজের হাতের অর্জন। এখন কাপুরুষের মতো পলায়ন করছেন। এই সময়ে আইয়ুব খান বললেন, 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' তীব্র বিদ্রুপের হাসি হেসে বন্ধুদের বললাম, 'হ্যাঁ, ইয়াহিয়া খানের হাতেই এখন দেশটা ধ্বংস হোক।'

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

জেনারেল থেকে জেনারেলের হাতে ক্ষমতার রদবদল হতে থাকল। আর সেই সঙ্গে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো পাকিস্তানের। ইয়াহিয়া ব্যক্তিগত জীবনে মদ্যপ ও ভ্রষ্ট চরিত্রের ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু পাকিস্তানের সব নেতাই শুরুতে অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো যাত্রা শুরু করেন। ইয়াহিয়ার প্রথমের দিনগুলোয় সেই ধরনের আলামত দেখা যাচ্ছিল। সামরিক শাসন ঘোষণা করে জাতির উদ্দেশে দেওয়া তার বেতার ভাষণে সামরিক জান্তার মতো শক্ত শক্ত হুমকি থাকলেও দুনিয়ার আর দশটা স্বৈরাচারী শাসকের মতো ইয়াহিয়া ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, গণরোষের শিকার হয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, তিনি নিজেও গণরোষে পড়লে তার নিস্তার নেই। তাই তিনি তার প্রথম বেতার ভাষণে জনগণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আমি নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষমতায় আসিনি, ক্ষমতায় থাকবার কোনো লোভও আমার নেই, তাই নিয়মতান্ত্রিক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেই আমি ব্যারাকে চলে যাব।' তিনি বলেন, 'অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার অন্য কোনো অভিলাষ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুষ্ঠু ও সততাপরায়ণ প্রশাসনব্যবস্থা সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবনধারার একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত।' মনে হলো, তিনি মানুষের পরামর্শ নিয়ে জনমত যাচাই করে সবার মতো করে সমস্যাগুলো সমাধান করতে চান। এটা কতটা খাঁটি আর কতটা মেকি, শুরুতে তা বোঝা গেল না। নিদারুণ প্রত্যাশায় জাতি দিন গুনতে শুরু করল। আইয়ুব শাহির অন্তিম দিনগুলোর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান হলো। কিছুদিনের জন্য হলেও শান্তি ফিরে এলো দেশে।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

চব্বিশ

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হলো ১৯৬৯-এর এপ্রিলে। এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে ঢাকার অদূরে ডেমরায় এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে দারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। মাত্র অল্প একটু জায়গার ওপর বয়ে যাওয়া এই টর্নেডোয় নিহত হলো হাজার খানেক মানুষ। আর আহত হলো আরও অনেকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনসেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে খোলা হলো রিলিফ ক্যাম্প। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রধান ক্যাম্পের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। একদিন সকালবেলা ১০টা-১১টার দিকে হঠাৎ সেখানে পুলিশ-মিলিটারি তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে পদস্থ কেউ আসছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও অন্য অফিসারদের সঙ্গে ক্যাম্প এলাকায় প্রবেশ করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সময় তিনি এলেন আমাদের স্টলে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। কথা বলতে গিয়ে তার মুখ থেকে ভোটকা মদের গন্ধ আসায় আমার বমি আসর উপক্রম হলো। পাকিস্তানের পোড়া কপাল, এই সাত সকালেও এভাবে মদে ডুবে থাকতে পারে এমন লোক কী করে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারে?

তবে ইয়াহিয়ার সঙ্গী-সাথিদের মধ্যে ভালো লোক কিছু ছিলেন না এমন নয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে এয়ার মার্শাল নূর খান। ইয়াহিয়ার ডেপুটির পদ ছাড়াও ক্ষমতার মূল কেন্দ্র থেকে দূরে রাখার জন্য হোক অথবা তার নিজের পছন্দের কারণেই হোক, তাকে দেওয়া হলো শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ। শুরু থেকেই মনে হলো তিনি দায়িত্বটা আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্য একটা জাতিগঠনমূলক কল্যাণকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় সফর করে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের ডেলিগেশনের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। ঢাকা সফরে এলে ইসলামী ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের এক ডেলিগেশন এয়ার মার্শাল নূর খানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বক্তব্য তার সামনে পেশ করা হলো। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন এবং বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বললেন বলে মনে হলো

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এবং জাতি গঠনের উপযোগী, ইসলামি মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তার আগ্রহের কথা আমাদের বললেন। কয়েক মাস পরে তার প্রণীত খসড়া শিক্ষানীতি প্রকাশ করার পর বোঝা গেল যে, সেই কথাগুলো শুধু আমাদের বোঝাবার জন্য নয়; বরং তার প্রণীত খসড়ায় তিনি এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সঠিকভাবে। প্রকৃতপক্ষে এককথায় বলতে গেলে তার শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ ছিল, 'Pakistan must aim at ideological unity not at ideological vacuum, it must aim at a united and integrated system of education which can impart education on common set of cultural values based on the teachings of Islam.' অবশ্যই ইসলামবিদ্বেষীদের কাছে শিক্ষানীতির এই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য বিষের মতো ঠেকল। এরপর শুরু হলো এই শিক্ষানীতির ওপর জনমত যাচাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আয়োজন করা হলো সেমিনার ও বিতর্কের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও আগস্টের ২ তারিখে এমন এক বিতর্কসভার আয়োজন করা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (NIPA) ভবনে। ইসলামী ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি আব্দুল মালেকের নাম দেওয়া হলো। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত নিতান্ত সাদাসিধে মফস্বল শহর থেকে আসা আব্দুল মালেক যেকোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবেন, এটা প্রতিপক্ষরা ধারণাও করতে পারেনি। অন্য বক্তাদের শেষে আব্দুল মালেক যখন দাঁড়ালেন, তখন সভায় বসে থাকা বিভিন্ন ছাত্রদলের নেতারা নিশ্চয়ই নাক সিঁটকাচ্ছিলেন। কিন্তু আব্দুল মালেক শুরু করতেই শ্রোতাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। নূর খানের শিক্ষা রিপোর্টের প্রধান বিষয় ছিল দেশের সংহতি রক্ষা করে এক জাতি গঠন করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে একটা কমন সেট অব ভ্যালুজ (common set of values)। কিন্তু বিপক্ষের বক্তারা যাদের মাথায় ইতোমধ্যেই বিচ্ছিন্নতার বিষ দানা বেঁধে বসেছিল, তারা এটাকে বুঝলেন, 'সিঙ্গেল সেট অব ভ্যালুজ (single set of values)' হিসেবে। ফলে প্রায় সব কজন বক্তাই এর চুটিয়ে বিরোধিতা করলেন। বললেন, এটা এক স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী মনোভাব তৈরি করবে। আব্দুল মালেক বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েই প্রথমে খণ্ডন করলেন তাদের এই ভুল। তিনি বললেন, রিপোর্টটি ভুল পড়ার কারণেই বক্তারা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সিঙ্গেল সেট অব ভ্যালুজের আমরাও বিরোধিতা করি। এ ধরনের ভ্যালুজ কায়েম করা হয় সোভিয়েত রাশিয়ার মতো স্বৈরতন্ত্রী সমাজবাদী

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেশে। এই রিপোর্টে সিঙ্গেল সেট অব ভ্যালুজের কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে কমন সেট অব ভ্যালুজ-এর কথা। শিক্ষাব্যবস্থা কী ধরনের একটা ভ্যালু সিস্টেম, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে জাতি গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। মনীষী মিল্টনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'Education is harmonious development of of body, mind and soul'. অন্য এক আমেরিকান দার্শনিক আলবার্ট রিচার্ডের (Albert Richard) উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল মালেক বললেন, আলবার্ট রিচার্ড বলেছেন, 'Three types of progress are significant, progress in knowledge and technology: progress in socialization of man and progress in spirituality. The last is the most important. A new Renaissance must come. The Renaissance in which mankind is equipped with the ethical action of the Supreme Truth and the supreme egalitarianism.' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বায়োকেমেস্ট্রির এক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের কাছ থেকে এ ধরনের অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য বাকি শ্রোতাদের কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ঠেকছিল। অবশ্য উপস্থিত শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হলে দেখা গেল প্রস্তাবের পক্ষের দল জিতে গেল। অবশ্য এ ধরনের পরাজয় সহজে মেনে নেওয়ার মানসিকতা উপস্থিত ছাত্রনেতাদের ছিল না। নিপা ভবন থেকে বেরোনোর আগেই তারা চক্রান্ত করতে শুরু করলেন কীভাবে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

যদিও এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নবঘোষিত শিক্ষানীতির ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু নিপার বিতর্কে ভরাডুবির পর তড়িঘড়ি ১২ আগস্ট তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে ডাকসুর পক্ষ থেকে এই শিক্ষানীতির ওপর আয়োজন করা হলো এক সেমিনারের। তোফায়েল আহমদ তখন ডাকসুর সহসভাপতি। ডাকসু নেতৃবৃন্দ সাব্যস্ত করলেন যে সভায় কারা বক্তৃতা করবে এটা নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শিক্ষানীতির পক্ষে কথা বলতে পারে এমন কোনো বক্তা বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রসংঘের কোনো প্রতিনিধি যাতে বক্তৃতার তালিকায় স্থান না পান, তা নিশ্চিত করার জন্যই এই আয়োজন। সেমিনারে আমাদের ভূমিকা কী হবে, এর জন্য আগের দিন বিকেলে আমরা এক পরামর্শসভায় মিলিত হলাম। ঠিক হলো যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য সুযোগ চাইব। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তোফায়েলের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য। সভার আগে কথা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বলার কোনো সুযোগই তোফায়েল দিলেন না, বললেন, অনুষ্ঠানেই কথা হবে। সে কথার ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই আমি মঞ্চে গিয়ে তোফায়েল আহমেদকে অনুরোধ করলাম যে, গণতান্ত্রিক নিয়মে বিষয়বস্তুর পক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দিকেই আলোচনা হওয়া উচিত। সুতরাং আমাদের একজনকেও বক্তৃতা করার সুযোগ দিন, যাতে করে সহজে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানটি সমাধা হয়। তোফায়েল তার স্বভাব অনুযায়ী মিষ্টি ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'দেখুন, আমি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী-সাথিরা কেউ এতে রাজি নন। সুতরাং অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ দেওয়ার কোনো উপায় নেই, আপনারা ধৈর্য ধরে শুনুন, পরে কথা বলা যাবে।' আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। বক্তৃতা শুরু হলো মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে দিয়ে। সেলিম তার বক্তৃতায় ইসলামবিদ্বেষী অগণিত মন্তব্য করে যেতে লাগল। একপর্যায়ে সে ঘোষণা দিলো, ছাত্রসমাজ চৌদ্দশ বছরের এক পুরাতন পুঁথির (কোরআন) ওপর ভিত্তি করে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে দেবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি দাঁড়িয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। বললাম, এই মন্তব্য মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত, সুতরাং এক্ষুনি উইথড্র করতে হবে। সভাপতি তোফায়েল অবশ্য আমার কথায় কোনো কর্ণপাতই করলেন না। মুজাহিদের বক্তৃতা যথারীতি চলতে দেওয়া হলো। আমি এবং আমার আরও কয়েকজন বন্ধু দাঁড়িয়ে বারবার আমাদের আপত্তি জানাতে থাকলাম। এতেও কোনো কাজ না হওয়ায় আমরা মঞ্চে উঠে গিয়ে মাইক বক্তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিলাম যে জঘন্য মন্তব্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কোনো বক্তৃতা চলবে না। প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের গুন্ডারা মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের ওপর চড়াও হলো এবং একরকম মারপিট করে আমাদের মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করল। তাদের কজন আমাকে ঘিরে ধরে মঞ্চের পাশের উইংয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। এ সময় হঠাৎ বন্ধু মাসুদ আলী মঞ্চে এসে ওদের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। মাসুদকে তার দাড়ি মুণ্ডানো, মোটা গোঁফ এবং সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি ও পাজামায় দেখতে-শুনতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের মতোই লাগত। ওদের কর্মীরা সহজেই মনে করল যে তাদের কোনো নেতাই যেন আমাকে ধরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সহজেই তারা আমাকে মাসুদের হাতে ছেড়ে দিলো। কিন্তু মাসুদ আমাকে মঞ্চের পেছনের দিকে নেওয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে নিয়ে নিচে

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

নামানোর চেষ্টা করতেই তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে আসলে ইসলামী ছাত্রসংঘের লোক। ছুটে এসে তারা আবার আমাকে টেনে-হিঁচড়ে ভেতরে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ইতোমধ্যে ছাত্রসংঘের কর্মীরা এবং মাসুদ মিলে টানাটানি করে আমাকে নিচে নামিয়ে ফেলল। আমি হলের মাঝামাঝি জায়গায় এসে হাজির হলাম। মঞ্চের ওপর থেকে তারা আমাকে লক্ষ্য করে একের পর এক চেয়ার ছুড়তে শুরু করল। কয়েকটা চেয়ার আমার মাথায় এসে পড়ল। প্রতিটা আঘাতে আমি বসে পড়লাম। চেয়ারগুলোর সিটের জায়গাটা গোল গোল হওয়ায় ওগুলো আমার মাথার ওপর প্রায় টুপির মতো এসে পড়তে লাগল। তাই সৌভাগ্যবশত এর চাপে প্রতিবার বসে পড়লেও মাথার বাইরে কোনো বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতি হলো না। সভার আয়োজকেরা এতটা প্রতিবাদ আশা করেনি এবং সম্ভবত খুব বেশি তৈরিও ছিল না। অন্যদিকে নিজেদের সামনেই আল্লাহর কোরআনের প্রচণ্ড অবমাননা সহ্য করার মতো অবস্থা ছাত্রসংঘের কর্মীদের ছিল না। তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও কোরআনের অবমাননার যথোপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য মারমুখো হয়ে আপ্রাণ প্রতিরক্ষায় লেগে গেল। ফলে প্রথম চোটে দারুণভাবে হেরে গেল কোরআনের দুশমনরা। অধিকাংশই টিএসসি হল ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল। আমরা ছাত্রসংঘের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বাদে বাকিদের হল থেকে চলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলাম। প্রায় সব কর্মীই হল ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু অতিউৎসাহী চার-পাঁচজনকে কোনোমতেই বের করা যাচ্ছিল না এবং তাদের অরক্ষিত রেখে আমরাও হল ছাড়তে পারছিলাম না। ইতোমধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে হল ছেড়ে চলে গেলেও তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। জগন্নাথ হলসহ আশপাশের হলগুলোতে ছুটে গিয়ে তারা সেখান থেকে লোহার রড, হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করল। ইতোমধ্যে দেখা গেল যে তারা টিএসসি প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছে।

কিছু সময়ের মধ্যে আমরা কর্মীদের একত্র করে টিএসসি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চতুর্দিকে তখন মারমুখী বিরোধী ছাত্রদলগুলো লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে। কোনোরকম একটা পথ করে রেসকোর্সে ঢুকে পড়লাম। আমার মাথার ওপর বারবার চেয়ারের আঘাত লাগায় যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মাথা ঘুরছিল, চোখও অনেকটা অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। সাথিরা বুঝতে পারল যে আমার চলতে অসুবিধা হচ্ছে। শাকিলসহ অন্য একজন আমার দুই দিকে দুই হাত আলগে ধরে একরকম টেনেহিঁচড়ে আমাকে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নিয়ে চলল। কিন্তু রেসকোর্সের মাঝামাঝি হিন্দু বাড়িটার কাছে আসতেই আমি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে এলে দেখলাম হিন্দু বাড়িটার ভেতরে তাদের উঠোনের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। বাড়ির মহিলারা কান্নাকাটি করছে আর আমার মাথায় পানি ঢালছে। আমি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসলাম এবং তাদের জিজ্ঞেস করলাম যে আমার বন্ধুরা কোথায়? জবাবে তারা যা বলল তার সারমর্ম হলো, আমি জ্ঞান হারাবার পর আমার সাথিরা কোন রকম আমাকে বয়ে তাদের উঠানে নিয়ে আসে। বাড়ির লোকেরা আমার দায়িত্ব নেওয়ায় এবং শত্রুদের ছুটে আসা দেখে আমাকে সেখানে রেখে তারা বাড়িটার অপর পাশ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউটের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শত্রুপক্ষ বাড়িটার প্রায় কাছাকাছি জায়গায় তাদের ঘেরাও করে ফেলে এবং লাঠি, হকিস্টিক দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এরমধ্যে দুজনকে নিদারুণভাবে আহত করে এবং সম্ভবত তারা প্রাণ হারায়। বর্ণনা দিতে দিতে বাড়ির মহিলারা কাঁদতে থাকে। এই ভীষণ বিপদের মধ্যে মনে হলো মহিলারা মায়ের জাত, স্নেহ-মমতায় ভরা তাদের মন। সেই মমতার জন্য জাতি-ধর্ম এসব মুখ্য বিষয় নয়; মানুষের সন্তান যে জাতেরই হোক, মায়েদের সন্তান। তাই এসব মহিলা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এই মুসলমান ছেলেগুলোর জন্য এভাবে প্রাণভরে কাঁদছে। আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধুদের খোঁজে যেতে চাইলাম, কিন্তু তারা কোনোমতেই রাজি হচ্ছিলেন না, কাকুতি-মিনতি করতে করতে বললেন, তুমি যেয়ো না বাবা, তারা তোমাকেও মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি কি অপেক্ষা করতে পারি! বন্ধুরা যেখানে বিপদে, তাদের খোঁজে তো আমাকে বের হতেই হবে। কোনোরকম এসব স্নেহময়ী মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির অপরদিকে বেরিয়ে পড়লাম। কেউ কোথাও নেই, যে জায়গায় আমার সাথিদের ওপর হামলা হয়েছে বলে মহিলারা বললেন, সেখানটাও খালি। ময়দান পার হয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সামনে রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। চলতে তখনো কষ্ট হচ্ছিল, তাই একটা খালি রিকশা দেখে তাতে উঠে পড়লাম। রিকশাচালক জানতে চাইল কোথায় যাব। একটু ভেবেচিন্তে বললাম, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চলো। আমি আহত হয়েছি শুনে আমাকেও অ্যাকসিডেন্ট ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলো। বাহ্যিকভাবে আমার কোনো রক্তক্ষরণ বা ক্ষতচিহ্ন ছিল না। ফলে সেখানে সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ডাক্তার-নার্সদের আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে একজন ইনটেনসিভ কেয়ারে আছেন, আরেকজন প্রাণ হারিয়েছেন। বেরিয়ে আসার পর ছাত্রসংঘের অন্য

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কর্মীদের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের কাছে শুনলাম ইনটেনসিভ কেয়ারে আছেন আব্দুল মালেক আর মারা গেছেন ভাই ইদ্রিস। মালেক ভাইয়ের তখনো সংজ্ঞা ফেরেনি। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। ইতোমধ্যে খবর এলো যে করাচি থেকে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জুম্মা খানকে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশজোড়া ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী ও অন্য ইসলামপন্থিদের মধ্যে তো বটেই, বরং সাধারণ উদারমনা বুদ্ধিজীবী মহলেও শোকের ছায়া পড়ে গেল। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ ধরনের বর্বরতার দৃষ্টান্ত এর আগে তেমন একটা ছিল না। শুধু মতপ্রকাশের অপরাধে একজন উদীয়মান প্রতিভাকে এভাবে লাঠিপেটা করে প্রকাশ্য দিবালোকে মারা যেতে পারে— এই ধারণাও কারও ছিল না। হাসপাতালে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থি ডাক্তারেরা আমাদের আহত ভাইদের সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করছিল না। আমাকে চিকিৎসা করার সময় অনেক তির্যক অপমানকর মন্তব্য শুনতে হয়েছে। গুজব রটে গেছে যে আব্দুল মালেককে এই অবস্থায়ও তারা হয় হত্যা করবে অথবা তার ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবে। তাই ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা আব্দুল মালেক ভাইয়ের কক্ষের সামনে হাসপাতালের করিডরে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করল, যাতে করে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে না পারে। অবশেষে করাচি থেকে জুম্মা খান এলেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কোনো আশার আলো দেখাতে পারলেন না। তিন দিন পরে এই অবস্থায় ভাই আব্দুল মালেক শাহাদাতবরণ করলেন। একসঙ্গে কেঁদে উঠল বাংলার ইসলাম সচেতন ছাত্র-জনতা। প্রথমে কর্তৃপক্ষ চাইছিল আব্দুল মালেকের লাশ তারা নিজেরাই তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে, ঢাকায় কোনো রকম জানাজার ব্যবস্থা যাতে না হয়। কিন্তু কর্মীরা এতে মোটেই সম্মত ছিল না। অবস্থান ধর্মঘট চলতেই থাকল। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জোহরের নামাজের পরে আয়োজন করা হলো জানাজার নামাজের। ছাত্র ছাড়াও অনেক সুধীজন জমায়েত হলেন এই জানাজার নামাজে। আব্দুল মালেকের মরদেহ দেখে অনেকেই কেঁদে ফেললেন। এই অবস্থায়ও তার চেহারায় ভাসছে যেন এক অপূর্ব সাহসী নুরের আলো। ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ তো আব্দুল মালেকের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন, লিখলেন অমর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি:

'দেখো দেখো শহীদের মুখচ্ছবি অপূর্ব অম্লান...'

তারপর শহিদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলো তার গ্রাম খোকসাবাড়িতে। আপনজনদের বুকফাটা কান্না, মাতম আর আহাজারির মধ্যে সবাই মিলে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কবরে শুইয়ে দিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শহিদ আব্দুল মালেককে।

আব্দুল মালেক সৌভাগ্যবান, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে সম্মানিত করলেন শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা দিয়ে। অথচ গন্ডগোলের সূচনা যে আমাকে দিয়ে, সেই আমি রয়ে গেলাম পেছনে, থাকলাম প্রতীক্ষায়, হয়তো-বা কোনোদিন সেই সৌভাগ্য নসিব হতেও পারে। কোরআন কারিমের আয়াতে সান্ত্বনা খুঁজলাম:

'মুমিনদের মধ্যে আছে এমন সব লোক, যাদের কেউ কেউ আল্লাহর সঙ্গে তারা যে অঙ্গীকার করেছে তা পরিপূর্ণ করে দিলো, আর অন্যরা অপেক্ষায় থাকল তাদের নির্ধারিত সময়ের, তারা মোটেই পরিবর্তন করেনি তাদের অঙ্গীকার।' (সূরা আহজাব : ২৩)

মালেক ভাইয়ের শাহাদাত নিয়ে একটা আবেগঘন প্রবন্ধ লিখলাম, দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হলো, শিরোনাম ছিল 'নক্ষত্রের অকালপতন'। মালেকের শাহাদাত শুধু ইসলামি আন্দোলনের জন্য নয়, বরং সারা দেশের জন্য ছিল একটা বিশাল মাইলফলক। সম্ভবত এ ঘটনা থেকেই শুরু হলো আগামী দিনের পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিংসার রাজনীতি। এ ঘটনা আমাদের কর্মসূচি ও কর্মপন্থা নতুন করে চিন্তা করতে শেখাল। আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীদের অভাব খুব বেশি করে অনুভব করছিল সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মীরা। অন্যান্য ছাত্রদলের মতো ইসলামী ছাত্রসংঘে পেশাগত ছাত্ররাজনীতির প্রচলন ছিল না। সাধারণত মেধাবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্ররাই এই সংগঠনে যোগ দিত। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরও নানা ছুতানাতায় বছরের পর বছর 'আদু ভাই' হয়ে ছাত্রত্ব বজায় রেখে পেশাদার রাজনীতি করার সুযোগ অথবা আর্থিক সামর্থ্য এসব ছাত্রনেতার ছিল না। ফলে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে পরিবারের জন্য অর্থসংস্থানের কাজে লেগে যেতেন। ঢাকার অত্যন্ত জটিল ছাত্ররাজনীতিতে তাই ভাটা পড়ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃত্বের। এ ধরনের একদল প্রাক্তন ছাত্রনেতা, যারা পাশ করার পর বিভিন্ন শহরে নিজ নিজ পেশায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঢাকায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এরা প্রায় সবাই অতিসম্প্রতি ছাত্রজীবন শেষ করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম হচ্ছে অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, শেখ নুর উদ্দিন, প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দুসসহ আরও অনেকে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পুরাতন নেতাদের যোগদানে কাজে এলো নতুন বেগ, কর্মকৌশলেও এলো পরিবর্তন। সংঘর্ষ এড়িয়ে নিজেদের কাজের গতি বাড়িয়ে নেওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া হলো। তাছাড়া মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা নিরপরাধ নির্যাতিত পক্ষ হিসেবে ছাত্রসংঘের জন্য একটা দরদভরা আকর্ষণও জাগাল নিরপেক্ষ ছাত্রদের মধ্যে। ঠিক করা হলো, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নতুন করে দাওয়াতি অভিযান শুরু করা হবে। গুন্ডামি ও মাস্তানির পরিবর্তে সুশীল সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার যে কাজ ইসলামি ছাত্রসংঘ করছে, তার পরিচয় নিয়ে হাজির হতে হবে ছাত্রসমাজের সামনে। এতে সাড়াও পাওয়া গেল প্রচুর, দলে দলে নতুন ছাত্র ভাইয়েরা যোগ দিলো ইসলামি ছাত্রসংঘে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পঁচিশ

শরীর কিছুটা ভালো হওয়ার পরে সংগঠন ও সাংবাদিকতার কাজে দ্রুত মনোনিবেশ করতে হলো। প্রায় এই সময়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল *দৈনিক সংগ্রাম*। ইসলামি আন্দোলনের সমর্থনে প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমির মতো *দৈনিক সংগ্রাম*-এর প্রধান কার্যনির্বাহক ছিলেন খুররম জাহ মুরাদ। একদিন তাকে বললাম, *সংগ্রাম* প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, আমি ঠিক করেছি এতে চাকরির আবেদন করব। একরকম নির্লিপ্তভাবে মুরাদ ভাই জবাব দিলেন, 'করতে পারো, আমি দরখাস্তটা ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেব।' আশ্চর্য হয়ে বললাম, সে আবার কেমন কথা! আপনি তো আমার দরখাস্ত অনুমোদন করার কথা, ফেলে দেওয়ার কথা নয়। মুরাদ ভাই হেসে জবাব দিলেন, *সংগ্রাম* তো তোমার জন্য নয়, তোমাকে আল্লাহ যে যোগ্যতা দিয়েছেন, তা দিয়ে তুমি যেকোনো জাতীয় দৈনিকে চাকরি পেতে পারো। বললেন, *সংগ্রাম*-এর সঙ্গে একই দিনে *পূর্বদেশ*ও দৈনিক হিসেবে বেরোচ্ছে, তুমি *পূর্বদেশ*-এর দরখাস্ত করো। তখন জাতীয় দৈনিকগুলোতে বামপন্থি ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। অন্য চিন্তাধারার কেউ এ ধরনের সংবাদমাধ্যমে স্থান পাবে— এ কথা চিন্তার বাইরে ছিল। তবু মুরাদ ভাইয়ের আদেশে দরখাস্ত করতে হলো। ভাবছিলাম ইন্টারভিউ পাব না। কিন্তু না, ইন্টারভিউতে যাওয়ার ডাক এলো, মৌখিক ও লিখিত দু-রকমের পরীক্ষাতেই ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলাম বলে মনে হলো। সম্পাদক মাহবুব ভাই বলেই ফেললেন, তুমি ইন্টারভিউতে প্রথম হয়েছ। মাহবুব ভাই ফেনীর মানুষ, রেলওয়ে শ্রমিক নেতা হিসেবে ফেনীর রাজনীতিতে আগে থেকেই আমাকে চিনতেন। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের কর্তাদের পছন্দ-অপছন্দ এড়িয়ে আমাকে নিয়োগ দিতে পারবেন এমনটা মনে হলো না। যা ভাবছিলাম তাই হলো। *পূর্বদেশ*-এ চাকরি পেলাম না। বিফল মনোরথ হয়ে মুরাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম, কিন্তু মুরাদ ভাই অত সহজে হার মানার লোক নন। বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম। যাই হোক, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমি জানি পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব তোমার দেশের মানুষ এবং আত্মীয়, তার সঙ্গে দেখা করো এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আলোচনা করো। হামিদুল হক চৌধুরী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংবাদজগতে একটা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকার মালিক; এর মধ্যে ছিল ইংরেজি দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার*, সাপ্তাহিক (ও পরে দৈনিক) *পূর্বদেশ* এবং সিনেমা পত্রিকা *সাপ্তাহিক চিত্রালী*। এসব পত্রিকা এবং চৌধুরী সাহেবের অন্যান্য ব্যবসার কেন্দ্র ছিল মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার শুরুতেই বিশাল অবজারভার হাউজ ভবন। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রই নিজ নিজ পরিসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছিল। সাংবাদিকতার মানে এবং প্রকাশনার আধুনিকতায় প্রতিটি পত্রিকায় আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার দাবি করতে পারত। আর পাঠকসংখ্যা অন্য যেকোনো সমমানের পত্রিকা থেকে ছিল অনেক বেশি। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুস সালাম সাহেব। দৈনিক *পূর্বদেশ* সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো মাহবুবুল হক সাহেবকে। মুরাদ ভাইয়ের প্রস্তাবে একটু অসুবিধায় পড়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম, হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব আত্মীয় বটে, সম্পর্কে আমার দাদা হন। তবে অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি, আমি একরকম অভ্যাস করে নিয়েছিলাম ধনী আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকতে। ঢাকায় এসেছি এত দিন, একবারও তার বাসায় যাইনি। হঠাৎ করে এখন চাকরির উমেদারি করতে তার বাসায় যাওয়াটা কতটা শোভন হবে, তা নিয়ে ইতস্তত করছিলাম। আশ্বাস দিয়ে মুরাদ ভাই বললেন, দেখো চাকরি তোমার হলেও প্রয়োজনটা তোমার চেয়েও বেশি ইসলামি আন্দোলনের, সুতরাং আমার সুচিন্তিত মত যে তোমার যাওয়াই প্রয়োজন। ভাবলাম, আমার কাছে যতই অস্বস্তিকর মনে হোক না কেন, এ যাত্রা নিস্তার নেই, যেতেই হবে। তাই একদিন বিকেলে হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের গ্রিন রোডের বাসভবনে গিয়ে হাজির হলাম। গেটে দারোয়ানকে আমার পরিচয় দিয়ে খবর দেওয়ার জন্যে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোয়ান ফিরে এসে বলল, আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন। একতলার পেছনের বারান্দায় হামিদুল হক চৌধুরী বিকালের চা খাচ্ছিলেন। আব্বার নাম শুনেই একরকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন, হাঁক দিয়ে ডাকতে শুরু করলেন তার স্ত্রীকে। দেখো দেখো কে এসেছে। ভদ্রমহিলা তাড়াহুড়ো করে এসে হাজির হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, বাসু মিয়ার (আব্বার ডাকনাম 'বাদশা মিয়া'র সংক্ষিপ্ত) ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছে এত কাল পরে। পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি ঢাকায় এসেছ প্রায় তিন বছর, অথচ কোনো দিন আমাদের বাসায় আসোনি কেন? কোনোরকম কাঁচুমাচু করে একটা চলনসই জবাব দিয়ে নিস্তার পেলাম। বললেন, এখন থেকে নিয়মিত যাওয়া-আসা করবে। তারপর জানতে চাইলেন, আমি কোনো

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি কিনা তার কাছে। ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমি সাংবাদিকতায় যোগ দিতে আগ্রহী, *পূর্বদেশ*-এ চাকরির দরখাস্ত দিয়েছিলাম, ইন্টারভিউ দিয়েছি এবং ভালো করেছি বলেও আমাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু চাকরিটা পাইনি। হামিদুল হক চৌধুরী ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, তার পত্রিকাগুলোতে কারা প্রভাব বিস্তার করে আছে, সে সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। বললেন, হুঁ, ঠিক আছে, কাল সকাল ১০টার দিকে অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। পরদিন আমি যাওয়ার আগেই চৌধুরী সাহেব পত্রিকার ব্যবস্থাপনা বৈঠকে বসে গিয়েছিলেন। অপেক্ষা করতে হলো অনেকক্ষণ। সভাশেষে বেরিয়ে নিজের কামরা যাওয়ার পথে আমাকে দেখে তিনি বললেন, এতক্ষণে তুমি এসেছ? বললাম, আমি আগেই এসেছি, তবে বৈঠক আমি আসার আগেই শুরু হয়ে গেছে। হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব আমার হাত ধরে আবার ফিরে গেলেন *পূর্বদেশ* সম্পাদক মাহবুবুল হক সাহেবের কামরায়। বললেন, দেখো মাহবুব, আমার নাতি *পূর্বদেশ*-এ চাকরি করতে চায়। ব্যস, আর যায় কোথায়, মাহবুবুল হক সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে বললেন, তার তো চাকরি হয়ে গেছে, সে ইন্টারভিউ দিয়েছিল এবং প্রথম হয়েছে। তার চাকরির কোনো অসুবিধা নেই। চৌধুরী সাহেব যাওয়ার পরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই মাহবুব ভাই নিয়োগপত্র তৈরি করে এনে দস্তখত করে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। ব্যস, *পূর্বদেশ*-এর সাংবাদিক হয়ে গেলাম।

প্রথমেই যোগ দিতে হলো সাংবাদিকতার আঁতুড়ঘর নিউজ ডেস্কে সাব-এডিটর বা সহ-সম্পাদক হিসেবে। একটা মস্ত বড় টেবিলে একজন সিনিয়র সাব-এডিটর শিফট ইনচার্জ হিসেবে বসতেন। তার চারপাশে আমরা সাত-আটজন আনকোরা শিক্ষানবিশ সাংবাদিক বসতাম। পাশের টেলিপ্রিন্টার গ্রামের হাটের ধান চোরাবার মেশিনের মতো একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ করে করে প্রসব করতে থাকত গজের পর গজ সংবাদের প্রিন্ট আউট। এসব পাঠাত রয়টারস, এপিপি, এএফপি, পিপিআইসহ দুনিয়ার আরও অনেক প্রথিতযশা সংবাদ এজেন্সিগুলো। অফিসের পিয়নরা কিছুক্ষণ পরপরই এসব প্রিন্ট আউট কেটে এনে শিফট ইনচার্জ সাহেবের হাতে দিত। তিনি এগুলো কেটে আলাদা আলাদা করে মোটামুটি একনজর চোখ বুলিয়ে আমাদের প্রত্যেককে এর একাংশ ভাগ করে দিতেন। আমাদের কাজ ছিল এগুলোর সারমর্ম উদ্ধার করে সংবাদ তৈরি করা। যদিও এতে অনুবাদ প্রধান কাজ ছিল, কিন্তু অনুবাদের পরেও সংবাদটা নিজেদের পছন্দমতো তৈরি করা যেত, তৈরি হয়ে গেলে এর ওপরে একটা জুতসই শিরোনাম দিয়ে সংবাদটা শিফট ইনচার্জ মহোদয়ের হাতে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেওয়া হতো। তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করে তা কম্পোজিং সেকশনে পাঠিয়ে দিতেন। শিরোনাম তৈরি করাও শেখানো হতো, কী করে অল্প কয়টা শব্দে মূল সংবাদটা পাঠকের কাছে পেশ করা যায়। তারপর অবশ্য সূচনার দু-চার লাইনে সংবাদের মূল বক্তব্যটা এবং এরপর দেওয়া হতো এর বিস্তারিত বিবরণ। সংক্ষেপে এই ছিল সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। সকাল ৯টা থেকে রাত প্রায় ১২টা-১টা পর্যন্ত পুরো দিনটাকে পাঁচ পাঁচ ঘণ্টার তিন শিফটে ভাগ করা ছিল। বার্তা সম্পাদক সাহেব সপ্তাহের শুরুতে কে কোন শিফটে কোন দিন কাজ করবে, তার তালিকা দিয়ে দিতেন। এজন্য আমাদের অফিসের সময়ের নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না, শিফটের সময় অনুযায়ী হাজির হতে হতো। রাত বেশি হলে পত্রিকার মাইক্রোবাসে করে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হতো। আমাদের তিনজন শিফট ইনচার্জের মধ্যে ছিলেন কামাল লোহানী, গোলাম মোস্তফা এবং সুফি মোতাহার হোসেন। বার্তা সম্পাদক ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। রিপোর্টিং বিভাগে চিফ রিপোর্টার ছিলেন ফয়েজ আহমদ সাহেব আর তার সঙ্গে সহকারী বার্তা সম্পাদক ছিলেন সেলিম উল্লাহ, আব্দুর রকিব এবং একজন জুনিয়র রিপোর্টার আবুল মঞ্জুর। নিউজ ডেস্কে কাজ করতে করতে উপসম্পাদকের কাজটা সহজেই রপ্ত করে নিলাম।

জানুয়ারির মাঝামাঝি দেশে নির্বাচনের আশায় রাজনীতির পরিবেশ অনেকটা গরম হয়ে উঠল। বিভিন্ন দল পল্টন ময়দানে জনসভা করে নিজেদের অবস্থিতির জানান দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে লাগল। কিন্তু বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ সহজে কাউকে মাঠে দাঁড়ানোর অধিকার দিতে রাজি ছিল না। ফলে প্রায় সব কটি সভায় আওয়ামী লীগের হামলায় তারা ময়দানে টিকতে পারছিল না।

জানুয়ারির শুরু থেকেই প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করার অনুমতি দিলো সামরিক কর্তৃপক্ষ। দোসরা ফেব্রুয়ারি পিডিপি সর্বপ্রথম পল্টন ময়দানে জনসভা আহ্বান করল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তার ফ্যাসিবাদী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ কোনোমতেই নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো দলকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে অস্বীকার করল। শুরু হলো আওয়ামী কায়দায় জনসভার ওপর হামলা। পিডিপির নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম তার অসামান্য আইনজীবী প্রতিভা ব্যবহার করে জেরা ও জবানবন্দির সাহায্যে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। অথচ সেই আব্দুস সালাম সাহেবকেও কথা বলার অনুমতি দিতে মুজিবের আওয়ামী লীগ রাজি হলো না। বেলা আনুমানিক সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত বিপুল গন্ডগোল ও বাধা সত্ত্বেও পিডিপির সাহসী নেতারা বারেবারে মাইকে এলেন এবং গোলযোগ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

থামাবার জন্য বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। পিডিপি নেতা মৌলবি ফরিদ আহমদ, জনাব ফজলুল হক, জনাব এ এস এম সোলায়মানসহ আরও বেশ কিছু নেতা আহত হলেন। প্রবীণ নেতা জনাব নুরুল আমিন শেষ পর্যন্ত ময়দানে উপস্থিত হতে পারেননি। চিৎকার, স্লোগান, হল্লাচিল্লা করে দুষ্কৃতকারীরা সভাকে প্রায় অচল করে দিলো। পুলিশ কোনোরকম সভামঞ্চের একপাশে ঘেরাও দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাঠের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু গন্ডগোল থামাবার জন্য তারা কোনো পদক্ষেপই নিল না। আক্রমণকারীদের বর্বর হামলা সত্ত্বেও পিডিপির নেতাকর্মীরা অশেষ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। আওয়ামী লীগের এই জঘন্য হামলা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পিঠে ছুরিকাঘাতের মতোই এসে লাগল। শুরু হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে চরম অরাজকতা।

শুধু পিডিপির সভা নয়, আওয়ামী লীগ যেন সিদ্ধান্ত করেই বসল যে, সামরিক সরকার সাধারণ রাজনীতির অনুমতি দিলেও আওয়ামী লীগ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে জনসভা, জমায়েত ও সমাবেশ করতে দেবে না।

১৮ জানুয়ারি ছিল জামায়াতে ইসলামীর জনসভা। এই সভায় যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। সভার আগের দিন পশ্চিম পাকিস্তানের আরও অনেক বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে একই বিমানে তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন। বিমানবন্দরে শত শত যুবক ও জামায়াত-কর্মী মাওলানাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। আগ্রহের আতিশয্যে তাদের অনেকে রানওয়েতে নেমে পড়ল আর স্লোগান দিতে দিতে অনেকটা বিমানের সিঁড়ির কাছে হাজির হলো। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক নেতাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে তারা বাঁধনহারা উত্তাল তরঙ্গের মতো স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তুলল বিমানবন্দর: 'শতাব্দীর মুক্তিদূত মাওলানা মওদূদী', 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মাওলানা মওদূদী'।

তবে এই বিপুল সংবর্ধনা বোধ হয় আওয়ামী লীগকে ভাবিয়ে তুলল এবং আওয়ামী লীগের হিংসার আগুনে ঘৃতাহুতির কারণ হলো। তারা প্রস্তুত হতে লাগল পরদিনের পল্টনের জনসভা ভন্ডুল করার ষড়যন্ত্র। বেশ আগে থেকেই গুজব শোনা যাচ্ছিল যে আওয়ামী লীগ সভা ভেঙে দেওয়ার বিস্তারিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। একটা কথা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল যে ঘটনাটা শুধু তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এক অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ ছাড়া কিছু ছিল না। এটা ছিল অনেকটা উপকূল অঞ্চলের লাঠিয়ালদের চর দখলের হামলার মতো। এই পরিকল্পনায় শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বরং সরকারের অভ্যন্তরে পদস্থ কর্মকর্তারা এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষও জড়িত ছিল। পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়ায় প্রমাণ মিলল, গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে মধ্যম স্তরের বেসামরিক এমনকি সামরিক অফিসাররা আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্তারিত নীলনকশা প্রস্তুত করেছে। এর প্রমাণ মিলেছে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত তৎকালীন মার্শাল ল'র সিভিল অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের ডাইরেক্টর রাও ফরমান আলীর আত্মজীবনী থেকে। তিনি লিখেছেন কীভাবে সেদিন মার্শাল ল'র মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের বাঙালি ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হক (বর্তমানে প্রয়াত) পারিবারিক একটা জরুরি কাজের বাহানা দিয়ে কৌশলে রাও ফরমান আলীকে তার নিজের পরিবর্তে পররাষ্ট্র দপ্তরের এক জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে ইসলামাবাদে যাওয়ার অনুরোধ করেন। যাতে করে জামায়াতে ইসলামীর সভায় হামলার ব্যাপারে গভর্নরকে অন্ধকারে রেখে কাজ সমাধা করা যায়। কার্যত হয়েছেও তাই। কিন্তু ইসলামাবাদে বসে রাও ফরমান আলী জামায়াতের জনসভা লন্ডভন্ড করে দেওয়ার খবর শুনে ভাবলেন এটা আগাগোড়াই একটা ছক অনুযায়ী সুপরিকল্পিত ছিল এবং এ কারণেই মাজেদুল হক তাকে ইসলামাবাদে পাঠিয়ে নিজে জনসংযোগের দায়িত্বটাও নিয়ে প্রহরারত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি।[৯]

এর আগের দিন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট এক শকুনের ছবিতে মাওলানা মওদূদীর চেহারা লাগিয়ে ছাপা হলো বিশ্রী এক কার্টুন। দেখানো হলো শকুনটা উড়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তানে। রাস্তায় রাস্তায় আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনী জনসভা প্রচারের পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলল। আর সেই জায়গায় নতুন করে সেঁটে দিলো জামায়াতবিরোধী নতুন পোস্টারের সারি। নির্ধারিত সময়ে সভা শুরু হতেই চারদিক থেকে শুরু হলো অবিরাম ইট-পাটকেল ও ঢিলের বৃষ্টি। জামায়াতের কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করল আত্মরক্ষা করতে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা পল্টন ময়দান রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। আরেকবার গণতন্ত্রের খোলসে অমানবিক রাজনৈতিক বর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আওয়ামী লীগ।

---

৯. রাও ফরমান আলী, *ভুট্টো, শেখ মুজিব, বাংলাদেশ*। পৃ. ৫৮-৫৯।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অবশ্য জামায়াতের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা এ ধরনের সর্বাত্মক হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিরোধীরা লাঠিসোঁটা, ছুরি-চাকু ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উপায় না দেখে কয়েকজন ভাই বিশেষ করে বিশাল সুঠামদেহী খলিলউল্লাহ ভাই প্রচণ্ড বিক্রমে ময়দানের রাস্তার পাশের দেয়ালের ওপর উঠে সেখান থেকে উদাত্ত গলায় হাঁক ছেড়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৌড়াতে থাকলেন। তার দেখাদেখি আমরা কজনও একইভাবে হেঁড়ে গলায় ডাক দিতে দিতে ময়দানের ভেতরে দৌড়াতে থাকলাম এই আশায় যে, হয়তো আমাদের হাঁকডাকে দুশমনরা কিছুটা পিছু হটে যাবে। কিন্তু এতে ফল হলো না কিছুই। অসহায় নিরস্ত্র শ্রোতা ও কর্মীরা একতরফা বেধড়ক মার খেতে লাগল। কিছু কর্মী প্রাণ বাজি রেখে মঞ্চের চতুর্দিক ঘিরে রাখল, যাতে দুষ্কৃতকারীরা মঞ্চে উঠে নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা চালাতে না পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পরদিনের আওয়ামীপন্থি অধিকাংশ সংবাদপত্র এমনভাবে এই হামলার খবর দিলো, যা পড়ে মনে হবে জামায়াতে ইসলামীই নিজেদের জনসভায় হামলা চালিয়ে নিজেদেরকেই হতাহত করেছে। এই ছিল আমাদের দেশের সাংবাদিকতার নমুনা।

ভাগ্য ভালো যে মাওলানা মওদূদী সভায় হাজির হওয়ার আগেই গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। জামায়াতের নেতারা খবর পাঠিয়ে অর্ধেক পথ থেকেই মাওলানার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেন। সভা লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার পর আহত-নিহতসহ অসংখ্য নেতাকর্মী পল্টনের মসজিদে আশ্রয় নিলেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা আহতদের যতটা সম্ভব সেবা-শুশ্রূষার চেষ্টা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মসজিদে এলেন এবং অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি তখন মসজিদের বারান্দায় ছিলাম। কর্মীরা আইজি সাহেবকে আমার কাছে নিয়ে এলো। তার বক্তব্য শুনে আমি বললাম, কেন আপনি প্রফেসর গোলাম আযম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান? আইজি বললেন, গভর্নর আহসান আমাকে পাঠিয়েছেন প্রফেসর সাহেবকে নিরাপদে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে। মেজাজটা তো আগেই খারাপ হয়ে ছিল, এবার আর সহ্য হলো না, আমি বিদ্রূপের হাসি হেসে বললাম, প্রফেসর সাহেবকে কি আপনি আওয়ামী লীগের নেতা পেয়েছেন যে তিনি অসহায় কর্মীদের এখানে ফেলে আপনার গভর্নরের দাওয়াতে একা একা বাসায় যাবেন? এতক্ষণ গুন্ডারা ময়দানে জনসভার ওপর যে বর্বর হামলা চালাচ্ছিল আর আপনার পুলিশ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেখছিল, তখন কোথায় ছিল আপনার গভর্নর আহসান? বেচারা কাকুতি-মিনতি করে আমাকে রাজি করালেন তাকে প্রফেসর সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে। ভিড় ঠেলে কোনো রকম মসজিদের ভেতরে প্রফেসর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। আইজির প্রস্তাব শুনে তিনিও ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, আপনার গভর্নরকে গিয়ে বলুন যে জামায়াতের একজন কর্মীকেও নিরাপত্তাহীনতায় রেখে গোলাম আযম বাসভবনে যাবে না, আমাকে পৌঁছাবার আগেই এখানে যারা আটকা পড়ে আছেন, তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। বিফল মনোরথ হয়ে বেচারা আইজি বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে আমাকে বললেন যে দেখুন, এখানকার সবাইকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কয়েকটা বাস এনেছি, তবে আমাকে একটু মেহেরবানি করুন, এত লোককে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া তো সম্ভব হবে না, কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গা বলুন, যেখানে তাদের নামিয়ে দেওয়া যায়। কিছুটা পরামর্শ করে কয়েকটা জায়গার নাম তাকে দিলাম এবং সবাই বাসে গিয়ে উঠলে তিনি আবার অনুরোধ করলেন, বাসগুলো ছেড়ে যাওয়ার আগে অধ্যাপক সাহেবকে গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করুন। সেই নিদারুণ বিপর্যয়ের দিনেও প্রফেসর গোলাম আযম সাহেব ইসলামি নেতৃত্বের যে অপূর্ব উদাহরণ পেশ করলেন, চিরদিনের জন্য তা আমার মনে মুদ্রিত হয়ে থাকল।

লন্ডনের বিখ্যাত *দৈনিক টাইমস* পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক বর্তমানে প্রয়াত প্রফেসর রাসব্রুক উইলিয়ামস সেদিন সস্ত্রীক ঢাকায় ছিলেন। পরে তিনি পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় এই বর্বর হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ এই যে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির সূচনা করলেন, এর শিকার একদিন তিনি নিজেই হন কিনা, বলা যায় না। সেই একদিন আসবে মাত্র পাঁচ বছর পরে, আর দৈববাণীর মতো এই মন্তব্য যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, তা কে জানত!

তবে সত্তরের জানুয়ারি মাসে পিডিপি ও জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় হামলা শেখ মুজিব ও তার দলের হিংস্র সন্ত্রাসের রাজনীতির প্রথম নমুনা মনে করলে ভুল করা হবে। দেশের নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের রাজনীতি আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই শুরু করেছিল।

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং দলের সভাপতি মাওলানা ভাসানী পদত্যাগ করেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এরপর পুর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক দল ও পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে নিয়ে একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকার রূপ মহল সিনেমা হলে এক মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সীমান্ত গান্ধী খান, আবদুল গফফর খান, তার পুত্র ওয়ালী খান এবং মিয়া ইখতেফার উদ্দিনসহ বেশ কিছু নেতা ঢাকায় আসেন। আওয়ামী লীগের কর্মীরা বাস বোঝাই হয়ে এসে সম্মেলনের ওপর বেপরোয়া হামলা চালায়। কিন্তু হামলা সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের ঘোষণা দিয়ে দিলেন। পরদিন পল্টন ময়দানে এই নতুন দলের জনসভা আহ্বান করা হলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের সশস্ত্র হামলাকারীরা সেখানেও সমবেত জনতা ও নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা চালিয়ে চতুর্দিকের বিশাল এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত করল। অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও নেতা-কর্মী বেধড়ক মার খেয়ে রক্তস্নাত হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে বাধ্য। জননেতা অলি আহাদ এ সম্পর্কে লিখেছেন, সম্মেলন বানচাল করার এই ব্যর্থ প্রয়াসে সরকারি শাসনযন্ত্রের প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে চিরাচরিত হীন পন্থায় আওয়ামী লীগ ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনী ব্যবহার করল।[১০]

একজন বিদেশি সাংবাদিক হারভে স্টকটন ১৯৫৭ সালের এ ঘটনার সময় ঢাকায় ছিলেন। তিনি মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর একটি প্রতিবেদনে লেখেন কীভাবে সেদিন শেখ সাহেব নিজেই এই হামলার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, পল্টনের ন্যাপের জনসভায় হামলার পরদিন শেখ মুজিব এক প্রেস কনফারেন্স করেন। সেখানে আমি শেখকে প্রশ্ন করলাম, গত রাতে ঢাকার প্রধান সিনেমা হলের পেছনে আপনি গুন্ডাদের কী বলেছিলেন? তিনবার প্রশ্ন করার পরও শেখ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন এই বলে যে, তিনি আমার ইংরেজি বুঝতে পারেননি।[১১]

পঞ্চাশের দশকের রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী জনাব হাসিম উদ্দিন আহমেদ এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেছেন কীভাবে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সংসদ ভবনের ভেতরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাংসদরা ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী সাহেবকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা

---

১০. *জাতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫-৭৫। পৃ. ২৮৩।

১১. শেখের ট্র্যাজেডি-হারভে স্টকটন-ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ-হংকং, ২৯ আগস্ট ১৯৭৫।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করেছিলেন। কীভাবে শেখ মুজিব সংসদের শান্তি আনার চেষ্টা করার বদলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন এবং হান্টার হাতে চিৎকার করতে করতে স্পিকারের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। অন্য এক সদস্য মুজিবের হাত থেকে হান্টার কেড়ে নিলে মুজিব একটা চেয়ার নিয়ে স্পিকারের দিকে তেড়ে গেলেন। অন্য এক আওয়ামী সদস্য পেপারওয়েট ছুড়ে মারলেন স্পিকারের কপালে। শাহেদ আলী সাহেবের কপাল ফেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিন দিন পর তিনি ইন্তেকাল করলেন। কিন্তু সেই সন্ত্রাসে শুধু স্পিকার শাহেদ আলীর কপালই ফাটল না, ফাটল পাকিস্তানের কপালও। এই হাঙ্গামার অজুহাত দিয়ে মাত্র দুই সপ্তাহ পরেই ৮ অক্টোবর ১৯৫৮ আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলেন।[১২]

ছয় মাসের উমেদারি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞতার বিচারে কাকে কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা যায় তার সিদ্ধান্ত নিতে বসল। ভাবছিলাম হয়তো সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে নিয়োগ পেলেও পেতে পারি। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেদিন এলো, সেদিন অফিসে ঢুকে দেখি একরকমের গুমোট অথচ চাঞ্চল্যভরা আবহাওয়া বিরাজ করছে। নিউজ ডেস্কে গিয়ে বসতেই শিফট ইনচার্জ কামাল লোহানী ভাই বললেন, এখানে নয়, তোমার প্রমোশন হয়েছে, রিপোর্টিং বিভাগে গিয়ে বসো। রিপোর্টিং বিভাগে এসে চিফ রিপোর্টার ফয়েজ ভাইয়ের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি মুখ নিচু করে কিছু কাজ করছিলেন, আমার দিকে তাকালেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখ তুলে বললেন, রিপোর্টিং ডেস্কে গিয়ে বসো। রিপোর্টিং ডেস্কে সলিমুল্লাহ ভাই ও রকিব সাদরে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে আমার দ্বিতীয় সহসম্পাদক আতিকুর রহমানও এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুঝলাম, প্রমোশন আমার একা হয়নি, আমাদের দুজনকেই সাব-এডিটর থেকে স্টাফ রিপোর্টারে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পুরো তিন ঘণ্টার শিফটে চিফ রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ সাহেব একবারও আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন না। একরকম মাথা নিচু করে সমস্ত সময়টা কাটালেন। শুধু দুপুরের খাবারের বিরতির সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, এখন যাও, বিকেলে এসো, তখন সলিমুল্লাহ কাজ বুঝিয়ে দেবে। মনে হলো আমাদের পদোন্নতিতে সবাই খুশি হতে পারেননি। বিকেলে সলিমুল্লাহ ভাই আমাদের তিনজনকে নিয়ে আলাদা আলাদা বসলেন এবং রিপোর্টারের কাজের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর সিনিয়রদের

---

১২. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ এপ্রিল ১৯৯৮।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সঙ্গে বসে তারা কীভাবে রিপোর্ট তৈরি করছেন তা দেখতে বললেন। ফয়েজ ভাই এলেন না। সেই যে গেলেন, তারপর তিনি দ্বিতীয়বার *পূর্বদেশ* অফিসে প্রবেশ করলেন না। শুরুতে সলিমুল্লাহ ভাই তার আগের আসনে বসেই ভারপ্রাপ্ত চিফ রিপোর্টারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ কমাস পরে তাকে স্থায়ী চিফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। তখন তিনি আসন পরিবর্তন করে চিফ রিপোর্টারের ডেস্কে গিয়ে বসলেন। ফয়েজ ভাইয়ের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের খবরটা জানলাম সে সময়। সাংবাদিকতা জগতে ফয়েজ আহমদের স্বীকৃতি অনেকটা সর্বজনবিদিত। পরে অবশ্য জানতে পেরেছি, সেই ফয়েজ ভাই যখন দেখলেন তার ও নিউজ এডিটর সাহেবের সুপারিশ অনুযায়ী সাব-এডিটর থেকে স্টাফ-রিপোর্টারে পদোন্নতির সুপারিশ অগ্রাহ্য করে কর্তৃপক্ষ আমাকে যোগ করলেন, তিনি তা বরদাশত করতে পারলেন না। আমি যেহেতু বাম ঘরানার ছিলাম না, সুতরাং সাংবাদিক হিসেবে যতই যোগ্যতার পরিচয় দিই না কেন, সুপারিশ আমার নামে যে যাবে না এটা তো নিশ্চিত। বন্ধুরা অবশ্য রসিকতা করে আমাকে বাহাবা দিত, বলত তুই একটা জায়ান্ট কিলার। কিন্তু আমার মতো একটা আনকোরা শিক্ষানবিশ সাংবাদিকের জন্য ফয়েজ ভাইয়ের মতো একজন প্রবীণ, প্রথিতযশা সাংবাদিককে পদত্যাগ করতে হলো— এই চিন্তাটা আমাকে সত্যিই ব্যথিত করত। যাই-হোক, কর্তৃপক্ষ সম্ভবত স্টাফ টিমে রাজনৈতিক চিন্তার ভারসাম্য আনতে চাইছিল। ফলে সলিমুল্লাহ ভাইয়ের চিফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রিপোর্টিং টিমে আরও একজনকে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিলো। এবারও বাম ঘরানার সাংবাদিক বাদ দিয়ে নিউজ ডেস্ক থেকে পদোন্নতি দেওয়া হলো হোসেন তৌফিক চৌধুরীকে। সিলেটবাসী তৌফিক ছিলেন পিডিএম অথবা মুসলিম লীগ ধরনের ডান ঘরানার রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনুসারী। সুতরাং তৌফিকের সঙ্গে আগের হৃদ্যতা সহজেই আরও ঘনিষ্ঠ হলো স্টাফ টিমে। আমরা দুজনেই মোটামুটি আলাপ-আলোচনা করে কাজে হাত দিতাম। চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহ ভাই অবশ্য রাজনৈতিক মতামতের চাইতে সাংবাদিক হিসেবে যোগ্যতার ও সুচারু রিপোর্ট তৈরি করার যোগ্যতার মূল্য দিতেন বেশি। ফলে ভালো কাজ দেখিয়ে আমরা সহজেই তার সুনজরে পড়তে সক্ষম হয়েছিলাম। বার্তা সম্পাদক এতেশাম হায়দার চৌধুরীও একইভাবে মতের চাইতে গুণের মূল্য দিতেন বেশি। ডেস্কের কাজের চাইতে রিপোর্টারের কাজে আকর্ষণ ছিল অনেক। প্রায়ই অফিসের বাইরে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হতো। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সংবাদ সম্মেলন ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য দাওয়াত আসত। চিফ রিপোর্টার সাহেব যার যার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুসারে এসব কাজ ভাগ করে দিতেন। আমাদের পত্রিকা গ্রুপ পত্রিকা জগতে নিজের মান বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাংবাদিকদের ভালো পোশাক কেনার ভাতা দিত। ফলে উঁচুদরের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য গতানুগতিক পাজামা-পাঞ্জাবি ছেড়ে প্রায়ই রীতিমতো কেতাদুরস্ত হয়ে স্যুট-টাই পরে যেতাম। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার তখন ঢাকার সব সংবাদপত্র। সুতরাং এমন সব রিপোর্টের সুযোগ খুঁজতে হতো, যাতে এই মনোভাবটা প্রাধান্য পায়। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান সাহেবের একটা সেমিনার কভার করতে পাঠানো হলো আমাকে। যা ভাবছিলাম তাই, বৈষম্য নিয়েই আলোচনা। সোবহান সাহেবের বক্তব্যে তিনি পুরো ফিরিস্তি তুলে ধরলেন কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে অর্থায়নের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানে কম জরুরি প্রকল্পে উদার হাতে টাকা ঢালা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি তারবেলা বাঁধের কথা বললেন। অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লিখলাম, সম্ভবত বক্তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অনুযোগ প্রতিফলিত হয়ে থাকবে রিপোর্টটিতে। পরদিন প্রথম পাতায় 'তারবেলা তাকে তুলে রাখ' এই শিরোনামে প্রকাশিত হলো রিপোর্টটা। প্রশংসা ও অভিনন্দন পেলাম। বিভিন্ন মন্ত্রী ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের সংবাদ সম্মেলনের দাওয়াতও আসত নিয়মিত। এরমধ্যে প্রথম যে সংবাদ সম্মেলন উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ অফিসে কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর আওয়ামী লীগে যোগদানের সংবাদ সম্মেলন। পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। মঞ্চে শেখ মুজিবুর রহমান নিজে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রথমে শেখ সাহেব আওয়ামী লীগের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সারা দেশে এর প্রভাব নিয়ে বক্তৃতা দিলেন এবং এই সাফল্যের স্মারক হিসেবে কর্নেল ওসমানীর অংশগ্রহণকে একটা নমুনা হিসেবে পেশ করলেন। কর্নেল ওসমানীও তার সঙ্গে যে ধরনের বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার ফিরিস্তি দিয়ে বক্তৃতা করলেন। তারপর প্রশ্নোত্তরের পালা। কয়েকজনের প্রশ্নের পর আমি হাত তুললাম। সম্ভবত আমার দাড়ি দেখে শেখ সাহেব বললেন, 'আপনি *সংগ্রাম* থেকে তাই না?' সাংবাদিক বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক মুসা ভাই বললেন, সে *পূর্বদেশ*-এর রিপোর্টার। মুহূর্তের মধ্যে শেখ সাহেব আন্তরিকতার সুরে 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নেমে এলেন, বললেন— আচ্ছা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বলতো, মাহবুবও (*পূর্বদেশ*-এর সম্পাদক) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চায়, আমিও তাই চাই, তাহলে *পূর্বদেশ* আমার বিরুদ্ধে লেখে কেন? আমি বললাম, আমি এ ব্যাপারে কী বলতে পারি? এটা তো আপনি মাহবুব ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন। শেখ মুজিব হেসে একমত হলেন। মানুষকে দ্রুত আপন করে নেওয়ার এই অদ্ভুত গুণ শেখ মুজিবের মধ্যে এরপরও অনেকবার দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

ছাব্বিশ

স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিতেই শুরু হয়ে গেল নির্বাচনের মৌসুম। প্রথমে নির্বাচন ঘোষণা করা হলো ৫ অক্টোবর জাতীয় নির্বাচন এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। কিন্তু আগস্ট মাসে দেশব্যাপী বিরাট প্লাবনের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে নেওয়া নিয়ে যাওয়া হলো ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু দেশজোড়া প্লাবনের দুর্যোগ শেষ হতে না হতে ১২ নভেম্বর ঘটে গেল এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এতে প্রাণ হারাল প্রায় ২০ লাখ মানুষ, আর আহত-নিহতের সংখ্যা নির্ধারণ করা তো অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভবই হয়নি। বাংলার ইতিহাসে ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড়কে সর্বকালের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বলে বিবেচনা করা হতো। এতে প্রাণ হারিয়েছিল ২ লাখ মানুষ। সুতরাং সেই তুলনায় '৭০-এর ঘূর্ণিঝড় সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কোনো বিরোধী দল এই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আবারও নির্বাচন মুলতুবির আহ্বান জানাল। আর মওলানা ভাসানীসহ আরও অনেকেই এই সুযোগে আওয়ামী লীগের আগেই বাঙালি জাতীয়তার ধুয়া তুলে সস্তায় বাজিমাত করার অভিযানে লেগে গেলেন। ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জানালেন। কিন্তু পাকিস্তানের কাণ্ডজ্ঞানহীন কেন্দ্রীয় নেতাদের আচরণ এই চরম দুর্যোগমুহূর্তে বাঙালির আত্মাভিমানের ওপর চরম আঘাত হানল। ২৬ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সফর শেষে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে ইসলামাবাদে ফিরে গেলেন। বিপন্ন দেশবাসীর পাশে দাঁড়ানো দূরে থাক, ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় একটা সাধারণ সফর করারও তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না। এতকিছুর পরও শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীদের ফাঁদে পা না দিয়ে এই সময়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, 'আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছি, স্বাধীনতার নয়।'

এদিকে ঢাকায় বসে আমরা সাংবাদিকেরাও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় কী ঘটছে তা গুজব ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এবং কখনো কখনো বিদেশি সংবাদদাতাদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে রিপোর্ট লিখছিলাম। বিদেশি সংবাদদাতারা দলে দলে উপদ্রুত এলাকা সফরে এসে হাজির হলেও ঢাকা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

থেকে কোনো সাংবাদিক উপকূল অঞ্চলে সফরে যেতে প্রস্তুত হননি। আমাদের পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব এই অবস্থা মেনে নিতে সম্মত হলেন না। একদিন বিকেলে তিনি *পূর্বদেশ* অফিসে এসে উভয় পত্রিকার সাংবাদিকদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হলেন। সভায় সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও রিপোর্টারদের তিনি এর জন্য তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ সাহস করে উপকূল সফরে যেতে রাজি আছে কি না, তার জন্য তিনি ভলান্টিয়ার চাইলেন। আমি তখনো জুনিয়র রিপোর্টার, সিনিয়রদের রেখে আমার হাত তোলার স্পর্ধা দেখানো উচিত কিনা, এ নিয়ে কয়েক মিনিট ভাবলাম। পরে হাত তুলে বললাম যে আমি যেতে রাজি আছি। হামিদুল হক চৌধুরী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল হক সাহেবকে বললেন, ঠিক আছে, ওর সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার দিয়ে দাও আর তাকে এ বাবদ খোলা হাতে খরচ করার প্রয়োজনীয় তহবিল দিয়ে দাও। মাহবুব ভাই আমাকে ফটোগ্রাফার মানু মুন্সিকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই রওনা করার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, টাকাপয়সার কথা চিন্তা করবে না, যথেষ্ট তহবিল তোমার সঙ্গে দেওয়া হবে, প্রয়োজন হলে গোটা লঞ্চ ভাড়া করে নিতেও দ্বিধা করবে না। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে সফরের আয়োজনে লেগে গেলাম।

তখন অবশ্য ধারণা করতে পারিনি যে, এই সফর আমার সাংবাদিকতা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। অবশ্য *পূর্বদেশ*-এর পয়সা খরচ করে লঞ্চ চার্টার করতে হলো না। সদরঘাটে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম আরও অনেকেই উপকূলের পথে যাত্রা করছেন। রেডক্রস সাহায্য সংস্থা একটা বড় ধরনের লঞ্চ চার্টার করেছে। তাদের পরিচালক আমাদের পরিচয় পেয়ে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানালেন আমরা যেন তাদের মেহমানদারি গ্রহণ করি। আমার সাথি মানু মুন্সির সঙ্গে পরামর্শ করে রেডক্রসের মেহমানদারি গ্রহণ করলাম। রেডক্রসের দুজন ইউরোপিয়ান কর্মকর্তা ও স্থানীয় অফিসের কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কজন ছাত্র স্বেচ্ছাকর্মী নিয়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে লঞ্চটা উত্তাল পদ্মায় এসে হাজির হলো অল্প সময়ের মধ্যে। সবুজ শ্যামলিমার অফুরন্ত সমারোহের বুক চিরে নববধূর রঙিন শাড়ির আঁচলের মতো পাক খেয়ে পেঁচিয়ে আছে প্রমত্তা পদ্মা। মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির আলামতও যে নেই, তা নয়। ভাঙা গাছপালা, নদীর পাড়ে উল্টে থাকা নৌকা এবং ঘাস-জঞ্জালের স্তূপ থেকে সহজেই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কিছুটা আঁচ করা যায়। কিন্তু তারপরও এসব সামান্য ক্ষয়ক্ষতি রূপসী বাংলার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অসামান্য রূপে যেন কোনো আঁচড়ই কাটতে পারেনি। যাই হোক, যাত্রা সাথিদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে যাত্রাটা অত্যন্ত ভালোই কাটল।

বরিশালে নেমে প্রথমেই জেলা প্রশাসক সাহেবের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম উপকূলের উপদ্রুত এলাকায় কেমন করে পৌঁছা যায় তার উপায় খুঁজতে। সেখানে হাজির হয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। অফিস ও তার চারপাশে গিজগিজ করছে অগণিত বিদেশি সাংবাদিকের মিছিল। এর মধ্যে আমাদের দেশি একজন সাংবাদিকও নেই। সবাই ফসলের পোকায় ওষুধ ছিটানোর ছোট ছোট বিমান ভাড়া করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। মনে মনে হাসলাম। আমার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আমাকে দরকার হলে গোটা মোটর লঞ্চ ভাড়া করার অনুমতি দেওয়ায় গর্ববোধ করেছিলাম। বিদেশি এই সাংবাদিকদের নিবেদিত ঐকান্তিকতায় মাথানত হয়ে এলো। সাংবাদিকতা এদের কাছে শুধু পেশা নয়, নেশাও বটে। ইংরেজিতে যাকে বলে passion। বিপন্ন মানবতার সংবাদ দুনিয়াবাসীদের পৌঁছে দেওয়াটা এদের কাছে শুধু পেশাগত কাজ নয়, বরং এক পবিত্র দায়িত্ব। পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশে সাংবাদিকতা কেরানিগিরির মতো আর একটা রুটিরুজির পেশা মাত্র, সেবা ও মানবতা এখানে হয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অথবা থাকলেও নিতান্তই গৌণ।

যাই হোক, দ্রুত উপদ্রুত এলাকায় পৌঁছাবার উপায়ও বের হলো। একমাত্র দেশি সাংবাদিক হিসেবে আমার কদরও বেড়ে গেল অনেক। ত্রাণ সংস্থাগুলো রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলো আমাকে তাদের সঙ্গে নিতে। প্রথমে গিয়ে হাজির হলাম ভোলায় মেঘনা নদীর মোহনায়। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক। বিশাল বিস্তৃত মেঘনা এখানে নতুন নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে— স্থানীয়দের কাছে মেঘনা এখানে শাহবাজপুর নদী নামে পরিচিত। তীরে দাঁড়িয়ে ওপারে তাকিয়ে শুধু দেখা গেল হালকা নীল মেঘের মতো এক ঝাপসা রেখা। ব্রিটিশ বন্ধুটি জানতে চাইল, কী নাম এই সাগরের? মৃদু হেসে জবাব দিলাম, সাগর নয়, এটা নদী। অবাক বিস্ময়ে সে আবার প্রশ্ন করল, নদী? অপর তীর তো দেখাই যায় না, How wide is it? বললাম, তোমাদের ইংলিশ চ্যানেল থেকে একটু বেশি— চব্বিশ মাইল।

পরদিন থেকে প্রতিবেদন পাঠাতে শুরু করলাম। প্রথমটিতে লিখলাম অন্তরনিংড়ানো মানবিক উপলব্ধিভরা সামগ্রিক পরিস্থিতির এক বিস্তারিত জরিপ, শিরোনামটা দিলাম, 'উপকূল: প্রলয় রাতের পর'। এক বিদেশি সাংবাদিক বন্ধু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সেদিনই ঢাকায় ফেরত যাচ্ছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি সাগ্রহে সম্মত হলেন লেখাটা ঢাকায় গিয়ে আমার অফিসে পৌঁছে দিতে। একদিন পরে প্রথম পাতায় আমার লেখাটা দেশবাসী বোধকরি দেশি সাংবাদিকদের অক্ষম অবহেলার খানিকটা প্রতিকার হিসেবেই কবুল করলেন। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ তো প্রতিদিন মেলে না, নিয়মিত লেখা কেমন করে পাঠাই তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। ইতোমধ্যে একদিন উপদ্রুত এলাকার সামরিক দুর্যোগ ত্রাণ মিশনের এক সংবাদ সম্মেলনের দাওয়াত পেলাম। জনসংযোগের ভারপ্রাপ্ত এক ক্যাপ্টেন দুর্গত অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর নিরলস সেবাকর্মের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে অভিযোগ করলেন যে ঢাকার পত্র-পত্রিকায় এসব খবর মোটেই প্রকাশিত হচ্ছে না। সুযোগ পেয়ে আমি সম্মেলন শেষে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাদা দেখা করে বললাম, দেখুন, ছাপা হবে কেমন করে, যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আমরা চাইলেও তো কোনো রিপোর্ট ঢাকায় পাঠাতে পারছি না। ক্যাপ্টেন সাহেব আমার মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, তাহলে কী করতে হবে বলুন? বললাম, আপনারা আমার রিপোর্ট আপনাদের ওয়্যারলেসযোগে ঢাকায় পাঠাতে পারেন। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হলো। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, আমাদের পত্রিকা অফিসে তো ওয়্যারলেস নেই, সেখানে পাঠানো হবে কেমন করে? বললাম, আপনারা কাউকে দিয়ে আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারেন, নাহলে টেলিফোন করে দিলে আমাদের অফিস থেকে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারবে। ব্যস, সমাধান হয়ে গেল।

উপদ্রুত এলাকাগুলোর মধ্যে পিরোজপুর জেলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এবার সেদিকে রওনা হলাম। ছোট একটা নদী আঁকাবাঁকা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। দুই তীরে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সীমাহীন ধ্বংসের আলামতে ভরপুর। বড় বড় গাছগুলোও কে যেন কাপড়ের টুকরার মতো প্রচণ্ডভাবে পেঁচিয়ে দুমড়ে ফেলে গেছে। গাছের ডালে ঝুলে আছে ছাগল-ভেড়াসহ নানা জীবজন্তুর গলিত লাশ। শুনলাম, মানুষের মৃতদেহও পাওয়া গিয়েছিল প্রথম কদিন। নদীপথে এগিয়ে চললাম নৌকায় করে। পথের মধ্যে একজনের কাছে নদীর নামটা শুনে হকচকিয়ে গেলাম। এই নদীর নামকে শিরোনাম করে পাঠালাম পরবর্তী প্রতিবেদনটা 'নদীর নাম: আগুনমুখা'। লিখলাম, 'উপকূলের অধিবাসীরা এই নদীর প্রচণ্ড রোষের সঙ্গে শুরু থেকেই পরিচিত, তাই বোধহয় জন্মলগ্ন থেকেই নদীর যথোপযুক্ত নামকরণ করেছে। হোয়াংহো নদীর অপর নাম হয়েছে 'চীনের দুঃখ'। বাংলার উপকূলের এই প্রমত্তা আগুনমুখার মতো আসল নাম নয়। প্রতিবেদনটা যে সত্যিই স্থানীয় পাঠকদের মনে দাগ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কাটতে পেরেছে, তার প্রমাণ পেলাম তিন দশক পরে লন্ডনে। সেই সময়ের পিরোজপুরবাসী এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিন দশক পরে লন্ডনে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে তাকে আসতে বললাম। দেখা করতে এসে আমার অফিসে প্রবেশ করার সময় সে উদাত্ত কণ্ঠে 'নদীর নাম আগুনমুখা' উচ্চারণ করতে করতে ঢুকল।

সফরের বাকি কদিন দুস্থ জনতার মিছিলে মিছিলে ঘুরে ঘুরে ওদের মর্মবেদনার অগুনতি কাহিনি শোনার এবং পাঠকদের জন্য তা খাতার পাতায় লিখে নেওয়ার কাজে সময় কাটালাম। আমার সুদক্ষ ফটো সাংবাদিক বন্ধু মানু মুন্সি প্রতিটি ইন্টারভিউর হৃদয়স্পর্শী আলোকচিত্র নিলেন অনেক। ঢাকায় ফিরে আসার আগে একটা জিনিস মনকে খুবই কষ্ট দিলো। দেখলাম, কীভাবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক দরকষাকষির টানাপোড়নে আর্তজনতার দুর্ভোগ আরও বহুগুণ বেড়েই চলছে। তাই ফিরে এসেই প্রথম প্রতিবেদন লিখলাম: 'লাল ফিতার ফাঁসে আর কত লোক মরবে?' লিখলাম, এই আল ঠেলাঠেলি এখনই বন্ধ করতে হবে। দেশটা যদি বাঁচাতে চান, তবে সরকারের সকল স্তরের কর্তাদের সমগ্র মনোযোগ এখন নিরঙ্কুশভাবে পূর্ব বাংলাতেই নিবিষ্ট করতে হবে। মনে করতে হবে পূর্ব বাংলাই পাকিস্তান, পূর্ব বাংলাই কেন্দ্র, প্রদেশ সব। উৎফুল্ল হয়ে বার্তা সম্পাদক সাহেব ঘটা করে প্রথম পাতায় আট কলাম শিরোনাম দিয়ে ছেপে দিলেন নিবন্ধটা। উপকূলে দেশ-বিদেশের সংবাদ শোনার সময় পাইনি। ঢাকায় এসে শুনলাম আমার প্রতিবেদনগুলো কী রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শুনলাম, উপকূল সফরকারী প্রথম স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবে সারা দেশের পাঠক অধীর আগ্রহ নিয়ে আমার প্রতিবেদনগুলোর প্রতীক্ষা করত। বাজারে *পূর্বদেশ*-এর কাটতিও হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। সকালের প্রথম কয় ঘণ্টার মধ্যেই সব কাগজের দোকান ও হকারদের কাছে *পূর্বদেশ* ফুরিয়ে যেত। পত্রিকা পরিচালকেরা মুদ্রণ অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান সংবাদ সমীক্ষক দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় প্রতি রাতে তার জনপ্রিয় 'সমাচার' অনুষ্ঠানে আমার লেখা প্রতিবেদনগুলো থেকে আমার নাম নিয়েই পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

ঢাকায় ফিরে এসেও উপকূলে নেওয়া ইন্টারভিউগুলো এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিদিনই লিখে চললাম নতুন নতুন প্রতিবেদন। প্রথম পাতায় আমার নামেই প্রকাশিত হতে থাকল নিবন্ধগুলো। এ ধরনের একটা প্রতিবেদন একদিন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বেরোল 'আমাকে একটা সাদা থান দেন' শিরোনামে, কৌশলী ফটো সাংবাদিক মানু মুন্সির তোলা আবেগমাখা ছবি নিয়ে, রেডক্রসের রিলিফ বিতরণ কেন্দ্রে একটা আঠারো-উনিশ বছরের যুবতি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তাকে দেওয়া লাল শাড়িটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। বিতরণ শেষে মেয়েটার ইন্টারভিউ করেছিলাম। অশ্রুসিক্ত হয়ে মেয়েটা যা বলল, তা-ই লিখেছিলাম নিবন্ধটাতে। অষ্টাদশী এই মেয়ের মাত্র কমাস আগে বিয়ে হয়েছিল গ্রামের সুঠাম সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে। তারুণ্যের উচ্ছল আবেশে স্বপ্নের প্রাসাদ রচনায় বিভোর হয়ে দুজনে মিলে প্রাণপণ পরিশ্রম করে গড়ে তুলছিল তাদের নতুন সংসার। ঠিক এই সময়ে রঙিন সেই সব স্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে এলো ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস। ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার জীবন সাথিকে, দুর্ভাগ্যের সরোবরে সে থেকে গেল সম্পূর্ণ একা। বিধবা সে— লাল শাড়ি তার কী কাজে আসবে, তাই লাল শাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে সে একটা সাদা থান চাইছে। মেয়েটার এই সকরুণ কাহিনি মনের সমস্ত দরদ নিংড়ে পেশ করে দিলাম রিপোর্টটিতে। নিজের কাছেই ভালো লাগল লেখাটা। কিন্তু এর পুরো মূল্যায়ন বুঝলাম পরদিন। যথারীতি বেলা ১১টার দিকে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসে কাজ করছি। দুপুর প্রায় ১২টায় সম্পাদক, সহসম্পাদক, বার্তাসম্পাদকসহ পত্রিকার পদস্থ সব কর্মকর্তা দলবেঁধে আমাদের খোলামেলা নিউজ রুমে ঢুকলেন, কবি জসীমউদ্‌দীনকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে ভাবলাম নিশ্চয়ই উঁচু পর্যায়ের কোনো মিটিংয়ের জন্য হয়তো। কিন্তু সম্পাদকদের কামরায় না গিয়ে তারা সবাই সরাসরি আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। টেবিলে তখন আমিই একমাত্র সাংবাদিক। হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সম্পাদক মাহবুবুল হক সাহেব কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই চৌধুরী মুঈনুদ্দিন। আমাকে বললেন, কবি এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কবি জসীমউদ্‌দীন আবেগমাখা গলায় বললেন, তোমার রিপোর্টগুলো আমি প্রতিদিনই পড়ি। কিন্তু আজকের রিপোর্টটা পড়ে ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। ইচ্ছে হলো নিজে এসে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও বললেন, আমরা তো কল্পনার জাল বুনে কবিতা লিখি, কিন্তু তোমার রিপোর্টটা বাস্তব জীবন নিয়ে লেখা এক কবিতা। জবাবে কিছু বলতে চাইলাম, কথা যেন বের হতে চাইছিল না। যেন একটা আস্ত কাঁচা কুল গলায় আটকে আছে। দু-একটা কথা বলে কবিকে ধন্যবাদ দিতে চেষ্টা করলাম, আমার অবস্থা দেখে কবির বোধ হয় দয়া হলো, হেসে বিদায় নিলেন তারা। আর আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সাতাশ

শিগ্‌গিরই অনুভব করলাম, শুধু পাঠকদের মধ্যে নয়, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে এবং বাইরের সরকারি ও রাজনৈতিক মহলেও আমার সাংবাদিক প্রতিভার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে।

আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চিফ রিপোর্টার সাহেব পাঠাতেন, স্বনামে দাওয়াত পেতেন শুধু চিফ রিপোর্টার ও সিনিয়র রিপোর্টাররা। এখন আমার নামেও দাওয়াত আসতে শুরু হলো সরকারি ও বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠান থেকে। দাওয়াত আসতে শুরু হলো নানা ধরনের লোভজনক সংবাদসফরেরও। অবশ্য এই সুনাম-স্বীকৃতি সম্পূর্ণ একতরফা ছিল না, কিছু ভ্রুকুটি, কিছু ঈর্ষাও বয়ে আনল। বিশেষ করে যেসব সহকর্মী পেছনে পড়ে গেলেন তাদের মধ্যে।

কিন্তু সেসবের দিকে তাকাবার ফুরসত কোথায় আমার। সিনিয়র টিমের অংশ না হলেও সিনিয়রদের মতোই ব্যস্ততায় মশগুল হতে হলো। একদিন রেডক্রস থেকে আমন্ত্রণ এলো, পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রসের চেয়ারম্যান প্রধান বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ সাহেবের বাসভবনে। বিচারপতি মোর্শেদ তার আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের পরে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন। খুব সহজেই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের কাছে। নাশতার বিরতিতে পারস্পরিক আলোচনার সময় বারান্দায় এক জাপানি সাংবাদিকের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। বলল, সে *আশাই সিমবুন*-এর রিপোর্টার। বললাম, শুনেছি *আশাই সিমবুন* শুধু জাপানের নয়, সারা পৃথিবীর সেরা পত্রিকা। সে মাথা নেড়ে সায় জানাল। বলল, তার পত্রিকার সার্কুলেশন পাঁচ মিলিয়ন। আমার কাছে জানতে চাইল আমার পত্রিকার সার্কুলেশন। প্রমাদ গুনলাম, কী জবাব দিই! আমার পত্রিকার সার্কুলেশন যদিও তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানে সবচাইতে বেশি, তবু তার পত্রিকার পাশে তো তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যাবে না। কোনোরকম আমতা আমতা করে পাশ কাটিয়ে গেলাম।

ঢাকায় তখন প্রসিদ্ধ বাংলা পত্রিকাগুলোর মধ্যে *পূর্বদেশ* ছাড়াও ছিল *দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, পয়গাম* ও সম্প্রতি প্রকাশিত *সংগ্রাম*। এর মধ্যে সার্কুলেশন এবং সাংবাদিকতার মানের বিচারে *দৈনিক পাকিস্তান*

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

এবং *ইত্তেফাকই পূর্বদেশ*-এর পরে আসে। এ ছাড়া ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র সংবাদ প্রচারের অন্যতম মাধ্যম ছিল। রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকেরা বিভিন্ন বড় বড় কর্পোরেশনের জনসংযোগ অফিসার হিসেবেও কাজ করতেন। ঢাকা টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক তাজুল ইসলাম ছিলেন ওয়াপদার জনসংযোগ অফিসার। বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল ওয়াপদার প্রধান কাজ। রাতের বেলা যখন কাজ করতে করতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যেত, তখন আমরা কৌতুক করে জোরে চিৎকার করে উঠতাম তা-জু-ল ইসলাম, কেউ কেউ বলত ফোন করো তাজুল ইসলামকে, অফিসে হাসির রোল পড়ে যেত।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগ দাওয়াত দিলো এক সংবাদসফরে চট্টগ্রাম এলাকায় যেতে। বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টারদের নিয়ে একটা প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ করা হলো। আমিও ছিলাম এই আমন্ত্রিতদের একজন। সরকারি জনসংযোগ বিভাগের ডাইরেক্টর হারুন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত হাসিখুশি দিলখোলা সজ্জন ব্যক্তি। তিনি জোর করে ধরলেন আমাকে, যেমন করে হোক যেতে হবে, রাজি হয়ে গেলাম। সরকার আমাদের আরাম-আয়েশের জন্য খরচ করতে কোনোরূপ কার্পণ্য করল না। ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে সফরের ব্যবস্থা করা হলো, চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণির হোটেলে আগেই বুকিং দেওয়া ছিল, সেখানে এক রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে সুন্দর একটা সরকারি মাইক্রোবাসে করে আমরা গেলাম কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট পরিদর্শন করার জন্য।

কর্ণফুলী নদীর উজানে চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত কাপ্তাই বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প। ১৯৬২ সালে এই প্রজেক্টের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। এতে কাপ্লান টাইপের দুটো টার্বাইন ২৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। পানির স্রোতও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে ষোলোটি গেটের কন্ট্রোল স্পিলওয়ে। এগুলো দিয়ে সংরক্ষণ করা পানিতে সৃষ্টি হয়েছে ৬ হাজার ৪৭৭ মিলিয়ন কিউবিক মিটার কৃত্রিম হ্রদ। এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানবসন্তানদের কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এতে বাস্তুচ্যুত ৪০ হাজার চাকমা ভারতের অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণী ও পাখির। কাপ্তাইতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো হ্রদের ওপর নির্মিত সুন্দর এক রেস্ট হাউজে।

কাপ্তাই থেকে ফিরে এলাম আবার চট্টগ্রামে, এখানে একদিন বিভিন্ন ছোটখাটো সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এবং শহরের দামি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সুস্বাদু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ডিনারের মজা নিয়ে পরদিন রওনা করলাম রাঙ্গামাটির দিকে। রাঙ্গামাটি শহরটা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র। পার্বত্য এলাকায় হলেও এতে আধুনিক সুবিধা ও উপকরণের অভাব নেই। বিশেষত পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা এমনকি মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, গভর্নররাও যখন-তখন অবসর বিনোদনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন। এ সময় তাদের আরাম-আয়েশের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করার কোনো ত্রুটি হয়নি। যখন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মহোদয় তশরিফ আনেন, তখন তার অবস্থানের জন্য রয়েছে একটা মনোরম প্রেসিডেন্ট হাউজ। আমাদের অবস্থানের জন্য এই প্রেসিডেন্ট হাউজকেই নির্বাচন করা হলো। সব রকমের রুচিসম্মত আসবাবে সজ্জিত বিলাসবহুল এই রেস্ট হাউজে চাকরবাকর, আরদালি, বেয়ারা ও বাবুর্চিতে ভরপুর। ভাবছিলাম এই রাজকীয় ব্যবস্থা কি সত্যিই আমাদের শোভা পায়? রাঙ্গামাটিতে দেখাবার মতো এমন কোনো বিশেষ সরকারি প্রকল্প ছিল না, তাই সেখানে আমাদের নেওয়ার একমাত্র কারণ ছিল সাইট-সিইং। রাঙ্গামাটি থেকে পাহাড়ি পথ দিয়ে এবং কিছু অংশ স্পিডবোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অনেকটা বার্মা সীমান্তে মাইনীমুখ বাজারশহরে। বিচিত্র এই বাংলাদেশ, কোথাও অন্তহীন সমতলভূমি, কোথাও আবার পাহাড়-পর্বত নদী-হ্রদ, বনাঞ্চল। অপরূপ এই প্রাকৃতিক শোভায় চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, উপভোগ করলাম সমস্ত অন্তর দিয়ে।

চট্টগ্রামে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ইপিআইডিসির মৎস্যবন্দর দেখাতে। কর্ণফুলী নদীর ওপর নবনির্মিত এই ঝকঝকে মৎস্যবন্দরটা সত্যি প্রশংসা পাওয়ার মতো। মৎস্যবন্দরের দায়িত্বশীল অফিসার এবং প্রাদেশিক সরকারের জনসংযোগ অফিসাররা ঘুরে ঘুরে আমাদের প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক দেখালেন এবং ব্যাখ্যা করলেন। ফিশিং ট্রলারগুলো সমুদ্র থেকে মাছ ধরে কী করে সেটাকে এই বন্দরে এনে তুলবে, তারপর বিভিন্ন কক্ষে কীভাবে কোন যন্ত্র দিয়ে এগুলো বাছাই এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে, পরে এগুলো প্যাকিং করা হবে। প্যাকিংয়ের উপাদান তৈরির জন্য আলাদা ছোট্ট ইউনিট আছে। ঘুরে ঘুরে দেখে সত্যি মনটা খুশিতে ভরে উঠল— যাক, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ বাজারজাত করার জন্য একটা আধুনিক প্রকল্প শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলো। অফিসার মহোদয়কে জিজ্ঞেস করলাম, মৎস্যবন্দর তো তৈরি করেছেন চমৎকার, কিন্তু এটা ব্যবহার করার জন্য আপনাদের কয়টা ফিশিং ট্রলার আছে? বিব্রত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, এখন পর্যন্ত একটাও নেই, তবে সরকার শিগ্‌গিরই বিদেশ থেকে কেনার অর্ডার দেওয়ার চিন্তা করছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম: বাহ! তার মানে, ঘোড়া কেনার আগেই ঘোড়ার গাড়ি কিনে বসে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আছেন, তাই না? অপ্রস্তুত হলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তারপরও প্রকল্পটির ভালো দিকগুলো আকর্ষণীয় মনে হলো। চিন্তা করলাম, ঢাকা ফিরে গিয়ে এর ওপরে একটা চমৎকার প্রতিবেদন লিখব।

সফরের শেষ গন্তব্য ছিল কক্সবাজার। চট্টগ্রামের শেষ প্রান্তে আনমনা এক ভাবুক কবির মতো বঙ্গোপসাগরের অতলগভীর জলে দুটো পা মেলে বসে আছে সমুদ্র তীরের এই ছোট্ট শহর। আমাদের হোটেলটার প্রায় সামনে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি সাদা-সোনালি বালুকা মেলানো দীর্ঘ বিস্তৃত এই সমুদ্র-সৈকতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সাগরের তরঙ্গমালা অনবরত। এ দৃশ্য সারাদিন দেখলেও দৃষ্টি ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়। এই সৈকত নাকি প্রায় ৯২ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে চট্টগ্রামের শেষ বিন্দু টেকনাফে গিয়ে মিশেছে। জনসংযোগ অফিসার জানালেন, এটা সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম সৈকত, দ্য লংগেস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই পুরো পথ ধরে ঢেউয়ের পাশে পাশে জিপগাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়। জানতে চাইলাম, এই চমৎকার বিনোদনসামগ্রী দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করার কী আয়োজন সরকার করেছে? ভদ্রলোক আমতা আমতা করে যা বললেন, তাতে বুঝলাম বিশেষ কিছু নয়।

আমাদের মেজবান হারুন সাহেব বললেন, আজ রাতে আপনাদের জন্য কক্সবাজারের শ্রেষ্ঠ খাবার তৈরি করবে হোটেলের বাবুর্চিরা। রাতে খাবারের টেবিলে দেখতে পেলাম মস্ত বড় রূপচাঁদা মাছ নানাভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে—ভাজা, ভুনা, সুরুয়াদার তরকারি ইত্যাদি। প্রায় সবাই খাবারের প্রশংসা করলেন প্রচুর। আমাদের অনুরোধ যে ভদ্রলোক মনে রেখেছিলেন, তার প্রমাণ পেলাম ট্রেন থেকে ঢাকায় নেমে। দেখলাম আমাদের প্রত্যেকের জন্য বড় বড় রূপচাঁদা মাছ উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন হারুন সাহেব। বিদায় হওয়ার আগে হারুন সাহেব আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে অনুরোধ করলেন যেন ভালো একটা ইতিবাচক রিপোর্ট লিখি। ভদ্রলোক ভয় করছিলেন সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ব্যাপারে আমার লেখা নির্ভীক ও সমালোচনামূলক রিপোর্টগুলোর কথা চিন্তা করে। কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের একটা নির্মীয়মাণ প্রকল্পের অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে তারবেলা বাঁধের জন্য অর্থায়ন অনুমোদন করে। আমি এর এক কড়া সমালোচনামূলক রিপোর্ট লিখি। শিরোনামে ছিল: 'তারবেলা তাকে তুলে রাখ'। সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে এই রিপোর্ট প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমাকে খুশি করার জন্য ভদ্রলোক আরও বললেন, শিগ্‌গিরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নেপাল সফরে যাবেন। সেখানে তার সঙ্গে নির্বাচিত কজন সাংবাদিককেও পাঠানো হবে, এই তালিকায় আমার নাম যোগ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা তদন্ত ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। বললাম, আপনি তো জানেন আমি শুধু সত্যনির্ভর রিপোর্টই লিখি, কাউকে খুশি করার জন্য নয়।

সেই সপ্তাহে চিফ রিপোর্টার সলিমউল্লাহ ভাই ছিলেন ছুটিতে। সিনিয়র রিপোর্টার রাকিব ভাই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করছিলেন। রকিব ভাই ছিলেন ঢাকায় রুশ সংবাদ সংস্থা তাসের প্রতিনিধি, দীর্ঘদেহী সুঠাম গড়নের মানুষ, তাকে অনায়াসে রুশ বলেও চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তিনি সলিমুল্লাহ ভাইয়ের মতো নরম প্রকৃতির ছিলেন না। তাই সহকর্মী হলেও যথেষ্ট সমীহ করে চলতাম। আমার প্রস্তাবিত প্রতিবেদন নিয়ে আলাপ করছিলেন। বললেন, সরকারি মেহমানদারি নিয়েছ বলে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য রিপোর্ট শুধু লিখলে চলবে না, আমি চাই একটা ক্রিটিক্যাল রিপোর্ট। আমি বললাম, আপনি তো আমাকে জানেন, মনোরঞ্জনের জন্য রিপোর্ট লেখা আমার অভ্যাস নয়। তাই বলে ভালো কিছু দেখলে তার প্রশংসা করাকেও আমি অন্যায় মনে করি না। বললাম, আমি ঠিক করেছি ইপিআইডিসি চট্টগ্রাম মৎস্যবন্দরের ওপর রিপোর্ট লিখব, এটা আমার মতে সরকারের একটা ভালো পদক্ষেপ। রাকিব ভাই বললেন, আচ্ছা আগে আন তো লিখে, তারপর দেখা যাবে। রিপোর্টটা লিখলাম মোটামুটি ইতিবাচক, কিন্তু সমতা বজায় রাখার জন্য ট্রলারের অভাবের কথা উল্লেখ করতেও ভুল করলাম না। আমার কৌতুকের সুরে বলা ঘোড়ার আগে গাড়ি মন্তব্যটাও যোগ করলাম। রিপোর্ট পড়ে রকিব ভাই খুব একটা খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো না। যাই-হোক, পরদিন রিপোর্টটা প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলো কিন্তু শিরোনাম দেওয়া হলো, 'ইপিআইডিসির মৎস্যবন্দর: ঘোড়ার আগে গাড়ি।' দুপুরের আগেই হারুন সাহেবের টেলিফোন এলো, বিচলিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, এটা কী করলেন ভাই? জবাবে শুধু বললাম, শিরোনামটা তো আমার দেওয়া নয়। হারুন সাহেব বললেন, তা জানি, কিন্তু রিপোর্টের ভেতরে বাক্যটা উল্লেখ করা আছে, শিরোনাম লেখকেরা তো সেখান থেকেই এটা নিয়েছেন। তিনি আরও বললেন, আপনি তো জানেন আপনার ক্রমিক অগ্রগতিটা অনেকের পছন্দ নয় এবং আপনাকে দিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট লিখিয়ে অনেকে আপনাকে ঘায়েল করতে চায়। যদিও ব্যাপারটা আমার অজানা নয়, তবু বাইরের লোকের কাছে এটা স্বীকার করি কেমন করে? বললাম, ব্যাপারটা তা নয়, আসলে নেতিবাচক কথা বলা আমাদের বাঙালি জাতির মজ্জাগত অভ্যাস। তা ছাড়া নেতিবাচক সমালোচনামূলক রিপোর্ট পত্রিকার কাটতিও বাড়ায়। ফলে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের রিপোর্ট পছন্দ করে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আটাশ

উনসত্তরের শেষ দিক থেকেই সারা দেশে এক চাপা উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, দেশ ঠিক কোন দিকে যাচ্ছিল স্পষ্ট করে বলা সম্ভব ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে একসঙ্গে একটা নতুন সম্ভাবনার আশা এবং তার সঙ্গে কোনো রকম অদৃশ্য সূত্র থেকে সৃষ্ট বিপদের আশঙ্কা ছিল। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সব বিরোধী দল পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে একমত পোষণ করলেও আওয়ামী লীগের ৬ দফা পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল ৬ দফা দেশকে বিভক্ত করার একটা পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। আওয়ামী লীগ ছাড়া প্রায় সব দলই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি তুলছিল। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের দাবি করছিলেন। ডানপন্থি ও তথাকথিত ইসলামপছন্দ দলগুলো দেশ ও আদর্শের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সৎ ও আন্তরিক, কিন্তু দেশের বাস্তব পরিস্থিতি আন্দাজ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। অন্যদিকে শেখ মুজিব সম্পর্কেও নানা ধরনের মত, গুজব ও সন্দেহ ময়দানে ছিল। মনে হচ্ছিল মুজিব চরিত্রের দুটো দিক রয়েছে— অনুসারীদের মধ্যে আন্দোলন এবং সংগ্রামের কথা বললেও অনেকে মনে মনে সন্দেহ করতেন যে, ভেতরে ভেতরে তিনি সরকার ও পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ রাখছিলেন। এসব সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল তা-ও নয়। অক্টোবরের শেষের দিকে হঠাৎ করে শেখ মুজিব সাত দিনের সফরে লন্ডনে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় এই জটিল মুহূর্তে তিনি হঠাৎ করে দেশ ছেড়ে কেন যাচ্ছেন, বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডনে যাচ্ছেন না এবং কোনো গোপন কারসাজি করার ইচ্ছাও তার নেই।

কিন্তু লন্ডনে তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। আমেরিকার *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ খবর বের হলো যে পাকিস্তানের আগামী প্রেসিডেন্ট হবেন ইয়াহিয়া খান আর প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিব। পত্রিকায় দুজনের একসঙ্গে তোলা ছবিও প্রকাশ করা হলো। খবর বের হলো— সামরিক সরকার যেকোনোভাবেই হোক নির্বাচনে শেখ মুজিবকে বিজয়ী করিয়ে আনবেন এবং এ ব্যাপারে দেশে ফেরত আসার পর ইয়াহিয়া খান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এক বেতার ভাষণ দেবেন। আর কার্যত হলোও তাই, ২৬ নভেম্বর ইয়াহিয়া এই বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচনের ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। তিনি আরও বললেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে। তবে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশে সব রকমের রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হবে। এই বক্তৃতায় ইয়াহিয়া খান তার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে শাসনতন্ত্রের একটা কাঠামো প্রস্তাব করলেন, যা কোনোক্রমেই লঙ্ঘন করা যাবে না। পরবর্তীকালে এটা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) নামে পরিচিত হয়। এরমধ্যে হুঁশিয়ারি জুড়ে দেওয়া হলো যে এলএফওর কোনো ধারা যদি কোনো নির্বাচিত সদস্য বা দল গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি বলেই বিবেচিত হবে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও সরকার তাদের সদস্যপদ বাতিল করে দিতে পারবে এবং তারা পার্লামেন্টে যোগদানের অনুমতি পাবে না। দেশব্যাপী প্রায় সব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুলল আওয়ামী লীগ এবং একে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচালের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করল। মওলানা ভাসানী তার চিরাচরিত পন্থায় স্লোগান তুললেন— ভোটের আগে ভোট চাই! কিন্তু ইয়াহিয়া খান তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল এই এলএফওর অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল।

উনসত্তরের ১ নভেম্বর শেখ মুজিব লন্ডনে থাকা অবস্থায় ঢাকায় উর্দুভাষী বিহারিদের বিরুদ্ধে এক চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এদিকে অক্টোবরের শেষভাগে আমার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার আগ থেকেই ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। মাত্র দুটো পেপারের পরীক্ষা দেওয়ার পরই দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় ২৪ ঘণ্টা অসহ্য মাথাব্যথার যন্ত্রণা এবং কিছু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব বমি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের কামরায় প্রভোস্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আমাকে দেখতে এলেন। অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে তারা আমাকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হাসপাতালে বিভিন্ন রকমের অনুসন্ধান চলল রোগের মূল কারণ নির্ণয়ের। প্রথমে চিকিৎসকেরা ধারণা করেছিলেন যে হয়তো আমার নিউরোলজিক্যাল সার্জারির প্রয়োজন হবে। কিন্তু আরও তদন্তের পর আমার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চোখের পেছনে একটা জমাট হওয়া ব্লাড-ক্লট (রক্তকণা) খুঁজে পেলেন তারা। বোঝা গেল যে আগস্টে টিএসসির হামলায় আমার মাথার ওপর ছুড়ে মারা চেয়ারের আঘাতে যে চোট লেগেছিল, তার ফলে চোখের পেনে এই রক্তকণা জমা হয়ে গেছে। যাই হোক, ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন যে, কোনো রকমের সার্জিক্যাল অপারেশন ছাড়াও শুধু ওষুধের সাহায্যে এই জমাট রক্তকণা গলিয়ে দিতে তারা পারবেন। সেজন্য চিকিৎসাধীন ছিলাম হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ। এর মধ্যেই ঘটে গেল বিহারিবিরোধী দাঙ্গা। হাসপাতালে কয়জন পদস্থ বামপন্থি ডাক্তার অপরিসীম মানবিকতার পরিচয় দিয়ে ছুটে এলেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে যাদের মোটামুটি সুস্থ মনে হচ্ছিল, তাদের বেড খালি করে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাকেও এই নির্দেশের কারণে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হলো। আমার সাময়িক অসুবিধা হলেও ডাক্তারদের এই মানবতাবোধ দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল।

যদিও এই অমানুষিক দাঙ্গার জন্য আওয়ামী লীগের চরমপন্থি কর্মীরা নিঃসন্দেহে দায়ী ছিল, তবু লন্ডন থেকে ফিরে মিরপুর, হাজারীবাগ, রায়েরবাজার ও কমলাপুরের উপদ্রুত এলাকাগুলো সফর করে শেখ মুজিব কোনো গোপন অশুভ শক্তি এর পেছনে রয়েছে বলে বক্তব্য দিলেন এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন যে তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে।

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল এবং তাদের চাপের কারণে উপকূলজুড়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল, তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া পূর্বনির্ধারিত ডিসেম্বরের শুরুতে নির্বাচনের তারিখ বদলাতে সম্মত হলেন না। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আবার বিনাশর্তে মুক্তি পাওয়ার পর মুজিব স্বাভাবিকভাবেই জনগণের অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলেন। তার ওপর পুঁজি করে আওয়ামী লীগ নানা মনগড়া আকাশচুম্বী প্রতিশ্রুতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তান যেসব বৈষম্য করে যাচ্ছে, তা সত্যিকার হোক বা মনগড়া, তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি করে এবং প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেশবাসীর মনে এক আশঙ্কাজনক উত্তেজনাভরা বিক্ষোভের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এর সঙ্গে অবশ্য ছিল রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর পরিচালিত বেপরোয়া আগ্রাসন ও সন্ত্রাস— সব মিলিয়ে নির্বাচনে কমপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পাইকারি হারে বিজয় অনেকটা নিশ্চিত ছিল। বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিলো। এর সঙ্গে যোগ হলো জাল ও ভুয়া ভোট, ফলে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের দুটি ছাড়া সব কটি আসনে নির্বাচিত হয়ে গেলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। বাদবাকি দুটির মধ্যে পিডিপি নেতা নুরুল আমিন সাহেব ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্দলীয় প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় সিট পেলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান পেল জামায়াতে ইসলামী, যদিও ভোটের পার্থক্য ছিল বিপুল।

আওয়ামী লীগের একতরফা অসদাচরণ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আযম গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে তাদের ঐতিহাসিক বিজয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন।

জানুয়ারি মাসের শুরুতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে নির্বাচনি ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। এ অধিবেশনে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানি শাসকেরা তার ভিত্তি নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এর শূন্যস্থান দখল করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানের দুই অংশে যে নতুন নেতৃত্ব এসেছে, তারা দুই অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেবে না অথবা রাখতে পারবে না— এ কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে। অধ্যাপক আযমের এই বক্তব্যের পর জামায়াতের আমির মাওলানা মওদূদী এ ব্যাপারে জামায়াতের করণীয় কী আছে জানতে চান। মাওলানার জবাবে অধ্যাপক আযম বলেন, রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হওয়ার কর্মসূচি নিলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করে যেতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতকে এর অনুমতি দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি মাওলানা মওদূদী বলেন, শেখ মুজিব তো এখনো স্বাধীনতা দাবি করেননি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে ৬ দফা পেশ করেছেন। এখানে জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তান শাখার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়েছে, মজলিশে শুরার সদস্যগণ একমত হলে আমরা শুধু স্বায়ত্তশাসনই নয়, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারি। সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মওদূদীর এই রায় অনুমোদিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

আওয়ামী লীগের এই বিপুল বিজয় সারা দেশের সঙ্গে খোদ আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবকেও রীতিমতো হতবাক করে দিলো। নির্বাচনের পরে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে মুজিব যে বক্তব্য দেন, তা ছিল অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণ। এতে তিনি বিজয়ের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ থেকে জাতিকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যে নতুন রাজনৈতিক জাগরণ এসেছে, তাকে অভিনন্দন জানান এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে সাহায্য করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের কাছে আহ্বান জানান। কিন্তু দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চলতে থাকবে বলে হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন।

নির্বাচনের পরপরই পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে এমন সব হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে শুরু করলেন যে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল ভুট্টো যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় ভাগ চান আর এর জন্য প্রয়োজন হলে দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। অবশ্য ভুট্টোর এই শক্তির উৎস ছিল সামরিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক গোপন ডিপস্টেট। জেনারেল পিরজাদা, জেনারেল ওমর, জেনারেল হামিদ ও জেনারেল গুল হাসান ছিলেন এর সদস্য। এরা গোপনে গোপনে ভুট্টোর সঙ্গে সমন্বয় করে চলতেন। ইয়াহিয়া খান ছিলেন তাদের হাতে একরকম জিম্মি। অন্যদিকে মুজিবের প্রধান তহবিল সরবরাহকারী পশ্চিম পাকিস্তানি ধনকুবের মাহমুদ হারুন মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে যাতে সমঝোতা না হয়, তা নিশ্চিত করছিলেন বলে গুজব ছিল।

জানুয়ারির শুরু থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম হয়ে উঠল। ইয়াহিয়া খান তার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে ইসলামাবাদে যেতে আমন্ত্রণ জানান। শেখ সেখানে যেতে রাজি না হলে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খানকে ১১ জানুয়ারি ঢাকায় আসতে হলো। ১২ তারিখে তারা প্রথম দফা বৈঠকে বসলেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার চিফ স্টাফ অফিসার জেনারেল পিরজাদা ও গভর্নর আহসান যোগ দিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব কোনো উপদেষ্টা ছাড়া একাই এ বৈঠকে বসেন। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে। পরদিন উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ যোগদান করেন। আলোচনা শেষে আবারও শেখ মুজিব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান এবং বলেন, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ ঢাকা অনুষ্ঠান করতে সম্মত। ইয়াহিয়া খানও মুজিবের বক্তব্য সমর্থন করে ১৪ জানুয়ারি

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ঢাকা ত্যাগ করেন। তারপর ১৭ জানুয়ারি তিনি তার সমস্ত উপদেষ্টাকে নিয়ে লারকানায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়িতে গিয়ে ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে আর কী আলোচনা হয়েছে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদও লারকানায় এসে আলোচনায় মিলিত হন। সংগত কারণেই এই বৈঠক অনেকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, অনেকে তো এটাকে 'লারকানা ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এই অচলাবস্থা যে চলতে দেওয়া যায় না, তা উভয় পক্ষের কাছেই পরিষ্কার ছিল।

নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী দলের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তা অত্যন্ত করুণই বলা চলে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে ইয়াহিয়া খান ও তার সামরিক প্রশাসনের একটার পর একটা মূর্খতামূলক সিদ্ধান্ত দেশকে যে কঠিন পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তা আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটা সুযোগ এসে গেল। ১৭ জানুয়ারি রোববার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী ছাত্রসংঘের একটা বিশেষ সদস্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্যরা এবং পূর্ব পাকিস্তান মজলিশে শুরার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ইসলামি বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও দেশের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আশঙ্কা ইত্যাদি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর হয়। জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জনাব খুররম জাহ মুরাদ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় নেওয়া সিদ্ধান্ত আমাদের অবহিত করেন। তাতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হওয়ার কর্মসূচি নিলেও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি এই ধারণা নিয়ে আমরা ঘরে ফিরলাম যে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে আমাদের সরাসরি কোনো ভূমিকা যেহেতু নেই, সুতরাং আমাদের ভূমিকা শুধু পরিস্থিতির সার্বিক গতির দিকে সতর্ক নজর রাখা এবং অবস্থা বিচার করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে কোনো অবস্থাতেই কোনো পক্ষের অসমীচীন অথবা চরমপন্থি কোনো পদক্ষেপের সমর্থন আমরা দেবো না। ওই ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করব।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

২৭ জানুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং কয়েক দফা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। একবার তো দুই নেতা ৫ ঘণ্টাব্যাপী বুড়িগঙ্গায় নৌবিহারে একান্ত আলোচনা চালান, কিন্তু মুখে তারা যাই বলুন, একথা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে উভয়পক্ষই তাদের অবস্থানের ওপর অনড় থাকায় আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ৩০ জানুয়ারি ভুট্টো ফিরে যান এবং সেদিনই একটা ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক হয়ে লাহোরে অবতরণ করে। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমান ক্রমাগত চাপ দিতে থাকলে বাধ্য হয়েই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘোষণা সামরিক জান্তা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ভীষণভাবে বিচলিত করে, তাই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রাওয়ালপিন্ডিতে এক বৈঠক করে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের নীলনকশা তৈরি করে। ৩১ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কোনোভাবেই হতে দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি এমপি ঢাকায় গেলে তাদের 'টাঙ্গে তোড় দেঙ্গে'— পা ভেঙে দেবো। অন্যদিকে ভুট্টোর সহযোগী সামরিক ডিপস্টেট এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য ইয়াহিয়া খানের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। তারা ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণাসহ একটা বিবৃতি তৈরি করে তা রেডিওতে পড়ে শোনানোর জন্য প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান বিবৃতিতে দস্তখত করেছেন বটে, কিন্তু নিজে রেডিওতে ভাষণ দিতে অস্বীকার করেন।

নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিলে বলা হয়েছে যে ২৮ ফেব্রুয়ারি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পিরজাদা গভর্নর আহসানকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই খবরে অত্যন্ত বিচলিত হন এবং শেখ মুজিবকে ঘোষণার আগেই মানসিকভাবে তৈরি করে নেওয়ার জন্য তাকে গভর্নর হাউজে নিয়ে আসা হয়। অন্যান্য আলোচনার পর গভর্নর আহসান শেখ মুজিবকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন, উপস্থিত সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে এত বড় কঠিন সংবাদও শেখ মুজিবকে খুব একটা বিচলিত করল না। তিনি শান্তভাবেই গভর্নর আহসানকে আশ্বাস দিলেন যে, এ নিয়ে তিনি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবেন না। যদি মার্চ মাসের মধ্যেই নতুন কোনো তারিখ দেওয়া

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হয়, তাহলে তিনি পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন। কিন্তু তারিখ এর পরে দিলে অথবা অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তটা অনির্দিষ্টকালের জন্য হলে তার পক্ষে পরিস্থিতি সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেদিন গভর্নর হাউজ থেকে বেরোবার সময় শেখ মুজিব জেনারেল রাও ফরমান আলীকে নাকি বলেছিলেন, আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার দুপাশে জ্বলছে আগুন। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, নয়তো আমার দলের চরমপন্থিরা। তিনি নাকি আরও বলেছিলেন, আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট কেন করছেন না? শুধু টেলিফোন করে দিলেই আমি চলে আসব। গভর্নর আহসান ও তার সহকর্মীরা মুজিবের বিকল্প প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামাবাদকে টেলিফোনে অবহিত করেন। তারা বলেন যে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মার্চ মাসের মধ্যেই নতুন কোনো তারিখ দিয়ে তা-ও যেন ঘোষণা করা হয়।

১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ইয়াহিয়া খানের এই বিবৃতি রেডিও-টেলিভিশনে পড়ে শোনানো হয়। এতে মার্চের ৩ তারিখ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশন পরবর্তী কোনো তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি এই ঘোষণা অগ্নিকুণ্ডে যেন নতুন করে ঘি ঢেলে দিলো। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা পূর্ব পাকিস্তান। মিছিলে মিছিলে ছেয়ে গেল সমস্ত ঢাকা। স্টেডিয়ামে চলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা মুহূর্তে পণ্ড হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বন্দুকের দোকানসহ বিভিন্ন দোকানপাটে লুটতরাজের তাণ্ডব।

মনে হলো এক নিহত নগরীর রাজপথ ধরে চলছি। নগরীর নাম ঢাকা। ছেলেবেলায় সাধারণ জ্ঞানের বইতে ঢাকা নামের অনেক তাৎপর্য পড়েছি। যেমন ঢাক পিটিয়ে তার আওয়াজ অনুসরণ করে এই নগরীর পরিধি নিরূপণ করা হয়েছিল। তাই এর নাম ঢাকা। এ ছাড়া এর আরেকটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাও রয়েছে— ঢাকেশ্বরী দেবীর 'স্থান' বলেই এর নাম নাকি ঢাকা। অবশ্য বেশির ভাগ লোকই মনে করেন, শহরের পত্তনের পরই প্রথামতো ওই দেবী এসে শহরটার ওপর ভর করেছিলেন। সুতরাং শহর আগে না দেবী আগে— এ নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু ঢাকা নামের যথার্থ সার্থকতা দেখছি আজ। বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মহননের আচ্ছাদনে গ্লানি, পরাজয় ও অবিশ্বাসের একহাত পুরু গলিজ আবর্জনায় ঢাকা এক শহর, তার নাম ঢাকা। কিন্তু নগরীর বাহ্য অবয়বে সেদিন যে চিহ্ন ছিল তা পরাজয়ের নয়; বরং ছিল বিদ্বেষের, বিদ্রোহের। সমান-অসমান অসংখ্য লাঠি হাতে অগণিত মানুষ উন্মত্তের মতো

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ছুটে চলেছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে নেতাগোছের প্ররোচকেরা উসকানি দিয়ে চলছে— চলো, ভাঙো, আগুন লাগাও। কিন্তু কেন? না— দেশ স্বাধীন হবে। পাকিস্তানের জুলুম আর বরদাস্ত করা হবে না। জল্লাদ ইয়াহিয়া আবারও পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। এটা বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুশমনি। সুতরাং আর নয়।

পূর্বদেশ অফিসের পাশেই হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি দলের বৈঠক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিলের পর মিছিল এসে জমায়েত হতে শুরু করল পূর্বাণী হোটেলের সামনে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু যেন মুহূর্তেই গভর্নর হাউজ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল পূর্বাণী হোটেলে। স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সারা মতিঝিল। বেলা ২টার সময় শেখ মুজিব আহ্বান করলেন সংবাদ সম্মেলন। *পূর্বদেশ*-এর পক্ষ থেকে আমি এলাম এই সম্মেলন কাভার করতে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কি বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পেরেছিল যে তাদের এই চরম আহাম্মকি ঘোষণা কীভাবে দেশটাকে একটা চরম দুর্যোগপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে নিয়ে যাবে? পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষ তো আর আওয়ামী লীগার ছিল না, অনেকেই আমার মতো ছিল সাধারণ বাঙালি, আর সেই সঙ্গে মুসলমানের একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। এ ধরনের মানুষ এই সময়ে কি কঠিন মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, তার মুখোমুখি হলাম আমি নিজেই।

আমার চেতনার প্রতিটি অনুকণায় লাখো শহিদের রক্তে গড়া এই পাক-ভূমির জন্য আজন্মলালিত এক ভালোবাসা ছিল। তাই স্লোগানের বক্তব্য হজম করতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল আমার। কিন্তু এটুকুতেই যদি ফুরিয়ে যেত, তাহলে কথা ছিল না। কিছু পরে বেল-বটম পরা জনাকয় ধানমন্ডিওয়ালা চ্যাংড়া ছেলে পাকিস্তানের এক বিরাট পতাকা নিয়ে এলো। হোটেলের আঙিনার বাইরে অপেক্ষমাণ একটা মিনিবাসের ছাদে চেপে দাঁড়াল তারা। তারপর একজন সামরিক রেজিমেন্টের পতাকা দোলাবার ভঙ্গিতে বাঁকা করে ঝুলিয়ে ধরল পতাকাটা। অন্য একজন এসে দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলো তাতে। এতদিন যাকে ঐক্য-সংহতি ও মর্যাদার প্রতীক বলে ভেবে এসেছি, আধো চাঁদ অঙ্কিত সেই প্রিয় সবুজ নিশান আমার চোখের সামনেই একটু একটু করে জ্বলতে লাগল। সেই সঙ্গে যেন আগুন লাগিয়ে দিলো আমার সমস্ত অন্তর-

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মনে। যদিও বাস্তবিকতার বিচারে পতাকাটা শুধু একখণ্ড কাপড় ছাড়া কিছু নয়, একথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু তবু সুদূর শৈশব থেকে এই কাপড়ের টুকরোটুকু নিয়ে অগণিত ছন্দ-গান-কবিতায়, বক্তৃতা ও ভাষণে ভালোবাসার ছোঁয়ায় সিক্ত স্বপ্নভরা প্রায়-পৌত্তলিক এক সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলেছিল আমাদের মনে। সেই পতাকার গায়ে সামান্যতম আঁচড় লাগলেও তা যেন নাগরিকদের মনে রক্তক্ষরণ ঘটায়। মুহূর্তের জন্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো আমার সব অনুভূতি। মনে হলো পূর্বাণীর প্রাঙ্গণে আমি নেই, হাফপ্যান্ট পরা বালক আমি বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে প্রাথমিক স্কুলের প্রাতঃকালীন অ্যাসেম্বিলিতে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে উড়ছে সাদা সবুজের দোলা লাগানো পাকিস্তানের মায়াবী জাতীয় পতাকাটা। সবাই উদাত্ত স্বরে গাইছে সবুজ সেই জীবনের কলসংগীত, 'শস্য শ্যামলা এই ধরার ইঙ্গিত, উড়াও উড়াও আজি কওমি নিশান, আমাদের কওমি নিশান' অথবা কবিতা 'আধো চাঁদ আঁকা তারার কেতন নিশান আমার— নিশান আমার...'। হঠাৎ এক উচ্চকিত আহ ধ্বনি আমাকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। দেখলাম, আমার পাশে লাঠি হাতে মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। ব্যথামলিন তার দুচোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। আশ্চর্য হলাম, অথচ এই ভদ্রলোকই এতক্ষণ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে স্লোগান ধরছিলেন 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। চোখ তুলে তাকালাম, পতাকাটা তখনো জ্বলছে। কানের কাছে অনুচ্চ স্বরে একজন বলে উঠলেন, এ জাতির ভাগ্যেই আগুন লাগল আজ। ভাবলাম, শুধু পতাকাটা তো নয়, এর সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে শুরু করেছে গোটা দেশটাও। ওরা স্লোগান দিয়ে উঠল— 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্তান'! ভাবলাম, দেশটা কি শুধু জিন্নাহ মিয়ার ছিল?

পূর্বাণী হোটেলের নির্দিষ্ট কনফারেন্স রুমটা ততক্ষণে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য। কিছুক্ষণ পর শেখ সাহেব প্রবেশ করলেন এবং খুব বেশি দেরি না করেই বক্তৃতা শুরু করলেন। ইংরেজিতে দেওয়া এই বক্তৃতায় তিনি বললেন, কেন্দ্রীয় সরকার একটা সংখ্যালঘু দলের অন্যায় চাপের মুখে নতি স্বীকার করে গণতান্ত্রিক মূলনীতি লঙ্ঘন করেছে। অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা একটা সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। আমরা বিনা প্রতিবাদে এই অন্যায় মেনে নেব না, এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলব দুর্বার প্রতিরোধের আন্দোলন...। এই আন্দোলনের সূচনা হিসেবে আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার সারাদেশে হরতাল পালিত হবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সাংবাদিকেরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শেখ মুজিবের মুখের দিকে। এ ধরনের সাংঘাতিক একটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সবাই আশঙ্কা করছিল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। তার বক্তব্যে উত্তাপ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা তিনি পেশ করলেন অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ভাষায়। মোটামুটি সেই মুহূর্তেই যা অনেকেই তার কাছ থেকে আশা করছিল, সেই একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা (ইউ ডি আই) তো দূরে থাক, কোনো রকমের বিদ্রোহাত্মক কোনো উক্তিও তার মুখ থেকে বের হলো না। সাংবাদিকেরা তো বটেই, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন কর্মকর্তারাও এই বক্তব্যে অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিলে বলা হয়েছে যে সংবাদ সম্মেলন শেষ করেই শেখ মুজিব সরাসরি গভর্নর হাউজে চলে আসেন। তিনি গভর্নর আহসানকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, এখনো সময় আছে, নতুন তারিখ ঘোষণা করলে হয়তো আমি জনগণের আক্রোশ সামলাতে পারব। তা না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। শেখ মুজিবের এই বার্তা গভর্নর আহসান ইসলামাবাদে যথাসময়ে পৌঁছালেন, তিনি কথা বললেন জেনারেল পিরজাদা ও জেনারেল হামিদের সঙ্গে। কিন্তু লাভ তো কিছু হলোই না, উল্টো চাকরি গেল গভর্নর আহসানের।

জনাব নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, মৌলবি ফরিদ আহমদসহ অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টের অধিবেশন অন্যায়ভাবে বাতিল করার তীব্র নিন্দা করে পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন।

কিন্তু উগ্রপন্থি উসকানিদাতাদের চক্রান্ত মুজিবের সংযম ও ভারসাম্য আনার সব চেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিলো। শুরু হয়ে গেল অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডের এক নারকীয় মহোৎসব। আর এর শিকার হলো অসহায় অবাঙালি মোহাজের সম্প্রদায়। শুধু উর্দু ভাষায় কথা বলা ছাড়া এই মজলুমদের অন্য কোনো দোষ ছিল না— এ কথা তার উগ্রপন্থি কর্মীবাহিনী বুঝুক আর না বুঝুক, শেখ মুজিবের কাছে মোটেই অপরিষ্কার ছিল না। ২ মার্চ বাধ্য হয়েই মুজিব বক্তব্য দিলেন এবং বললেন, মনে রাখতে হবে যে ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশে যারা বাস করেন, আমাদের কাছে তারা সবাই বাঙালি, তাদের জানমাল ও সম্মান আমাদের কাছে পবিত্র আমানত। তিনি অনতিবিলম্বে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে বিরত হওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। অবশ্য সেই সঙ্গে নিজের দলকে খুশি রাখার জন্য মুজিব অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানালেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ৩ মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং মার্চের ৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

৩ মার্চ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো জনসভা। শেখ মুজিব এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর পক্ষ থেকে আমি জনসভা রিপোর্ট করার জন্য গেলাম। সভার শুরুতে তথাকথিত জাতীয় ছাত্রনেতারা এবং কয়েকজন শ্রমিকনেতা বক্তৃতা করলেন। তারা প্রায় সবাই মুজিবের কাছে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য আকুল আবেদন জানালেন। বললেন: মুজিব ভাই, সারা জাতি আপনার দিকে চেয়ে আছে, আপনি শুধু ডাক দিন, দেখবেন বাংলার মানুষ যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেখলাম, শেখ সাহেব মঞ্চের মাঝখানে মুখের ওপর দুহাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন, আর লম্বা চুল হাতের ওপরে ছড়িয়ে আছে। আমার যতদূর মনে হয় পুরো সভায় এই অবস্থা থেকে একবারও মুখ তুলে চাইতে দেখিনি। সবশেষে যখন প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব দাঁড়ালেন, একরকমের বিষাদময় গম্ভীর কণ্ঠে যা বললেন, তাতে ছাত্রনেতাদের উসকানিমূলক বক্তৃতার কোনো অনুমোদন তো ছিলই না, বরং তিনি তার অনুসারীদের একরকমের তিরস্কার করেই বললেন, আমাকে যদি ভালোবাসো, তাহলে এই মুহূর্তেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা জুলুম-নির্যাতন এবং অবরোধ প্রত্যাহার করো, অবাঙালিদের ওপর হামলা অনতিবিলম্বে বন্ধ করো, তারা আমাদের ভাই, তাদের দোষ নাই, কেন তাদের ওপর হামলা করা হবে? তিনি বললেন, ক্যান্টনমেন্টের পানি এবং খাদ্য সরবরাহ চলতে দিতে হবে। অপরাধ নেতাদের, সাধারণ সৈনিকদের তো কোনো দোষ নাই— তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কেন করা হবে? সভাশেষে সেভাবেই রিপোর্ট লিখলাম, আমাদের নিয়মিত অভ্যাসমতো। অন্যান্য পত্রিকা আমার সমমানের রিপোর্টাররা একে অন্যের সঙ্গে তাদের রিপোর্ট আলোচনা করে দেখলেন যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ গেল কি না। রিপোর্ট জমা দিয়ে বেশ রাতে ঘরে গেলাম, কিন্তু পরদিন সকালে অফিসে এসে দেখি আমাদের দেওয়া রিপোর্টের কিছুই ছাপা হয়নি। উল্টো প্রথম পাতায় আট কলামে বিশাল শিরোনাম দেওয়া হয়েছে— নেতায় আর জনতায়— মাঝখানে বিশাল জনসমুদ্রের ছবির মাঝখানে কেটে শেখ মুজিবের মুখমণ্ডলের একটা ছবি ইনসেট করা। রিপোর্টে ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের বক্তব্য এবং প্রস্তাবাবলি তো ছাপা হয়েছে, কিন্তু মুজিবের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে এমন সব কথা, যা তিনি বলেননি। আর যা বলেছেন তা গেছে বাদ। প্রায় সব পত্রিকায় একই ধরনের রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। বুঝলাম, রাতের বেলায় বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা বিভাগের কর্তারা একরকম সিন্ডিকেট করেই নতুন রিপোর্ট তৈরি করেছেন। ফল যা হওয়ার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তাই হলো, শেখ মুজিবের কণ্ঠরোধ করে সংখ্যালঘু মোহাজেরদের ওপর একতরফা নির্যাতনের তাণ্ডব চলতে থাকল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। আর এই জঘন্য নির্যাতনের কোনো খবরই কোথাও প্রকাশিত হলো না। অন্যদিকে ইসলামাবাদের নির্দেশে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ২ মার্চ থেকে সৈন্য মোতায়েন করা হলো, কারফিউ এবং গুলিবর্ষণ করে জনতার রুদ্ররোষের মোকাবিলার চেষ্টা করা হলো। মার্চের ৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায় দেড় শ লোকের মৃত্যু এবং আরও বহু শত মানুষের আহত হওয়ার খবর বের হলো। অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করল এই সংবাদ।

শেখ মুজিবের অনুরোধে বাধ্য হয়ে ঢাকা সামরিক কর্তৃপক্ষ ইসলামাবাদের অনুমতি নিয়ে ৫ মার্চ সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিলেন। শেখ মুজিব আশ্বাস দিলেন যে পরিস্থিতির মোকাবিলা তিনি নিজেই করবেন। প্রয়োজন হলে আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নেবেন। জেনারেল ইয়াকুব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবিলম্বে প্রেসিডেন্টকে ঢাকায় আসার জন্য চাপ দিলেন। তিনি বললেন, যতই একেকটা ঘণ্টা পার হচ্ছে, ততই পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রথমে আশ্বাস দিলেও ইয়াহিয়া বারবার মত বদলাচ্ছিলেন, পরে জেনারেল ইয়াকুবকে সরাসরি টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিশ্চিত ঢাকায় এসে কোনো ফায়দা হবে না, তাই তিনি আসছেন না। বিফল মনোরথ হয়ে জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করলেন। ৬ মার্চ জেনারেল ইয়াকুব ও অ্যাডমিরাল আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে পরদিন তাদের দুজনকেই ইসলামাবাদে ফিরে যেতে হবে। ইয়াহিয়া খান দুজনের পরিবর্তে পাঞ্জাবের সামরিক প্রশাসক ও কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে একসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ও গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বাড়াবাড়িতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররাও কতটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণ মেলে সেই রাতে জেনারেল ইয়াকুব শেখ মুজিবকে টিক্কা খান সম্পর্কে যে ব্রিফিং দিয়েছিলেন তা থেকে। তিনি বলেন, একজন সাধারণ সৈনিক থেকে পদোন্নতি পেয়ে টিক্কা খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়েছেন, সুতরাং মনিবদের খুশি করার জন্য তিনি যেকোনো কিছু করতে পারেন। নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি বুচার অব বেলুচিস্তান আখ্যা পেয়েছিলেন। যদি শেখ সাহেব রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তবে টিক্কা খানের পক্ষে ময়দানের ওপর বোমাবর্ষণ করাও অসম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে নিয়োগ দেওয়া এককথা, আর সেই নিয়োগ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। খবরের কাগজের সাংবাদিক হিসেবে সারা শহর ঘুরে ঘুরে আমরা যা দেখছিলাম তা হলো, মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দেশের প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের নয়, বরং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নির্দেশমতোই চলছিল। সেক্রেটারিয়েট আমলারা সরকারের নির্দেশের কোনো তোয়াক্কাই করছিল না, বরং মুজিবের নির্দেশেই প্রাদেশিক প্রশাসন পরিচালনা করছিল। এই অসহযোগ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার বাস্তব প্রমাণ মেলে একটা ঘটনা থেকে। ৯ মার্চ টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করার চেষ্টা করলে স্বয়ং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বদরউদ্দিন সিদ্দিকী শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সরাসরি অস্বীকার করেন।

ইয়াহিয়া খানের এই সিদ্ধান্তহীনতা আর কিছু হোক না হোক, আওয়ামী লীগের তরুণ সমর্থকদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলল যে গণতান্ত্রিক পথে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে না। এজন্যে মুজিবকে একরকম পাশ কাটিয়েই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা পৃথকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মার্চের ৬ তারিখে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের মিটিংয়ে যখন শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছিলেন, বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া এবং আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্ত শাসনের জন্য— ঠিক সেই সময়ই সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (সাবেক ইকবাল হল) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হাইকমান্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও আনসারদের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিল একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পক্ষে তাদের সমর্থন হাসিল করার জন্য। এর আরও প্রমাণ মেলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইতে। এতে তিনি লিখেছেন, সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিশিষ্ট চিকিৎসক ফজলে রাব্বী সাহেব তাকে জানিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে কয়েক হাজার তরুণের এক সংগ্রামী মিছিল, সেই সকালেই তিনি দেখে এসেছেন। তারা শেখকে পরদিন রেসকোর্সের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে একরকম বাধ্য করার চেষ্টা করছে, এমনকি তারা হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছে যে এই দাবি না মানলে শেখ সাহেবকে জনসভায় যেতেই দেওয়া হবে না। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান টেলিফোনে ও টেলিপ্রিন্টার মেসেজের মাধ্যমে শেখ মুজিবের ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, যেন মুজিব জনসভায় কোনো একতরফা চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করেন। ইয়াহিয়া যত

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রকমের আশ্বাস দেওয়া যায় তার সবই মুজিবকে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবও নিজে ঢাকায় এসে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানালেন। এই চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই মুজিব উভয় দিক রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। তিনি সম্ভবত আশঙ্কা করছিলেন, জনজাগরণের যে দৈত্যকে তিনি নিজে জাগিয়ে তুলেছেন, সেই দৈত্যই এখন হয়তো তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গভর্নর আহসান ও চিফ মার্শাল ল প্রশাসক জেনারেল ইয়াকুব বিদায় হওয়ার পর সেই রাতে পূর্ব পাকিস্তান শাসনের দায়িত্ব জিওসি জেনারেল খাদেম হোসেনের ওপর এসে পড়ে। গভীর রাতে শেখ মুজিব গোপন এক বার্তাসহ তার দুজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে জিওসির বাড়িতে পাঠালেন। সেখানে ডিউটিরত অফিসাররা জিওসিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আনলে মুজিবের প্রতিনিধি দুজন তাকে জানালেন যে শেখ মুজিব একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তার দলের চরমপন্থিদের ভীষণ চাপের মুখে আছেন, তাদের উপেক্ষা করার শক্তিও তার নেই। তাই তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন আজ রাতের মধ্যেই যেন তাকে সেনাবাহিনীর হেফাজতে নিয়ে আসা হয়। জিওসি মুজিবের প্রশংসা করে বললেন যে তিনি জনপ্রিয় নেতা, চাপের মোকাবিলা কেমন করে করতে হয় তিনি ভালোই জানেন। জিওসি আশ্বাস দিলেন যে মুজিবকে রক্ষা করার জন্য রেসকোর্সের জনসভায় তিনি নিজেই হাজির থাকবেন। সেই সঙ্গে কঠিন হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করলেন যে শেখ সাহেব যদি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন, তাহলে আমরা সম্ভাব্য সব উপায়ে তার মোকাবিলা করব। প্রয়োজন হলে ঢাকাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। No one will be left to rule or be ruled— শাসন করার জন্য কেউ থাকবে না, শাসিত হওয়ার জন্য কেউ থাকবে না।

রেসকোর্সের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মঞ্চের সঙ্গেই সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলগুলোতে সেই ঐতিহাসিক জনসভার সংবাদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শুধু জনসভা নয়, সেদিনের সেই মহাসমাবেশকে জনসমুদ্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতে শহরের প্রায় মাঝখানে গড়ে তোলা এই বিশাল ময়দানে বাঁধনহীন মহাপ্লাবনের মতো দশ দিক থেকে ভেসে আসছিল অবিশ্রান্ত জনতার জোয়ার। যেদিকে দৃষ্টি দিই, নজর আসে শুধু মানুষ আর মানুষ। সংখ্যা যে কত হবে সঠিক করে বলা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মুশকিল, তবে কয়েক লাখ নিশ্চয়ই। বিরাট উন্মুক্ত মঞ্চের পেছনটাজুড়ে সাদা কাপড়ের ওপর আঁকা পূর্ব পাকিস্তানের এক মস্ত বড় মানচিত্র ঝুলছে। বোঝা গেল আওয়ামী লীগের তরুণ চরমপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদী আয়োজকেরা বক্তৃতার সময় শেখ মুজিব যেন কোনোমতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ভুলে না যান, তার জ্বলন্ত স্মারক হিসেবে এই আয়োজন করেছে। সভামঞ্চে এটাই শুধু একমাত্র প্রতীকী আয়োজন ছিল না, সভার শুরুতেই শেখ সাহেবের সামনে এক খাঁচা সাদা পায়রা এনে দেওয়া হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিব পায়রাগুলো উড়িয়ে দিলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার আনন্দে পাখা মেলে পতপত করে আকাশে উড়ে গেল সব কটি পায়রা, শুধু একটা ছাড়া। খাঁচার ভেতরে হয়তো তার ডানায় আঘাত লেগে থাকবে, ডানা ভেঙে পায়রাটা পড়ে গেল, কিন্তু পড়ল এসে একেবারে মঞ্চের পেছনে বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্রটার ওপর। আর যায় কোথায়,পরদিন আমাদের পত্রিকার আবদুল গাফফার চৌধুরী তার 'তৃতীয় মত' কলামে এ নিয়ে খুব রসিকতা করতে ছাড়লেন না। লিখলেন, মুজিবের স্বাধীনতার ডানা ভেঙে গেছে। অদৃষ্টের পরিহাস, ভোল পাল্টাবার জাদুকর সেই গাফফার চৌধুরীই পরবর্তীকালে সেজেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও আওয়ামী লীগের মহাগুরু।

রেসকোর্সের ময়দানটা তখন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগানে স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সবার নজর শেখ মুজিবের দিকে— অস্থির আগ্রহ নিয়ে সবাই প্রতীক্ষা করছে শেখ মুজিব কী বলেন তা শোনার জন্য। বেলা আড়াইটার দিকে শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। শোনা যায়, তার কাছে নাকি বক্তৃতার দুটো খসড়া দেওয়া হয়েছিল— একটা সিরাজুল আলম খানের লেখা, যাতে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; অন্যটি শেখের নিজের দেওয়া নির্দেশ অনুসারে তার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের লেখা।

সার্বিক অবস্থার বিচারে শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত যে বক্তৃতা দিলেন, তা সম্ভবত দুটো ড্রাফটের কোনোটিই নয়, বরং এ দুটি বক্তৃতার মূল পয়েন্টগুলো নিয়ে তিনি নিজের মতো করেই কথা বললেন। সভায় ইয়াহিয়া খানের একতরফা অসমীচীন ও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলোর ফিরিস্তি দিয়ে তার তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলে আমরা অংশগ্রহণ করতে রাজি হলাম, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩৫ জন সদস্য এসে হাজির হলেন। অথচ শুধু ভুট্টোর গোয়ার্তুমির কাছে অনেকটা আত্মসমর্পণ করে প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতির এই অবনতি ঘটিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এখন তিনি আবার ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি ডেকেছেন, কীসের অধিবেশন? কার সঙ্গে কথা বলব? রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি— নিহত দেশবাসীর লাশ টপকে আমরা অ্যাসেম্বলিতে যাব না। অধিবেশন করতে হলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তিনি অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং প্রশাসনের সব বিভাগে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা ঘোষণা করলেন। কিন্তু সবশেষে মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। বললেন, যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন, রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!

শেখ মুজিবের বক্তৃতায় উষ্মা ও উত্তাপের অভাব ছিল না, কিন্তু যা ছিল না তা হলো— স্বাধীনতার কোনো পরিষ্কার একতরফা ঘোষণা। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে মুক্তি ও স্বাধীনতা শব্দ দুটি ব্যবহার করলেও এমন কিছু তিনি বলেননি, যা দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্নতার অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা যায়। এমনকি জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেনও নাকি মন্তব্য করেছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বক্তৃতা ছিল।

৭ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আযম ২৫ মার্চ তারিখে নতুন করে অধিবেশন আহ্বানের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন: প্রেসিডেন্ট যেসব কারণ দেখিয়ে ৩ তারিখের অধিবেশন স্থগিত করলেন, সেসব কারণ কি দূর হয়েছে? না হলে পরিষদের অধিবেশন ডাকা হলো কীভাবে? ভুট্টো সাহেবই-বা এখন মুজিবের সঙ্গে কোনো সমঝোতা ছাড়াই অধিবেশনে আসতে রাজি হলেন কেমন করে? অধ্যাপক আযম আরও বললেন: ইয়াহিয়া খান, আপনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার সুযোগ না দিয়ে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে আপনার শাসন সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে আপনাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানের অস্তিত্বের স্বার্থে আপনি অবিলম্বে ক্ষমতা ত্যাগ করুন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ৯ তারিখে 'দেশকে রক্ষা করুন' শিরোনামে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এসব নেতার মধ্যে ছিলেন নবাবজাদা নসরুল্লা খান, মিয়া নিজাম উদ্দিন, খাজা খয়ের উদ্দিন, খান এ সবুর, নুরুল আমিন ও আতাউর রহমান খান। একই দিনে ইসলামী ছাত্রসংঘের পক্ষ থেকে আমরাও সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বললাম: তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অন্যায়ভাবে মুলতবি করার ফলে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণেই দেশে বর্তমান মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সামরিক সরকার বিষয়টা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার যদি দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ চায়, তাহলে তাদের উচিত একমুহূর্ত বিলম্ব না করে সামরিক শাসন তুলে নেওয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এ ছাড়া সংকট উত্তরণের আর কোনো বিকল্প নেই।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ বিশেষ করে দলের জেনারেল সেক্রেটারি তাজউদ্দিন আহমদ প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রশাসনিক ফরমান ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্চের ১০ তারিখে সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের সমরসজ্জার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিনই অস্ত্রশস্ত্র আনা হচ্ছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতিসংঘের কর্মচারীদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কঠিন সমালোচনা করে বলেন, শুধু এতেই সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব শেষ হয় না।

ভুট্টোর পিপলস পার্টি সম্ভবত দিবাস্বপ্ন দেখছিল যে মুজিবের দল থেকে কিছুসংখ্যক নেতা ও এমপিকে পটিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে তিনি সারা দেশের শাসনক্ষমতায় আসতে পারবেন। সম্ভবত তার আন্তর্জাতিক প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১১ মার্চ তারিখে তিনি লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকায় এক ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন নিয়ে তাতে বলেন: আওয়ামী লীগে এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যারা পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমস্যা সমাধানে যোগ দিতে পারেন, তাদের বাধা দেওয়া শেখ মুজিবের জন্য উচিত হবে না।

গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে না পারলেও টিক্কা খান প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে কাজ শুরু করলেন, কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন করতে পারলেন না। ১৩ মার্চ তারিখে তিনি সামরিক বিভাগে কর্মরত বেসরকারি কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগদান না করলে বরখাস্ত করার হুমকি দিয়ে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

এক নির্দেশনা জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিব পাল্টা নির্দেশনা জারি করলেন, টিক্কা খানের হুকুম না মেনে আগের মতোই কাজ বয়কট জারি রাখার জন্য। কর্মচারীরা টিক্কা খানের নয়, বরং শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুসারেই অসহযোগ চালিয়ে যেতে থাকলেন। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আযম সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন: সামরিক সরকারের এখন বোঝা উচিত যে বুলেট ও বেয়নেটের দ্বারা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করা যায় না, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সেই মুহূর্তে শেখ মুজিবের আহ্বানে জাগ্রত জনতার সাড়া প্রদানের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কিছুটা ফিরে এসেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা।[১৩]

একই দিনের অন্য বিশেষ ঘটনা হলো পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর শহরে পিপলস পার্টি ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সব সদস্য এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে জাতীয় পরিষদে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবের দেওয়া চার দফা শর্ত তারা পুরোপুরি মেনে নেবেন এবং তারা আরও দাবি করেন যে ২৫ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে সরকার গঠন করে ফেলতে হবে[১৪]। এসময় পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রাথমিক প্রস্তাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকল। মুজিবের কাছে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে তিনি ঢাকায় এসে শেখের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ১৪ তারিখেই করাচির এক জনসভায় তিনি পরামর্শ দিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে যেন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনতন্ত্র এদেশে এখন আর চলতে পারে না।[১৫]

দুঃখ হয় দেশটার ভাগ্য নিয়ে তিনজন স্বার্থান্বেষী নেতা কীভাবে ছিনিমিনি খেলছেন তা দেখে। কে সত্য বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন, তাদের বক্তৃতা-

---

১৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ মার্চ ১৯৭১।

১৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩৬।

১৫. *The Dawn*, 16th March 1971.

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

বিবৃতি পড়ে বোঝার কোনো কায়দা নেই। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার অবস্থা দেখে বোঝার কোনো কায়দাই ছিল না যে এটা দেশের স্বাধীনতা দিবস। প্রেসিডেন্ট হাউজ, গভর্নর হাউজ এবং ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া শহরের আর কোথাও উড়ল না জাতীয় পতাকা। শেখ মুজিবের বাড়িতে ঘটা করে উত্তোলন করা হলো নতুন এক পতাকা, যা তৈরি হয়েছে সবুজ জমিনের মাঝখানে সোনালি রঙের পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র দিয়ে। *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকা আফসোস করে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করল, 'পাকিস্তানের খোদা হাফেজ' শিরোনামে। ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক বাণীতে একরাশ অর্থহীন শব্দভরা ভুয়া আশার বাণী শোনালেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে একটা সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের উপযোগী সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন, সেজন্য বর্তমানে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু রাজনৈতিক সংকট দূর হওয়ার পরিবর্তে পরিস্থিতি আরও জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত মোটামুটিভাবে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের আদলে তৈরি করা খসড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা আওয়ামী লীগকে অত্যন্ত নিরাশ করল। কিন্তু তারপরও দেশটাকে কোনো রকমে এক রাখা ও ভুট্টোর দাবি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসনে তাকেও খানিকটা জায়গা করে দেওয়ার জন্যই আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার জন্য একটি বিকল্প খসড়া প্রণয়ন করে তা আলোচনার জন্য পেশ করল। এই ঘোষণায় দেশের নাম আগের মতোই ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান বজায় রাখা হলো এবং বলা হলো সামান্য সংশোধনসাপেক্ষে আপাতত ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হবে। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। তিনি প্রয়োজন অনুসারে তার উপদেষ্টা, অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো বাতিল ও স্থগিত করার ক্ষমতা রাখবেন। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের একটা পরিকল্পনা পেশ করা হলো। শুধু পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের নামকরণে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হলো, ১৯৬২সালের আইয়ুব খান কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্টেট অব বাংলাদেশ নাম ব্যবহার করার অনুমতি রেখেছিলেন, সেভাবেই প্রদেশটির নামকরণ করা হলো। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) ব্যাপারে ১২টি বিষয়ে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হলো। এগুলো হচ্ছে— প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশি অনুদান ছাড়া সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতি, সিটিজেনশিপ, ন্যাচারালাইজেশন এবং এলিয়েন বা বিদেশিদের দেশে প্রবেশ ও দেশ থেকে বের করার ক্ষমতা, মুদ্রার লিগ্যাল টেন্ডার এবং ঘোষণার ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ, ওজন ও মাপের স্ট্যান্ডার্ড কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির মালিকানা, তা যে প্রদেশেই থাক না কেন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি থেকে খাজনা আদায়, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ তার যোগাযোগের সমন্বয় সাধন, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, স্পিকারের বেতন, জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও সুবিধাদি, ইমিউনিটি এবং সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে রাখা হলো।

শুরুতে মনে হচ্ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, এমনকি ভুট্টো সাহেবও আওয়ামী লীগের এই ঘোষণার প্রস্তাবের অধিকাংশই মেনে নিয়েছিলেন, অন্তত বিভিন্ন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করার সময় তাদের বক্তব্য শুনে তাই মনে হচ্ছিল। ২৩ ও ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের খসড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো এসব আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তানকে অতিরিক্ত কোনো অধিকার দেওয়ার প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে থাকলেন, বিশেষ করে ফেডারেল তালিকা থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুদান বাদ রাখার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি তুললেন। তার মতে, সামরিক শাসন তুলে দিয়ে শুধু প্রেসিডেনশিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ বেআইনি হবে। সম্ভবত এ জন্যই বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এ কে ব্রোহি সাহেবকে এ ব্যাপারে আইনগত মতামত দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খোলা বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুট্টো এবং সামরিক জান্তার চাপে ইয়াহিয়া খান পিছপা হলেন। ২৪ মার্চ বিকেলে উভয়পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুলতবি হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ কতটা হবে সে ব্যাপারে চরম দ্বিমতের কারণে। মুজিবের উপদেষ্টারা, বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদ মলিন মুখে সাংবাদিকদের বললেন, সরকারপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত আগামীকাল ২৫ মার্চ আমাদের জানাবে। কথাটা আমাদের কানে আশ্বাসের পরিবর্তে ব্যর্থতার পূর্বাভাসের মতোই শোনাল।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরোবার সময় চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহ ভাই জানালেন, পরদিন ২৫ মার্চ সকালে আমার ডিউটি শেখ সাহেবের বাড়িতে, পুরো সকালটা সেখানেই থাকতে হবে। ভাবছিলাম, শেখ মুজিব তো তখন বাড়িতে থাকার কথা নয়, প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় থাকবেন। খালি বাড়িতে আমি করব কী? তবে বললাম না কিছুই, চাকরি তো!— কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

উনত্রিশ

সেই ঘটনাবহুল ২৫ মার্চের সকালে শেখ সাহেবের বাড়িতে আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে এই আত্মজীবনীর সূচনা করেছি। তাই পুনরাবৃত্তি করে পাঠকদের বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই, শুধু ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সামান্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যোগ করব।

শেখ সাহেবের লনে একা বসে আছি আর ভাবছি দেশের জটিল অবস্থা এবং সাম্প্রতিক রাজনীতি সম্পর্কে। মনে হচ্ছিল মার্চ মাসের এই ২৪টা দিন যেন ছিল অনেক বেশি ঘটনাবহুল পাকিস্তানের ২৪ বছরের জীবনের চাইতেও। কী যে হয়ে গেল, আর কী যে হবে, তা কল্পনা করাও অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখ সাহেব বেরিয়ে এসে সোজা আমার পাশেই বসে পড়লেন। তার স্বভাবসুলভ আন্তরিকতার সুরে মৃদু হেসে বললেন, চৌধুরী, তুমি তো দেখি সাতসকালেই এসে গেছ। বললেন, তিনি আজ প্রেসিডেন্ট হাউজে যাননি, তবে তার উপদেষ্টারা গেছেন। তিনি বললেন, আলোচনা প্রায় ভেঙে গেছে, আমরা তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছি। আজকের বৈঠক শুধু এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার জন্যই। সম্ভবত আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার অজানা নেই বলেই শেখ সাহেব বললেন, দেখো, তুমি তো জানো আমি পাকিস্তান ভাঙতে চাইনি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালির অধিকার দিতে চায়না। নির্বাচনে জেতার পরেও তারা নানা রকমের টালবাহানা চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য। অনেক লম্বা রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম সেদিন শেখ সাহেবের সঙ্গে— তার বিস্তারিত বিবরণ শুরুতেই দিয়েছি।

শেখ সাহেবের বাড়িতে সেদিন দেখেছি রাজনীতির নানা রূপ। একদিকে মুজিবের প্রায় শিশুসুলভ সরলতা, অন্যদিকে দলের গরম মাথার নেতাকর্মীদের অর্ধউন্মাদ, উগ্র লম্ফঝম্পের রাজনীতি। প্রত্যক্ষ করেছি আশান্বিত জনগণের বিক্ষোভ মিছিল, শুনেছি মুজিবের আগুনঝরা বক্তৃতা এবং কঠিন-রূঢ় বাস্তবতার চ্যালেঞ্জের মুখে তার করুণ হতবুদ্ধি অবস্থা।

বিকালে আবার আসার দাওয়াত নিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। বেবিট্যাক্সি করে বাসার দিকে ফিরে যেতে যেতে নানা ভাবনার ঘূর্ণিঝড় বইছিল আমার সারা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মনে— কে জানে ২৫ মার্চের সেই বিকালটা দেশ ও জাতির জন্য কী নিয়ে আসবে! বাংলা পঞ্জিকার হিসাবে এই দিনের শেষে যে রাত আসবে, তা হবে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে ঘেরা রজনি। কে জানে, সেই কালো অমানিশার অবসান এই দেশের কপাল থেকে কবে হবে!

আমার বেবিট্যাক্সিটা ডিআইটি রোড ধরে বায়তুল মোকাররমের পেছনে পৌঁছাতেই দেখলাম ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতারা দলবেঁধে রাস্তা অতিক্রম করছেন। প্রতিদিন জোহরের নামাজের পর তারা স্টেডিয়াম টেরাসের প্রভিন্সিয়াল হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে যান। সেখান থেকেই ফিরে যাচ্ছেন পুরানা পল্টনে ছাত্রসংঘের অফিসের দিকে। নেতাদের মধ্যে ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, শাহ জামাল চৌধুরী, আলী আহসান মুজাহিদ, ইস্কান্দার আলী খান ও নুরুল ইসলাম। বেবিট্যাক্সিটা থামিয়ে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। সালাম-কালামের পর তারা জানতে চাইলেন কোথা থেকে আসছি, শেখ মুজিবের বাড়ি থেকে আসছি শুনে তারা আগ্রহের সঙ্গে সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা জানতে চাইলেন। বললাম, পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক, ডায়ালগ ভেঙে গেছে, ভুট্টো ও ইয়াহিয়া ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছেন। মনে করা হচ্ছে আজ রাতেই মিলিটারি ক্র্যাকডাউন হয়ে যেতে পারে। দু-একজন বন্ধু তো ব্যাপারটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আরে চৌধুরী, আপনি তো অল্পতেই ঘাবড়ে যান। কিন্তু নিজামী ভাই চিন্তিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমাদের কী করতে বলেন? বললাম, নিদেনপক্ষে কর্মীদের নিজ নিজ হুঁশিয়ারি নিতে বলতে পারেন, আর সম্ভবত প্রয়োজনীয় মূল্যবান কাগজপত্র হেফাজত করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। তারা বিদায় নিলেন, কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না।

বাসায় ফিরে গিয়ে নামাজ ও দুপুরের খাবারের পর খবরের কাগজগুলো নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পত্রিকা পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না। আছরের সময় ঘুম ভেঙে উঠে তড়িঘড়ি নামাজ পড়ে অফিসে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। অফিসটা তখনো অর্ধেক ফাঁকা, দুপুরের বিরতিতে যারা বাড়ি যান, তারা সন্ধ্যায় ফিরে আসেন রাতের দীর্ঘ শিফটের জন্য তৈরি হয়ে। শুধু নিউজ ডেস্কে জনা সাতেক সাব-এডিটর মাথা নিচু করে টেলিপ্রিন্টার থেকে নেওয়া নিউজ আইটেমগুলো অনুবাদ করে চলেছেন। এক কাপ চা নিয়ে টেবিলে মাত্র বসেছি, এমন সময় আমার টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা উঠিয়ে সালাম দিলাম, ফোন করেছেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব। বললেন,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

শুনলাম আপনার কাছে কিছু জরুরি খবর আছে, তাই ফোন করেছি। বললাম, জি হ্যাঁ, খবর তো কিছু আছে, ছাত্রসংঘের নেতাদের জানালামও। কিন্তু তারা কোনো গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না। প্রফেসর সাহেব বললেন, ওদের কথা ছাড়ুন, আমি শুনতে চাই, আমাকে বিস্তারিত বলুন। অর্ধেক ফাঁকা অফিস, তার মধ্যে টেলিপ্রিন্টারের একটানা একঘেয়ে টকটক আওয়াজের ভেতরে এ ধরনের জটিল বিষয়ে আলোচনা অনেকটা সহজ হলো। সংক্ষেপে প্রফেসর সাহেবকে আমার সকালের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলাম। তিনি আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে ব্যাখ্যা নিলেন। তারপর তাদের করণীয় কী হতে পারে, সে ব্যাপারেও আমার পরামর্শ চাইলেন।

চতুর্দিক থেকে চেনাজানা অনেকেই ঘনঘন টেলিফোন করতে লাগলেন কী হচ্ছে আর কী হতে পারে তা জানার জন্য। একটা অজানা আশঙ্কার চাদর যেন সারা শহর মুড়ে ফেলল। বিপর্যয় ও সংকটের মুহূর্তে সংবাদের স্রোত দুই দিকে প্রবাহিত হয়। অনেকে আবার নিজেরাই কোথায় কী ঘটছে তার বেশ কিছু সংবাদ আমাদের জানাচ্ছিলেন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, রাত ১০টা-সাড়ে ১০টার দিকে খবর আসতে লাগল সামরিক বাহিনী ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ির বহর নিয়ে ইতোমধ্যে রাস্তায় নেমে গেছে। অনেক এলাকায় রাস্তার বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আওয়াজ আসছে গুলি-গোলারও। জংলি টিক্কা খান রাত ১২টা হওয়ারও অপেক্ষা করল না, সাড়ে ১১টা থেকেই শুরু করে দিলো তার জঘন্য বর্বর নির্যাতন ও গণহত্যার তাণ্ডব। বাতি নিভে গেল সারা শহরের। আর সেই অমাবস্যার অন্ধকার রাতে শুরু হলো কুখ্যাত সার্চলাইট নামের ধ্বংস ও গণহত্যার পৈশাচিক অভিযান। টিক্কা খানের উন্মত্ত কসাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। চতুর্দিক থেকে শোনা যেতে লাগল অবিশ্রান্ত গোলাগুলি, বোমা, মেশিনগান, রকেট এবং ট্যাংকের ফায়ারিংয়ের আওয়াজ। হামলা চলল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলগুলোতে, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং পিলখানায় ইপিআর হেডকোয়ার্টারের ওপর।

আক্রমণের খবর আসতে লাগল ঢাকার অন্যান্য এলাকা থেকেও। বিশেষ করে পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার, শাখারীপট্টি, আলাউদ্দিন রোড এবং আশপাশের বিভিন্ন সড়ক ও গলিতে চলল নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ। এসব এলাকায় বসবাসকারী হিন্দু অধিবাসীরা ছিল সেনাবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় মানুষের আর্তচিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠল সেই কালো রাতের

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

ঢাকা শহর। ওরা কামান দাগাল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, দৈনিক *ইত্তেফাক*সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওপর।

রাত সাড়ে ১২টার দিকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এর পরে অফিসে থাকলে বাসায় ফিরে যাওয়া না-ও হতে পারে। সুতরাং যে যার মতো অফিস থেকে বাসার দিকে রওনা হলাম। আমার বাসাটা অবশ্য অফিসের কাছেই ছিল— পুরানা পল্টনে ওয়াটার ওয়ার্কস রোডে। সতর্কতার সঙ্গে একরকম দ্রুতগতিতে হেঁটে বাসায় এসে পৌঁছালাম। চতুর্দিকে তখনো ঢাকা শহরের আকাশ প্রকম্পিত হচ্ছিল গোলাগুলির কান ফাটানো আওয়াজ, সেইসঙ্গে আলোকিত হয়ে উঠছিল অন্ধকার রাতের আকাশ মুহুর্মুহু ফ্লেয়ার ফায়ারিংয়ের বিদ্যুৎ ছটায়। ঘরে ফিরলাম বটে, কিন্তু ঘুমাবার কোনো কায়দা ছিল না— কখনো বসে, কখনো বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম। কানফাটা গোলাগুলির আওয়াজ ছাড়াও দুর্বিষহ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল সারা মন। কী হবে এই দেশের কে জানে! কোথাও থেকে কোনো সংবাদ পাওয়ারও উপায় ছিল না, সামরিক বাহিনী ইতোমধ্যেই ঢাকা রেডিওর ব্রডকাস্টিং বন্ধ করে দিয়েছিল। আর সেই যুগে টেলিভিশন তো শুধু সন্ধ্যারাতে কয়েক ঘণ্টা এবং দিনের বেলায় কয়েক ঘণ্টা প্রচারিত হতো। আমার ফ্ল্যাটমেট দুই বন্ধু ইস্কান্দার ও হাবিবসহ চেষ্টা করলাম বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা কিংবা ভারতীয় বেতারকেন্দ্র আকাশবাণী কলকাতার কোনো সংবাদ শোনা যায় কিনা। কিন্তু শর্টওয়েভের রেডিও রিসেপশন ছিল নিতান্তই ক্ষীণ, অস্পষ্ট। তারপর একসময় সেই অমানিশার কালোরাতেরও অবসান হলো। আশপাশের দু-একটা মসজিদ থেকে ভেসে এলো মুয়াজ্জিনের সন্ত্রস্ত কাঁপা কাঁপা গলায় আজানের ধ্বনি। নামাজ পড়ে আবারও খবর সংগ্রহ করার সেই একই চেষ্টায় লাগলাম।

আমাদের বাসায় টেলিফোন ছিল না। সুতরাং ফোন করে কারও খোঁজ-খবর নেব, তারও উপায় নেই। শুধু কয়েকজন নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে তাদের আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া কিছু গুজব ও কিছু সংবাদ মিলল। আর তাও কোনো শুভ সংবাদ নয় বরং সেই সংবাদ ছিল অমানুষিক নির্যাতন, পাশবিক হত্যাকাণ্ড এবং বর্বর ধ্বংসযজ্ঞের অকল্পনীয় বিবরণ। ইতোমধ্যে শোনা গেল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে একটানা কারফিউ। প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল রাস্তায় বেরিয়ে দুষ্কৃতির দস্তান সরেজমিনে দেখে আসি। কিন্তু কারফিউর ভেতরে তাও সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত রেডিওতে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ভয়েস অব আমেরিকা এবং আকাশবাণীর খবর শোনা গেল। সেই সব খবর অবশ্য ইতোমধ্যেই আমরা যা শুনছিলাম তার আরও

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বিস্তারিত বিবরণ। ২৬ তারিখ পুরো দিন কারফিউ বলবৎ রইল, ফলে কোন দিকে যে বের হব তার কোনো সুযোগই ছিল না, বিশেষ করে সারাটা শহর যখন মারমুখী সেনাবাহিনীর দখলে।

২৭ তারিখে কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হলো। এ সময় আমরা বাসা থেকে সামান্য দূরে ফকিরাপুলের মোড়ে ২৮ টয়নবী সার্কুলার রোডে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার প্রবীণ রাজনীতিবিদ এ টি এম মতিন সাহেবের মুদ্রণালয় বুক প্রমোশন প্রেসে গিয়ে হাজির হলাম। মতিন সাহেব ছিলেন সজ্জন মানুষ, বয়সে আমাদের বড় হলেও তিনি অত্যন্ত অমায়িক বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে। একই ভবনে ছিল ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্সের ঢাকা অফিস, কয়েকজন উদীয়মান কবি-সাহিত্যিক কাজ করতেন এই প্রতিষ্ঠানে। প্রায়ই সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে আড্ডা জমাতাম। মতিন সাহেব চা-নাশতা দিয়ে আমাদের সমাদর করতে কার্পণ্য করতেন না। আর সেই চা পানের সঙ্গে সঙ্গে চলত সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। সেদিন মতিন সাহেবের প্রেসে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল তার অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করে বন্ধু-পরিচিতজনদের খোঁজখবর নেওয়া। সরেজমিনে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থা তদন্ত করে দেখার আগ্রহ আমাদের সবার মনেই ছিল। ঠিক হলো, মতিন সাহেবের গাড়িতে করে আমরা শহরের দুস্থ এলাকা সফরে বের হব। গাড়িতে করে পুরানা পল্টন ও প্রেসক্লাবের সামনে হয়ে আমরা রেসকোর্স ময়দানের পাশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে এলাম। ছাত্রাবাসগুলোর অবস্থা যা শুনেছিলাম, তার চেয়েও ছিল অনেক করুণ। চারদিকের দালানে দেয়ালে শুধু ধ্বংস আর ক্ষয়ক্ষতির অবর্ণনীয় দৃশ্য। সেনাবাহিনীর হামলাকারীরা মেডিকেল কলেজের সামনে শহিদ মিনারেও কামান দাগাতে কসুর করেনি। শহিদ মিনারটা তো শুধু কংক্রিটের ফ্রেমের ভেতরে কয়টা লোহার রড ছাড়া কিছু নয়। এটা তো কোনো মজবুত স্থাপনা নয় যে কামান দাগিয়ে ধূলিসাৎ করা যাবে। বন্ধু হাবিব বলল, দেখলে কামানের গোলায় লোহার রডগুলোর মাঝখানটা কীভাবে উড়ে চলে গেছে! বললাম, আহাম্মকগুলো যদি জানত যে তারা শহিদ মিনারের ওপরে তো নয়, কামান দাগিয়ে বসেছে খোদ পাকিস্তানের অস্তিত্বের ওপর। চিন্তিত কণ্ঠে মতিন ভাই বললেন, ঠিকই বলেছ। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর গোটা ভবনটা দেখলাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে। একই ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র দেখলাম পুরান ঢাকার অলিতে-গলিতে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কী ছিল এই হিংস্র পাশবিক নরযজ্ঞের আসল লক্ষ্য, তা আজও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। কারও কারও মতে, এটা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ক্লিনজিং প্রসেস, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকড় শেষবারের মতো সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার অভিযান। কোনো কোনো সাংবাদিক পরবর্তীকালে এমন মন্তব্য করেছেন যে এর জন্য প্রয়োজন হলে ২০ লাখ বাঙালিকে খতম করতেও সেনাবাহিনী দ্বিধা করবে না। এটা ছিল একটা দেশের অধিকাংশ নিরস্ত্র বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর একটা সশস্ত্র সর্বাত্মক হামলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বর্বর হামলার নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের ভাষায়: Not since Hitler has there been anything so diabolical.[১৬]

একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, এটা হঠাৎ করে নেওয়া কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়; বরং ঠান্ডা মাথায় নেওয়া একটা সুচিন্তিত সমরকৌশল ছাড়া কিছু ছিল না।

এই অভিযানের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে অভিযানে অংশগ্রহণকারী কিছু কিছু সেনা কর্মচারীর প্রকাশিত বইপত্রে। মেজর সিদ্দিক শালিকের মতে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল সাতটি:

১. সারা পূর্ব পাকিস্তানে একযোগে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

২. সর্বোচ্চসংখ্যক ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

৩. ঢাকা শহরে অভিযান শতভাগ সফল হতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে পুরো তল্লাশি চালানো হবে।

৪. ক্যান্টনমেন্টগুলো দখল ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ ফায়ার পাওয়ার ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা যেমন— টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও ও টেলিগ্রামের সংযোগ কেটে দেওয়া হবে।

৬. সেনাবাহিনীর সব পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করা হবে।

৭. আওয়ামী লীগকে প্রতারণা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার অভিনয় চালিয়ে যাবেন এবং ভুট্টো সাহেব আপত্তি করলেও আওয়ামী লীগের দাবি-দাওয়া মানার ভান করবেন।[১৭]

---

১৬. Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh*, P. 117.

১৭. সিদ্দিক শালিক, *উইটনেস টু সারেন্ডার*, পৃষ্ঠা: ২২৮-২২৯।

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

এই দলিল সম্ভবত প্রেসিডেন্ট আলোচনার জন্য ঢাকায় আসার আগেই তৈরি হয়েছে। অন্তত এর ৭ নম্বর ধারা থেকে একথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে মুজিবের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুধু প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় করে নেওয়ার বাহানা ছাড়া আসলে কিছু ছিল না। এ ধরনের খবর শেখ মুজিবও যে কিছু কিছু পাচ্ছিলেন, সে কথা আগে বলেছি।

অভিযানে তারা ছাত্র-শিক্ষক ও হিন্দু নাগরিকদের পাইকারিভাবে হত্যা করতে তো পেরেছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিব ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর শেখ সাহেবও তার কাছে সহকর্মীদের একান্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে একরকম স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলেই তাকে গ্রেপ্তার করতে তারা সফল হয়েছিলেন। এটা আজও দুর্বোধ্য যে ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেতা এবং তাদের দলের নির্বাচিত সমস্ত জাতীয় পরিষদ সদস্য ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতারাও। কিন্তু তাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করতে না পারার আসল কারণ কী?

গ্রেপ্তারই শুধু নয়, নিহত মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতারা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিলেন— এই ধাঁধার জবাব আজও মেলেনি। ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলার শিকার হয়েছিল সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে ছিল রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও হিন্দু নাগরিকেরা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে শুধু যশোর ক্যান্টনমেন্টে হামলা করতে গিয়ে নিহত আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমএনএ মশিউর রহমান ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাসে নিহতদের একজনও আওয়ামী বা অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা শামিল ছিলেন না। একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তার গবেষণা ও সরেজমিনে তদন্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে লেখা দীর্ঘ এক প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের শহিদের সংখ্যার নিম্নোক্ত ধারণা পেশ করেছেন:

ছাত্র ৮ শতাংশ, কৃষক ২০ শতাংশ, শ্রমিক ১৪ শতাংশ, চাকরিজীবী ১৩ শতাংশ, ব্যবসায়ী ১০ শতাংশ, গৃহবধূ ১৪ শতাংশ, শিক্ষক ৩ শতাংশ, অন্যান্য ১৭ শতাংশ।[১৮]

---

১৮. শিমুল মোস্তফা, একাত্তরের বধ্যভূমির সন্ধানে, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ২১।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছিল অভিযান, তাদের নিরাপদে কলকাতায় রওনা হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে হিংস্র সৈন্যরা হামলা চালিয়েছিল অসহায় নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে তারা নির্বিচারে গুলি করে মেরেছে ছাত্রদের। এর মধ্যে কিছু অবশ্য ছিল সে ধরনের ছাত্র, যারা সক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য কাজ করছিল— কিন্তু সবাই নয়। অনেক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সাধারণ ছাত্রও হয়েছিল তাদের বর্বর হামলার শিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রাণ দিতে হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। এদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং সব অর্থেই তাদের অধ্যাপনা পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইংরেজির অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং দর্শন বিভাগের প্রধান গোবিন্দ চন্দ্র দেব। এই দুজনকে শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধেই যে হত্যা করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। ড. দেবের নিহত হওয়ার সংবাদে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলাম। গোবিন্দ চন্দ্র দেব ছিলেন শিশুসুলভ সরলতার মূর্তপ্রতীক— প্রকৃত অর্থেই একজন আত্মভোলা দার্শনিক। মনে আছে, ইউনিভার্সিটির ছাত্রমহলে তাকে নিয়ে নানা কৌতুক চালু ছিল। এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ডক্টর দেব নাকি একদিন রিকশায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তিনি রিকশাওয়ালাকে বললেন, কই তুমি তো ভাই ভাড়া নিয়ে কোনো দরদাম করলে না। রিকশাওয়ালা জবাব দিলো: কী যে বলেন স্যার! আমি মানুষ চিনি— আমি জানি আপনি আমাকে ঠকাবেন না। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ডক্টর দেব তাকে রিকশা থামাতে বলে নেমে পড়লেন এবং রিকশাওয়ালা দুই হাত ধরে আগ্রহসহকারে বললেন, মানুষ চেনো? কেমন করে মানুষ চেনো, আমাকে একটু শিখাও ভাই, আমি তো এতকাল দর্শনশাস্ত্র পড়াশোনা করেও মানুষ চিনতে পারলাম না। তারা আরও হত্যা করেছিল পরিসংখ্যান বিভাগের একান্ত গোবেচারা অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামানকে।

দারুণ মন খারাপ করে সেদিন বাসায় ফিরেছিলাম। ধ্বংসযজ্ঞের যে চিত্র আহত ঢাকা নগরীর পথে-পথে, অলিতে-গলিতে দেখে এসেছি, তা মনের পাতায় চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকবে। কঠিন অন্তর্জ্বালায় মনের ভেতরে আরও চলতে থাকল প্রচণ্ড এক দুমুখী সংঘর্ষ। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির সমস্ত সংজ্ঞা যেন একসঙ্গে গুলিয়ে-পেঁচিয়ে একাকার হয়ে গেল। একদিকে মুসলমানের পাক আবাসভূমি হিসেবে অর্জিত পাকিস্তান নামের দেশটাকে ভেঙে দুই টুকরা করার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে সেই পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন পশ্চিমা জল্লাদ সামরিক জান্তা কর্তৃক অসহায় নিরপরাধ বাঙালি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

জনতার ওপর পরিচালিত বর্বর হামলা। বিবেকবান যেকোনো বাঙালি মুসলমানের কাছে এ দুটোই একই রকম জঘন্য ও পরিত্যাজ্য। এই কঠিন মুহূর্তে আমাদের অবস্থান কোথায় হবে তা নির্ণয় করা রীতিমতো এক জটিল সংকট হয়ে দাঁড়াল।

দু-এক দিন পরে অফিস খুললে কাজে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু সারা দেশের মতো পত্রিকা অফিসগুলো নির্জন নিস্তব্ধ। কাজ কী হবে, কতটুকু রিপোর্ট করা যাবে, আর কী কী লেখা যাবে না, সে ব্যাপারে সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও চিফ রিপোর্টার কেউই নিশ্চিত নন। তাই টেলিপ্রিন্টারে বয়ে আনা বিদেশি সংবাদগুলোর ওপর ভিত্তি করে দু-একটা সংবাদ নিবন্ধ তৈরি করে দিচ্ছিলাম মাত্র। বাদ বাকি সময় কাটছিল পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের শঙ্কা ও সম্ভাবনা নিয়ে অলস আলোচনায়। তবে বেশি দিন অনিশ্চয়তায় থাকতে হলো না, শিগ্‌গিরই সামরিক প্রশাসন থেকে সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা জারি করা হলো। সংবাদমাধ্যমগুলোকে সেনা কর্তৃপক্ষের মর্জিমতো পরিচালনা করার জন্য একজন মেজরকে জনসংযোগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হলো। জারি করা হলো সেন্সরশিপের নীতিমালা। তবে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, সেই সেন্সরও করতে হবে আমাদেরই, এর নতুন নাম— সেলফ সেন্সরশিপ। রাজনীতি তো একরকম থমকে দাঁড়িয়েছিল— সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সভা, মিছিল, সংবাদ সম্মেলন। সুতরাং অফিসের বাইরে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ারও প্রয়োজন হতো না।

আগেই বলেছি, প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে ২৫ মার্চের আগে তার পক্ষে শপথ নেওয়ার সুযোগ ছিল না। সুতরাং গভর্নর হিসেবে নয়, বরং তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন শুধু চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে। অবশেষে সেই উপায় এলো ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের পর। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করা হলো শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের। প্রধান বিচারপতি বাধ্য হলেন শপথ পড়াতে। বাসায় বসে রেডিওতে অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী শুনছিলাম। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কোরআন তিলাওয়াত। যে মাওলানা সাহেবকে তিলাওয়াত করতে আনা হলো, তিনিও কিছু কম যান না। তিলাওয়াত করলেন এমন এক আয়াত, যা পদ-পদবি, দায়িত্ব ও ক্ষমতার সব গর্বিত দাবিদারদের দর্প ভেঙেচুরে খানখান করে দেয়। মাওলানা পড়লেন,— কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মানতাসাউ, ওয়াতান জিয়াউল মুলকা মিম মানতাসাউ...। 'বল সব ক্ষমতা ও আধিপত্যের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আসল মালিক শুধু আল্লাহ, তিনি যাকে চান রাজ্য দান করেন, আর যার কাছ থেকে চান রাজ্য ছিনিয়ে নেন।'[১৯] টিক্কা খান তো দূরের কথা, খোদ প্রধান বিচারপতিও আয়াতগুলোর আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন কি না, জানি না।

যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ফেনীতে এবং আমাদের গ্রামের বাড়িতে কী হলো তার কোনো খবর নিতে পারছিলাম না। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে আব্বা ছিলেন অসুস্থ। তাই বাড়ি যাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল। চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহ ভাইকে অনুরোধ করতেই তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, এখানে তো তেমন কোনো কাজও নেই। বরং বাইরে সফরে গেলে সেখান থেকে ফিরে এসে তুমি অবস্থার সাধারণ বিবরণ দিয়ে ভালো একটা প্রতিবেদনও লিখতে পারবে। দু-তিন দিন পরে রওনা হলাম বাড়ির পথে। ২৫ মার্চের অপারেশনের পর ট্রেন চলাচল তখনো শুরু হয়নি, যাতায়াতব্যবস্থা যথেষ্ট অসুবিধাজনক ও কষ্টসাধ্য ছিল। রওনা হলাম প্রথমে ঢাকা থেকে বাসযোগে, তারপর মেঘনার তীরে এসে আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে চাপলাম নৌকায়।

নৌকাটা আমাদের পৌঁছে দিলো কুমিল্লা জেলার হোমনার কাছাকাছি একটা বড় রাস্তার কাছে। সেখান থেকে কোনো যানবাহন নিয়ে রাস্তাযোগে কুমিল্লা শহরে যেতে হবে। কোনো বাস নেই, তাই সবাই বেবিট্যাক্সি বা রিকশায় করে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। আর একজন কুমিল্লাগামী তরুণ সহযাত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে আমরাও একটা রিকশা নিয়ে রওনা হলাম। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সেই দিনে গ্রামবাংলার দীর্ঘপথ ধরে যেতে যেতে উল্লেখ করার মতো কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ল না। বোঝা গেল, এলাকাটা এখনো অপারেশন সার্চলাইটের হামলার শিকার হয়নি। শুধু ময়নামতিতে ক্যান্টনমেন্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা সেনাবাহিনীর আনাগোনা দেখা গেল। কুমিল্লায় পৌঁছে যে যার পথে রওনা হলাম। সামনে ফেনি পর্যন্ত এবং তার পরেও গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত একইভাবে রিকশায় করে যেতে হবে, তাই ঠিক করলাম কুমিল্লায় যাত্রাবিরতি করব। ঠিক করলাম কোটবাড়ীতে পল্লি উন্নয়ন অ্যাকাডেমির জনাব আবুল হোসেন সাহেবের ঘরেই আতিথেয়তা নেওয়ার। তার গোটা পরিবারই আমাকে একান্ত আপনজনের মতো দেখত, বড় দুই ছেলে ফিরোজ ও শামীম তো আমাকে বড় ভাইয়ের মতোই জানত। তা ছাড়া ছোট ছোট পাহাড়-টিলা আর মনোরম শালবনে ঘেরা কোটবাড়ীতে অ্যাকাডেমিটা বেশ কয়েকবছর ধরেই

১৯. সূরা আল ইমরান : ২৬।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আমার জন্য হয়ে উঠেছিল ছুটি কাটাবার প্রধান গন্তব্যস্থল। আবুল হোসেন সাহেবের বাসায় আদর-যত্নও পেতাম প্রচুর। তাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলে গোটা পরিবার খানিকটা বিস্মিত হলেও উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানাল। খাওয়াদাওয়ার পরে আবুল হোসেন সাহেব বললেন, ভালোই হলো তুমি এসে গেছ, সরাসরি ঢাকার খবর পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আমাদের নেতৃবৃন্দ কী সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কেন নিলেন, সে সম্পর্কেও তোমার কাছ থেকে জানতে পারব।

আবুল হোসেন সাহেব পল্লি উন্নয়ন অ্যাকাডেমির অফিসে একটা ভালো পদে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর এক অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি তার সাইকেলটা নিয়ে ছুটতেন শহরের ঘরে ঘরে জামায়াতে ইসলামীর বইপত্র এবং বিশেষ করে এর মুখপাত্র *সাপ্তাহিক জাহানে নও* পত্রিকা ঘরে ঘরে বিলি করার জন্য। কথা বলা শুরু হতেই তিনি বললেন, তাহলে কি আমরা সামরিক অভিযানকে সমর্থন দিয়ে দিলাম? আশ্চর্য হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, কীসের সমর্থনের কথা বলছেন? তিনি বললেন, কেন একটু আগেই তো রেডিওতে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রফেসর সাহেবের ভাষণ প্রচার করা হয়েছে। বললাম, দুই দিন আগে অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতাদের বিশেষ অনুরোধে একরকম বাধ্য হয়েই প্রফেসর গোলাম আযম সাহেবও টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু শুধু তার কথা শোনার জন্যই, তার কথায় কোনো রকম সায় দেবেন না বলেই ঠিক করা হয়েছিল। শুনেছি, বৈঠকে প্রফেসর সাহেব টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীকে তাদের পদক্ষেপের ব্যাপারে শক্ত শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছিলেন। সেখানে সামরিক প্রশাসন আগে থেকেই নেতাদের রেডিও বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য সবকিছু তৈরি করে রেখেছিল। অন্য নেতাদের রেডিও ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছিল এবং গত দুই দিন ধরে তা প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু প্রফেসর সাহেব কোনোরকম ভাষণ দিতে অস্বীকার করেছেন। আবুল হোসেন সাহেব বললেন, আজ প্রফেসর সাহেবের ভাষণ প্রচার করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রেডিওর খবরে আরও বলা হয়েছে যে, ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দেরও এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তুমি তো ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং ঢাকা শহর শাখার এককথায় তিনটি মজলিশে শুরারই সদস্য, তাহলে কি তুমি বলতে চাইছ যে এর কোনো বৈঠকেই এ ব্যাপারে কোনো রকম আলোচনা হয়নি? একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ৪ তারিখে টিক্কা খানের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সঙ্গে বৈঠকের কথা ছাত্রসংঘের দায়িত্বশীলদের জানানো হয়েছিল, তারা পরে আমাদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের রেডিও বক্তৃতা বা সমর্থন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, আজ সকাল পর্যন্তও এরকম কোনো আলোচনাও হয়নি। সকালবেলা ঢাকা থেকে বেরিয়েছি, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত কিছু হয়ে গেছে তা তো আমার জানা ছিল না। বিচলিত হয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো তিনি বললেন, আল্লাহ জানে, এই পদক্ষেপের পরিণতি কী হবে? ব্যাপারটা আমাকেও দারুণ চিন্তিত করে তুলল।

যে কথা সম্ভবত বিবেচনা করা হয়নি তা হলো, সায় দিতে না চাওয়া এক কথা, কিন্তু একবার সামরিক জান্তার ফাঁদে পা দিলে সায় না দিয়ে বাঁচারও উপায় থাকে না। এ কথা ঠিক যে সেই অত্যন্ত নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিনগুলোতে জামায়াতে ইসলামী একটা উভয় সংকটের মধ্যে আটকা পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য অবশ্যই পোষণ করত, কিন্তু এর জন্য পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে জামায়াত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য ২৫ মার্চের আগপর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোনো বক্তব্য-বিবৃতিতেও বিচ্ছিন্নতাবাদর কোনোরকম ঘোষণা দূরে থাক, এমনকি কোনো আভাসও ছিল না। তবে মিলিটারি অপারেশনের পর চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিব দেননি বরং তিনি স্বেচ্ছায় সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে পশ্চিম পাকিস্তান পাড়ি দেওয়াই সমীচীন মনে করেছিলেন। তাছাড়া ভারতের সহায়তায় এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা জামায়াতের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাদের কাছে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে তাদের দলের ঐতিহাসিক ভারতবিরোধী পররাষ্ট্রনীতি প্রতিবেশী দেশের অজানা নয়। সুতরাং আওয়ামী লীগারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কলকাতা পাড়ি দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার মতো আরও কয়েক জন ৪ তারিখে প্রফেসর সাহেবের টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা সহজে মেনে নিতে পারিনি। অনেক কাছে থেকে গোলাম আযম সাহেবকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল, তার মতো ফেরেশতাতুল্য মানুষ খুব বেশি একটা খুঁজে বের করা যায় না। তার তুলনাহীন ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সত্য ও নীতির প্রশ্নে আপসহীন সাহসী মনোভাব বহুবার আমাকে মুগ্ধ করেছে। ১৮ জানুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগ জামায়াতের জনসভা পণ্ড করে দেওয়ার পর নিজের জান বাঁচানোর তোয়াক্কা না করে কর্মীদের রক্ষা করার লক্ষ্যে আইজি পুলিশকে যে কঠোর ভাষায় তিনি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ভর্ৎসনা করেছিলেন, তা চিরদিন আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক ছলচাতুরি ও কূটকৌশলের অনেক ঊর্ধ্বে এক সরলপ্রাণ ভালো মানুষ। কিন্তু সমস্যা হলো, শুধু ভালোমানুষিতেও রাজনীতি চলে না, সার্থক রাজনীতিবিদ নিজে কূটকৌশলের আশ্রয় না নিলেও প্রতিপক্ষের কূটকৌশল যথাসময়ে শনাক্ত করার এবং তার উপযোগী পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার মতো রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতাও থাকা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে প্রফেসর সাহেবের নিজের দেওয়া বর্ণনামতে টিক্কা খান সেদিন তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শুধু একটা উদ্দেশ্যে। জেনারেল কথা শুরুই করেছিলেন এই বলে— আপনারা জনগণের নেতা, আইনশৃঙ্খলা বহাল রাখায় জনগণ যাতে সহযোগিতা করে, সে বিষয়ে আপনারা জনগণকে পরামর্শ দিতে পারেন। বাদবাকি নেতারা তো চুপ করেছিলেন, কিন্তু গোলাম আযম সাহেব জবাব দিয়েছিলেন— জেনারেল সাহেব! নির্বাচনের ফলাফল বাস্তবায়ন করলে তো আইনশৃঙ্খলা বহাল থাকত। টিক্কা খান পাশ কাটিয়ে গেলেন এই বলে যে— এ কথা প্রেসিডেন্টকে বলুন— আমি রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলতে অপারগ। এ কথার জবাব বোধহয় এভাবে দেওয়া যেত— আপনি তো এইমাত্র বললেন যে আমাদের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আপনি ডেকেছেন। এখন রাজনৈতিক ব্যাপারে কথা বলতে যদি আপনি অপারগ হন, তাহলে প্রেসিডেন্টকে বলুন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তিনি সেই গোলাম আযম, যিনি জানুয়ারি মাসের শুরুতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা থেকে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের জন্য শুধু স্বায়ত্তশাসনই নয়, বরং পূর্ণ স্বাধীনতার অনুমোদন আদায় করে এনেছিলেন। এই অধিবেশনে অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ, পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে দেওয়া অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কসুলভ এবং অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এতে তিনি বলেছিলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানি শাসকেরা তার ভিত্তি নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এর শূন্যস্থান দখল করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানের দুই অংশে যে নতুন নেতৃত্ব এসেছে, তারা দুই অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেবে না অথবা রাখতে পারবে না— এ কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন: যদি রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবার কার্যক্রম শুরু করে, তাহলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের আসল যে উদ্দেশ্য,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সেই উদ্দেশ্যে যা করণীয় তা করা যাবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, না পৃথক হবে— এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হলে এর পূর্ণ এক্তিয়ার জামায়াতের পূর্ব পাকিস্তান শাখাকে দেওয়া হোক। প্রফেসর আজমের এই যুগান্তকারী প্রস্তাবের পর বেশ কিছু আবেগ, উত্তেজনা ও আশঙ্কায় ভরা আলোচনা শেষে অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে মাওলানা মওদূদী প্রস্তাব করেন, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত একটা বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছে, মজলিশে শুরার সদস্যরা একমত হলে আমরা শুধু স্বায়ত্তশাসনই নয়,পূর্ণ স্বাধীনতাই অনুমোদন করতে পারি। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মওদূদীর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২০]

অধ্যাপক গোলাম আযমের জানুয়ারি মাসের সেই অভিজ্ঞ বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করার এই সিদ্ধান্ত কোনোমতেই হিসাবে মেলাতে পারছিলাম না। এই সাক্ষাৎকারের খবরটা শোনার পর দুই দিন পর্যন্ত ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছি। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক— এই একটা সাক্ষাৎকারের খবর মুহূর্তের মধ্যে আমাদের জঘন্য সামরিক হামলার উচ্চকণ্ঠ সমালোচক নয়, বরং এর সমর্থক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলো। এর পরিণতি যে কোনোভাবেই কল্যাণকর হবে না, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শুধু একটা আশার দিক ছিল যে প্রফেসর সাহেব অন্তত অন্য তিন নেতার মতো রেডিওতে ভাষণ দেননি। পরে শুনেছি, এই দুই দিনে রাও ফরমান আলী অসংখ্যবার টেলিফোন করে প্রফেসর সাহেবকে রেডিওতে ভাষণ দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দায়সারা গোছের একটা ভাষণ দিতে তিনি বাধ্য হন। এই ভাষণ যে কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তা তার নিজের কাছেও অপরিষ্কার ছিল না। তিনি লিখেছেন, আমার রেডিও ভাষণে সামরিক সরকার সন্তুষ্ট না হলেও আওয়ামী লীগ মহলের বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে আমরা তাদের বিরোধী। রেডিওতে এই ভাষণ প্রচারের পর সারা দেশে জামায়াতের সঙ্গে জড়িত সবাই আওয়ামীদের হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।[২১]

এই হুমকিটা যে কত দ্রুত এবং ভয়াবহ হবে, তার প্রমাণ পেতেও বেশি দেরি হলো না। পরদিন কুমিল্লা থেকে ফেনী পৌঁছেই জামায়াতের অফিসে গিয়ে যে খবর প্রথম পেলাম, তাতে গায়ের রক্ত জমে হিম হয়ে গেল। সাথিরা জানালেন

২০. অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭-১১৯।

২১. অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৪।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যে ইতোমধ্যে আমার প্রিয় ভাই সৈয়দ শফিউল্লাহ শাহাদাত বরণ করেছেন। আর সেই শাহাদাতের বিবরণও অত্যন্ত করুণ এবং হৃদয়বিদারক। শফিউল্লাহকে গতকাল ফেনীর অদূরে ফুলগাজীতে তার নিজের বিয়ের মাহফিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে নদীর পাড়ে জবাই করে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনো মুক্তিবাহিনীও গঠিত হয়নি আর রেডিও ভাষণ ছাড়া জামায়াতের পক্ষ থেকে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, কিন্তু তারপরও প্রতিপক্ষরা হিংস্রতা অমানুষিকতার এই নিম্নতম স্তরে এত দ্রুত গিয়ে পৌঁছাবে তা কারও কল্পনায়ও আসেনি। সৈয়দ শফিউল্লাহ ছিলেন এক অসাধারণ সাহসী ও সংগ্রামী ছাত্রনেতা। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সরলপ্রাণ এই মানুষটা চিরহাস্যময় মুখে সবার সঙ্গে সহজেই আপন হয়ে যেতে পারতেন। শফিউল্লাহ কোনো ধনী পরিবার থেকে আসেননি। এর প্রতিফলন ঘটত তার চালচলনে, কাপড়চোপড়ে। কিন্তু আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার সংগ্রামে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, সদা কর্মব্যস্ত। আমার ইসলামি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত মুখ্য। পরবর্তী সময়ে আমি ফেনী শাখা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি থাকাকালীন সৈয়দ শফিউল্লাহকে কলেজ ছাত্র মজলিশের সহসভাপতি পদে মনোনয়ন দিই আর জনপ্রিয় শফিউল্লাহ বিপুল ভোটে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। বছরের পর বছর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামি আন্দোলনের যাত্রাপথের সহযাত্রী হিসেবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল। সেই শফিউল্লাহর এ ধরনের করুণ মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদ আমাকে বিচলিত না করে পারেনি।

তিন-চার দিন পরে ঢাকায় ফিরে এলাম, কিন্তু মনের অস্থিরতা কাটছিল না। ফেনীতে ও গ্রামের বাড়িতে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের মুখে দেখেছি এক উদ্বিগ্ন অস্থিরতা। গোটা জাতি যেন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় দিন গুনছে। ছাত্রসংঘের শীর্ষ নেতাদের কারও কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা মিলবে তার কোনো ভরসা ছিল না। কারণ টিক্কা খানের সঙ্গে প্রফেসর সাহেবের সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাদের আগেই জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা বাধা তো দেনইনি, বরং উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমার প্রয়োজন ছিল একটা সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিরপেক্ষ দিকনির্দেশনা। এমন নির্দেশনা যিনি দিতে পারেন, তিনি ছিলেন শুধু জনাব খুররম জাহ মুরাদ—ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর আমির। কিন্তু মুশকিল হলো, মুরাদ ভাইও গিয়েছেন লাহোরে। দিন দুয়েক পরে তিনি ঢাকায় ফিরে এলে একদিন তাকে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ফোন করলাম। বললাম, আমার অত্যন্ত জরুরি কিছু কথা আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। মুরাদ ভাই বললেন, ঠিক আছে এখনই চলে আসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

খুররম জাহ মুরাদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট প্রকৌশলীদের মধ্যে একজন, অ্যাসোসিয়েটেড কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স নামক প্রথিতযশা এক প্রতিষ্ঠানের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। রমনা রেসকোর্সের পাশে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছিল এই প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর। রিকশায় করে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আসতেই দেখি মুরাদ ভাই জিপে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসতেই তিনি চালাতে শুরু করলেন। তিনি জানতে চাইলেন আমার প্রশ্ন কী? আমি কুমিল্লা ও ফেনী সফরের বিবরণ দিয়ে দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা তার কাছে পেশ করলাম। তারপর এদেশে ইসলামি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন জানতে চাইলাম। অনেকটা নির্মোহ কণ্ঠে মুরাদ ভাই বললেন, আমরা নিজের হাতেই ইসলামি আন্দোলনকে এদেশে কবর দিয়ে দিলাম কি না, কে জানে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, এটা তো আমারও ধারণা। কিন্তু আপনি তো নেতৃত্বের একজন, একথা মনে করেও আপনি আন্দোলনের পলিসি পরিবর্তন করার জন্য কিছুই কি করলেন না? মুরাদ ভাই বললেন, করলাম তো, এজন্যই তাড়াতাড়ি করে লাহোরে গেলাম, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং আমাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করা কতটা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করলাম। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম— এই আলোচনার ফল কী হলো? একটু সময় নিয়ে মুরাদ ভাই জবাব দিলেন, ফল কিছুই হলো না। নেতারা জবাব দিলেন— তুমি যা বলছ, বাঙালি নেতারা তো তা বলছেন না। তুমি দেখছি বাঙালি নেতাদের চাইতেও বেশি বাঙালি হয়ে গেছ। বিফল মনোরথ হয়ে স্বগতোক্তি করলাম— এ রকম কিছু হবে তা আমি জানতাম, এ জন্যই আমি ভাবছি সংগঠন থেকে পদত্যাগ করব। গাড়ি চালাতে চালাতে আমার দিকে না তাকিয়েই মুরাদ ভাই বললেন, আমি পদত্যাগ করব না। বললাম, সে কেমন কথা, আপনি তো বললেন যে বর্তমান পদক্ষেপের সঙ্গে আপনি একমত নন, তারপরও পদত্যাগ করবেন না, তাহলে কী করবেন? তিনি বলেন, আগের মতো সমান উৎসাহ নিয়ে সবাই মিলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব। এটাই তো এই আন্দোলনে এসে শিখেছি— কীভাবে নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল হয়ে না থেকে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত যদি ভুলও হয়, তবু তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে। ভাবলাম, সরাসরি আমাকে না বললেও আসলে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাকে পদত্যাগ না করার জন্যই বলছেন, সুতরাং পদত্যাগ করা আর হলো না।

খুররম মুরাদ ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী মহামানুষ, আদর্শে এবং সংগঠনের স্বার্থে নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি এমনকি মতামতও বিনা দ্বিধায় কোরবানি করতে কখনো তিনি পিছপা হননি। আমার সঙ্গে তো তার তুলনা হয় না। তার ইঙ্গিতমতো পদত্যাগ করলাম না বটে, কিন্তু একটা ভুল সিদ্ধান্তকে তার মতো বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। সাংগঠনিক বৈঠকগুলোতে সেনাবাহিনীর নৃশংস হামলার নিন্দা না করে পরোক্ষভাবে এর সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে লাগলাম বারবার। প্রশ্ন তুললাম, কেন এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোনো নীতিনির্ধারণী সভা বা বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো না, কেন তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ দেওয়া হলো না। আবেগের আতিশয্যে অনেকটা নিদ্রার ঘোরে পথ চলার মতো এই খামখেয়ালি পদক্ষেপের পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা কে জানে।

প্রশ্ন তোলা যদিও ইসলামি আন্দোলনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর একটি, কিন্তু বাস্তবে আমাদের ইসলামী ছাত্রসংঘের পরিবেশে এই শিক্ষার প্রয়োগ ছিল প্রায় অনুপস্থিত, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দ যখন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত করে বসেন, তখন বিনা প্রশ্নে ভুলটাকেই শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে। আমার এই সবাক প্রতিবাদ সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে আমাকে যে প্রিয় করে তোলেনি, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে বাইরে বিশেষ করে আমার কর্মস্থল সংবাদপত্রের অফিসে বামপন্থি ও চরম জাতীয়তাবাদী সহকর্মীরাও ইসলামী ছাত্রসংঘের বর্তমান বাহ্যিক অবস্থানের কারণে আমাকে খানিকটা তীর্যক দৃষ্টিতে দেখছিল বললে ভুল বলা হবে না। এই টানাপোড়নের কঠিন দিনগুলোতে সংগঠনের সাধারণ কর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা, সর্বোপরি মুরাদ ভাইয়ের আন্তরিকতাভরা সংস্পর্শটাই ছিল একমাত্র আশার আলো।

এই আলোচনার একপর্যায়ে সম্ভবত মে মাসের ১২ তারিখে ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক অফিসে মজলিশে শুরার এক বিশেষ বৈঠক রাখা হলো। দুপুর থেকে শুরু হয়ে বৈঠক চলতে লাগল রাত অবধি। তুমুল বিতর্ক চলছিল সামরিক হামলার প্রতিবাদ করা হবে, নাকি যা হয়ে গেছে তাকে মেনে নিয়ে দেশের সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এসব পদক্ষেপের মৌন সমর্থন দেওয়া হবে এই প্রশ্ন নিয়ে। প্রতিবাদী বক্তব্যের সমর্থনে আমি নিজেই রাখছিলাম জোরালো

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যুক্তি-তর্ক। আর আমার প্রিয় ভাই সৈয়দ শাহ জামাল চৌধুরী আবেগাপ্লুত বক্তব্য রাখছিলেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য তিক্ত হলেও বর্তমান অবস্থান মেনে নেওয়ার পক্ষে। তার ভাষায়, আমাদের এই পাকিস্তান শুধু ভৌগোলিক অর্থে একটা দেশই নয়, বরং আদর্শিক দিক দিয়ে সত্যিকার অর্থে একটা পাক ভূমি। এর হেফাজত-প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও তা মেনে নিতে হবে। সেই উত্তপ্ত বিতর্কের মুহূর্তে শাহ জামালের মুখে খই ফুটছিল বটে, কিন্তু তার চেহারায় বিরোধী মতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও উষ্মার লেশমাত্রও দেখিনি, বরং তার চোখে-মুখে যেন বিকশিত হচ্ছিল এক সরল-সহজ বেহেশতি আন্তরিকতা। অন্যদিকে আমাদের যুক্তি ছিল, জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় প্রফেসর আযমের সেই যুগান্তকারী প্রস্তাবের আলোকে যদি রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবার কার্যক্রম শুরুও করে, তাহলে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের আসল যে উদ্দেশ্য, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে আমরা সেই কাজ চালিয়ে যেতে পারব। শুধু ভৌগোলিক সংহতি বজায় রাখার জন্য অন্যায়, জুলুম, অত্যাচারের সমর্থন দেওয়া কোনোক্রমেই সমীচীন হতে পারে না। অনেকক্ষণ অবধি আলোচনা চলল, কিন্তু কোনো রকমের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। রাত ১২টায় কারফিউ শুরু হবে, প্রায় ১২টা বাজার কয়েক মিনিট আগে সভা মুলতবি করা হলো। সবাই যার যার মতো নিজেদের বাসস্থানের দিকে রওনা হলো। আমার ও বন্ধু ইস্কান্দার আলী খানের বাসা পুরানা পল্টনেই, তাই একটা রিকশা নিয়ে বাসার দিকে চলে গেলাম। শাহজামাল এবং অন্য এক ভাই সে সময় ফজলুল হক হলে থাকতেন। তারা পায়ে হেঁটেই রওনা হলেন হলের দিকে, কিন্তু হলে ফেরা আর তাদের হয়নি। মাঝপথ থেকে গায়েব হয়ে গেলেন তারা। রাতে অবশ্য আমরা খবরটা পাইনি। সকালবেলায় হলের ভাইয়েরা খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলে বোঝা গেল শাহজামাল হল পর্যন্ত পৌঁছেনি। কারফিউ ওঠার পর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেওয়া শুরু হলো। কর্মীরা পালা করে ছুটল তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাসায় এবং এলাকার সব কয়টা থানায়। খুররম মুরাদ ভাই যোগাযোগ করলেন মার্শাল ল প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। খুঁজে দেখতে গেলেন গতরাতে কারফিউর সময় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের। কিন্তু কোথাও কোনো হদিস মিলল না। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে এই গুমের সঙ্গে সামরিক বাহিনী ছাড়া আর কেউ জড়িত নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুক্তিবাহিনী তখনো পুরোপুরি গঠন

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হয়নি। তাদের সক্রিয় সমর্থকেরা প্রায় সবাই তখন ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছে। সুতরাং এই জঘন্য দুষ্কৃতির সঙ্গে তাদের যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে সামরিক বাহিনী এর সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমরা প্রিয় ভাই শাহ জামালের কঠিন ও করুণ পরিণতির সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে বাধ্য হলাম। চেষ্টা করা হলো, যদি জীবিত তারা না থাকেন, তাহলে কমপক্ষে তাদের লাশ যেন আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তাও হলো না, সেনা কর্তৃপক্ষ লাশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি হলো না। কারণ তা করলে ঘটনার দায়দায়িত্ব যে তাদের ঘাড়েই গিয়ে পড়ে। পরিতাপের বিষয়, এই সেই শাহজামাল চৌধুরী, যে এই দুর্ঘটনার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্তও পাকিস্তানের সংহতির নিশান বরদার এই দুষ্কৃতকারী সেনাবাহিনীর কোনো সমালোচনা না করার জন্য জোরালো যুক্তি পেশ করেছিল। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল এই ঘটনার পর— আমি আমার অবস্থানের ওপর আরও মজবুত, আরও দৃঢ় ভূমিকা নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে গেলাম।

এ ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটানো অসম্ভব। যতই দিন যাচ্ছিল, ততই ভাবছিলাম এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি হবে না। এ সময় মে মাসের শেষের দিকে একদিন মুরাদ ভাই ছাত্রসংঘ ও জামায়াতের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্যকে তার ধানমন্ডি ১৫ নম্বর রোডের বাসায় চায়ের দাওয়াত দিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমি ছাড়াও ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদ, নুরুল ইসলাম, ইস্কান্দার আলী খান, মোহাম্মদ ইউনুস, মোস্তফা শওকত ইমরান এবং জামায়াতে ইসলামী থেকে জনাব গোলাম সারোয়ার, প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দুস ও ব্যারিস্টার কোরবান আলী। হাজির হতেই একজন আমাকে তীর্যক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন— কি ভাই, আপনার মুক্তিবাহিনীর কতদূর? প্রশ্নটার কোনো জবাব দেওয়ার মতো মানসিকতা আমার ছিল না। চা-নাশতা এসে গেলে মুরাদ ভাই আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে, এখন ভবিষ্যৎ স্ট্র্যাটেজি হিসেবে আমাদের কী করা উচিত বলে মনে করেন? প্রথমে কয়েকজন অতি উৎসাহী যুক্তি দিতে শুরু করলেন কীভাবে যা হয়ে গেছে তা ভুল নয়; বরং সঠিক হয়েছে। আলোচনার ধারা সঠিক খাতে চালাবার জন্য মুরাদ ভাই বললেন যে তিনি অতীত নয়; বরং ভবিষ্যতের ব্যাপারে জানতে চাইছেন। এর মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় হলো, গভর্নর ড. মালেকের মন্ত্রিসভায় জামায়াত থেকে কোনো সদস্য দেওয়া হবে কি না— এ সম্পর্কে মতামত। অতি উৎসাহীরা এই মুহূর্তে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কোনো নতুন চিন্তা না করে যে পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে, তাকে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য সঠিক হবে বলে জোরালো যুক্তি পেশ করলেন। শুধু আমি ও ব্যারিস্টার কোরবান ভাই ভিন্ন মত পেশ করলাম। আমি বললাম, পাকিস্তানের সংহতির জন্য অবশ্যই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শুধু একদেশদর্শী নীতি গ্রহণ না করে আমাদের উচিত হবে একাধিক সম্ভাবনা সামনে রেখে নীতি নির্ধারণ করা। এর জন্য বিকল্প স্ট্র্যাটেজিও আমাদের চিন্তা করে রাখতে হবে। মুরাদ ভাই জানতে চাইলেন সেই স্ট্র্যাটেজিটা কী হতে পারে বলে আমি মনে করি। বললাম, উভয় সংগঠন থেকে কিছুসংখ্যক সদস্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয় পদত্যাগ করে বসে যাবেন অথবা তাদের বর্তমান পলিসির সঙ্গে একমত না হওয়ার অভিযোগে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। খোদা না করুন, যদি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, যদি পাকিস্তান ভেঙে যায়, তাহলে নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের মূল লক্ষ্য ইসলামি আন্দোলন পুনর্গঠন করার জন্য এসব সদস্য সহজেই পদক্ষেপ নিতে পারবেন। ব্যারিস্টার কোরবান আলী ভাই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন। মুরাদ ভাই মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার সমস্ত অবয়বে অনুমোদনের ইশারা মিলল। কিন্তু আমার বন্ধুরা একমত হতে পারলেন না। একজন তো বলেই বসলেন, পাকিস্তান ভেঙে যেতে পারে এমন কথা চিন্তা করাও ইমানের দুর্বলতার লক্ষণ। বললাম, আমার ইমান তো পাকিস্তানের ওপর নয় বরং ইসলামের ওপর। কথা সেখানেই শেষ হলো আবারও আগের মতোই অমীমাংসিত। ভাবছিলাম, এটা তো আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ফোরাম নয়, তাহলে মুরাদ ভাই এই মিটিং ডাকলেনই-বা কেন? পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি যে ঘরোয়া পরিবেশে পরিস্থিতির ওপর মতবিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে আমার দূরত্বটা লাঘব করা যায় কি না, তিনি তার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার মহৎ চেষ্টা যে সফল হলো না, তা বুঝতে মুরাদ ভাইয়ের মতো অভিজ্ঞ নেতার বিশেষ দেরি হলো না। কয়েকদিন পর সম্ভবত জুন মাসের শুরুর দিকে একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে সাথিদের সঙ্গে একসঙ্গে চলা তোমার জন্য আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই অনেক চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তুমি ছাত্রসংঘ থেকে পদত্যাগ করতে পারো, তবে এক শর্তে— পদত্যাগের পর তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই জামায়াতে ইসলামীর সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। বললাম, তা তো এক কথাই হলো— শুধু মলাটটা বদলানো ছাড়া আর কিছু নয়। মুরাদ ভাই বললেন, জামায়াতে ইসলামীতে তুমি তো প্রথমে কেবল

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ দেবে, দায়িত্বশীল হিসেবে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোনো ফোরামে তোমাকে অংশ নিতে হবে না। এতে করে অন্তত ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বজায় থাকল— সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল না। জীবনে যে কজনের আদেশ-অনুরোধে না বলতে পারিনি, খুররম মুরাদ ছিলেন তাদের একজন। ইসলামী ছাত্রসংঘ থেকে পদত্যাগ করে জামায়াতের সদস্য পদের আবেদন জমা দিলাম।

শুধু ঢাকা নয়, বরং সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে তখন বিরাজ করছে এক গুমোট থমথমে অবস্থা। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য খুলেছে বটে, কিন্তু ওপরের হালকা আস্তরণ ভেদ করে একটু গভীরে তাকালেই সহজে নজরে পড়ত কীভাবে এক যান্ত্রিক অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে সর্বত্র। সমাজের চাকাটা ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু সামনে না এগিয়ে যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একই অবস্থানে। কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে শুরু করল।

পত্রিকা অফিসে আমার কাজ আগের মতোই চলতে থাকল। ইতোমধ্যে অবশ্য আমাদের পত্রিকা থেকে বেশ কয়েকজন স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় পাড়ি জমালেন। তাদের মধ্যে পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর এম আর আখতার মুকুল, সহকারী সম্পাদক আব্দুল গাফফার চৌধুরী, সিনিয়র সাব-এডিটর কামাল লোহানী ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ফলে সংকুচিত সংখ্যক সাংবাদিক নিয়ে আগের মতোই পত্রিকার কাজ এগিয়ে চলল। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের কারণে স্বাধীন ও সৃষ্টিধর্মী সংবাদ-নিবন্ধ রচনা ও পরিবেশনার প্রয়োজন আর রইল না। সংখ্যায় কম হলেও কর্তৃপক্ষ অবশ্য পত্রিকার মান আগের মতোই বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। ফলে আমাদের কাজ কমার পরিবর্তে উল্টো বেড়ে গেল। আমাদের নতুন কৌশলের সাংবাদিকতা সন্ধান করতে হলো, সরাসরি রাজনীতির চৌহদ্দি এড়িয়ে সমাজ, পরিবেশ ও অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে নতুন করে নিবন্ধ তৈরি করতে হচ্ছিল, যাতে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতির পর্যালোচনা করা সম্ভব। সংবাদপত্র অনেকটা নিউজ পেপার থেকে ভিউজ পেপারের রূপ নিল। শিগ্গিরই আমাদের বিদগ্ধ পাঠকশ্রেণিও অনায়াসে আবিষ্কার করে নিতে সক্ষম হচ্ছিল দুই লাইনের ভেতরে প্রচ্ছন্ন আসল সংবাদ। কে জানে দুনিয়ার যুদ্ধরত সব দেশে সাংবাদিকেরা সেন্সরসশিপকে ফাঁকি দিয়ে পাঠকদের সঙ্গে সংবাদ বিনিময়ের এই কৌশল অবলম্বন করে কিনা।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অপারেশন সার্চলাইটের পাঁচ মাস পরে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বোধোদয় হলো যে তাদের বেয়াকুফি কর্মকাণ্ডের কোনো একটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। তাই তড়িঘড়ি করে দাঁড় করা হলো একটা শ্বেতপত্র। আগস্ট মাসের ৮ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে আহ্বান করা হলো এক উঁচুমানের সংবাদ সম্মেলন। এতে রিপোর্টারদের বদলে দাওয়াত করা হলো সম্পাদক বা সহসম্পাদকদের। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মইনুল হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সাংবাদিক প্রতিনিধিদল এতে যোগ দিল তাদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, দৈনিক আজাদের সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, মর্নিং নিউজের বদর উদ্দিন, *পাকিস্তান অবজারভার*-এর নজরুল ইসলাম, *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর আমার সহকর্মী বন্ধুবর নুরুল আমিন, *দৈনিক সংগ্রাম*-এর সম্পাদক আখতার ফারুক এবং চট্টগ্রামের *দৈনিক আজাদি*র মোহাম্মাদ খালেদ ও মাহবুব আলম। শ্বেতপত্রটা আগস্টের ৫ তারিখে প্রকাশ করা হলেও ৮ তারিখে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এম্বারগো করা থাকে, যেখানে কেন্দ্রীয় জনসংযোগ ও জাতীয় দপ্তরের মন্ত্রী জেনারেল রোয়েদাদ খান আনুষ্ঠানিকভাবে এটা প্রথম প্রকাশ করেন। চার পরিচ্ছেদের এই শ্বেতপত্রে ইয়াহিয়া সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ, নির্বাচন, রাজনৈতিক পরিবেশে এবং মার্চ মাসে সেনাবাহিনী নিয়োগ পর্যন্ত ঘটনার ধারাবিবরণী প্রদান করা; তৃতীয় পরিচ্ছেদে মার্চ মাসের প্রথম অর্ধেকে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিহারি ও অন্যান্য অবাঙালি সম্প্রদায়ের ওপর পরিচালিত জঘন্য হত্যাযজ্ঞের বিবরণ পেশ করা হয়। শ্বেতপত্র প্রকাশ ছাড়া এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ৮৬ জন এমএনএ ও এমপির ওপর থেকে ইতোপূর্বে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানি পত্রিকা সম্পাদকদের নেতা হিসেবে মইনুল হোসেন সাহেব তার বক্তব্যে বলেন, তার প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের সংহতি অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ব পাকিস্তানের সব ন্যায়সংগত অধিকার অবিলম্বে পূরণ করার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

রাজনীতির ময়দান তখন একরকম শূন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। পাকিস্তানের ঐক্যে বিশ্বাসী দলগুলো জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠন করে সামরিক সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করছিলেন। সেনাবাহিনীর দালালি অথবা তাদের আগ্রাসনে সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের বাড়াবাড়ি, জুলুম ও অত্যাচার থেকে যতটা সম্ভব দেশবাসীকে বাঁচানোর চেষ্টাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কাজে যে তারা সব সময় সফল

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

হচ্ছিলেন তা-ও নয়। ফলে আওয়ামী লীগ ও অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সহজেই তাদের জনগণের দুশমন হিসেবে বদনাম করার সুযোগ পাচ্ছিল। তাই বলে এসব নেতার মধ্যে আদর্শবাদী-নীতিবানরা মুখ বুজে সামরিক বাহিনীর জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছিলেন এমনটা মনে করাও ঠিক হবে না। বরং তারা এক প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তা স্পষ্ট। সাংবাদিক হিসেবে এ ধরনের একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা আমাকে কভার করতে হয়েছিল ১৪ আগস্ট পাকিস্তান দিবস উপলক্ষ্যে কার্জন হল মিলনায়তনে শান্তি কমিটি আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে। এতে সভাপতিত্ব করেন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আমিন সাহেব। অপর দুজন বক্তা তখনো এসে হাজির না হাওয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকেই প্রথম ডাকা হলো। আমি ছাড়াও আর একজন প্রবীণ সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন— নুরুজ্জামান ভাই, যিনি জামায়াতের সংগঠনের অগ্রসর সদস্য এবং আমাদের আস্তাবলের অপর *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*-এর সাংবাদিক।

অধ্যাপক গোলাম আযমের সেদিনের বক্তৃতা ছিল নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, আপসহীন। সামরিক বাহিনীর এবং খোদ টিক্কা খানের এমন মুখর সমালোচনা মার্শাল ল'র মধ্যেই করার সাহস একমাত্র সেই নেতাই করতে পারেন, যার বিশ্বাস জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলাই উত্তম জিহাদ। তার বক্তৃতার উত্তাপে আনন্দিত যেমন হচ্ছিলাম, আশঙ্কিতও হচ্ছিলাম তেমনি।

তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে কোনো সামরিক শক্তি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয়ই দিতে পারত, তাহলে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হতো। আপনারা নিজেদের বলেন পাক বাহিনী, অথচ করছেন সব নাপাক কাজ। তিনি বলেন, শান্তি কমিটি থেকে গভর্নর টিক্কা খান সাহেবকে বারবার এসব বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, কিন্তু তিনি কোনো নিয়ন্ত্রণ আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সামরিক সরকারের এই ব্যর্থতার ফলে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও মিলিশিয়াই জনগণকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেবে। এসব জুলুম-অত্যাচার চালাতে থাকলে জনগণের আস্থা কী করে থাকতে পারে? জনগণকে বিরূপ করে কেবল শক্তির জোরে পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

স্তব্ধ-অবাক হয়ে শুনছিল শ্রোতারা, তাদের চোখে-মুখে দেখা যাচ্ছিল আনন্দমাখা অনুমোদনের ছাপ। নুরুজ্জমান ভাই ও আমি বক্তৃতা চলাকালেই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। সিনিয়র হিসেবে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

নুরুজ্জামান ভাইই অন্তত দুবার অধ্যাপক সাহেবকে সমালোচনার ভাষা আরও সংযত করার পরামর্শ পাঠালেন। তিনি নোটগুলো পড়লেন বটে, তবে তেমন আমলে নিলেন বলে মনে হলো না। তার আলোচনা বাদবাকি সভার মোড় ঘুরিয়ে দিল, তার মতো খোলাখুলি না হলেও পরবর্তী বক্তাদের ও অনুযোগ-অসন্তোষের সুর-বজায় রাখতে হলো। খুশি মনে অফিসে ফিরে গিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে দিলাম। কিন্তু সরকারি সেন্সরশিপ ও পত্রিকার সেলফ সেন্সরশিপের কারণে সে ধরনের গরম প্রতিবেদন অবশ্য প্রকাশিত হলো না।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার আর এক কূটকৌশল চালল চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে শাসনের চেষ্টা করে। তারা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের একমাত্র আদরের কন্যা বেগম আখতার সোলাইমানকে করাচি থেকে পাঠালেন আওয়ামী লীগকে দুইভাগ করে সরকারের বশংবদ আর একটা আওয়ামী লীগ গঠন করার চেষ্টা করে দেখতে। শহীদ-কন্যার সম্মানে জহিরুদ্দিন সাহেবসহ এতকাল আত্মগোপন করে থাকা দু-চারজন আওয়ামী নেতা তার সঙ্গে দেখা করে গেলেন বটে, তবে দুই নম্বর আওয়ামী লীগ গঠন করতে রাজি হলেন না কেউই। একরকম খুশি হয়েই বেগম আখতার সোলায়মান ফিরে গেলেন জেনারেলদের কাছে রিপোর্ট দিয়ে কোনোরকম দায় সারতে।

যে কারণেই হোক, ইয়াহিয়া খান শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে দানবিক শক্তি প্রয়োগ করে ত্রাসের সঞ্চার তো করা যায়, কিন্তু জনমত পক্ষে আনা যায় না। সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হলো বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ধুম। কসাই নামে কুখ্যাত টিক্কা খানকে সরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজিকে। আওয়ামী লীগের ৭৮ জন এমএনএ ও মোট ১৯৩ জন এমপিকে পদচ্যুত করে তাদের সিটে উপনির্বাচন ঘোষণা করে বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে ৫৫ জনকে বিনা নির্বাচনে নির্বাচিত করেন। গভর্নর পদে মনোনীত করা হলো আরেক গোবেচারা মানুষ ডক্টর এমএ মালেককে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে ঘোষণা দেওয়া হলো সাধারণ ক্ষমার। কিন্তু এতেও তেমন কোনো লাভ হলো না। কলকাতার শরণার্থীদের মধ্যে খুব একটা দেশে ফেরার আগ্রহ দেখা গেল না। ড. মালেকের সরকার এক বেসামরিক মন্ত্রিসভাও গঠন করলেন। মন্ত্রী হয়ে গেলেন অন্যদের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর জনাব আব্বাস আলী খান, মাওলানা একেএম ইউসুফও।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও দেশে শান্তি কায়েম হয়ে গেল মনে করলে ভুল হবে। বরং বলা চলে, নৃশংসতার শুধু প্রকারভেদ হলো। শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি বর্বরতার অমানুষিক প্রতিযোগিতা; সেনাবাহিনীর নির্বোধ পাশবিকতার জবাবে নতুন গজানো মুক্তিবাহিনীর এলোপাতাড়ি প্রতিবাদী পাশবিকতা। ফলে শান্তি দূরে থাক, সাধারণ মানুষ দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছিল আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের এক শ্বাসরুদ্ধকর গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে। সরকারি উদ্যোগে গঠিত হলো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এক বেসামরিক সাহায্যকারী বাহিনী। এর নামকরণ করা হলো 'রেজাকার', শাব্দিক অর্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এরা প্রধানত বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, পুল ও রাস্তাঘাট নাশকতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পাহারা দেওয়ার কাজ করত। থানা-পুলিশের অধীনেই এদের কাজ করতে হতো। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল কর্মহীন বেকার চাষি ও শ্রমজীবী মানুষ এবং অল্প কিছুসংখ্যক ছাত্র। আনসার বাহিনীর মতো এদেরও সামান্য ভাতা দেওয়া হতো। এদের হাতে ছিল শুধু লাঠি, কোনো আগ্নেয়াস্ত্র তাদের দেওয়া হতো না। তবে এদের মধ্যে শিক্ষিত ও সাহসী কিছু যুবককে আরও অগ্রসর প্রশিক্ষণের পর অস্ত্র হাতে দেওয়া হয়েছিল। এরা সেনা তত্ত্বাবধানেই কাজ করত। কেন্দ্রীয়ভাবে এদের কোনো বিশেষ নামকরণ করা না হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় কমান্ডাররা আলবদর, আলশামস প্রভৃতি রোম্যান্টিক নাম দিয়েছিল এসব বাহিনীকে। পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের মাত্র এক মাস আগে নভেম্বরের ১৪ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রথম আলবদর গঠনের যে ঘোষণা দেন তাতে বলা হয়, 'আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাক সেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতি সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। ...তরুণ যুবকেরা সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।' এই বিবৃতিতেও কেন্দ্রীয় নয়, বরং স্থানীয় উদ্যোগে গঠিত হওয়ারই উল্লেখ মেলে। এতে স্বাধীনতার বিরোধিতা নয়, বরং হিন্দুস্তানকে খতম করাটাই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন এসব বাহিনীর নামও উল্লেখ করার উপায়ে নেই। কিন্তু মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মতো প্রাচীন আওয়ামী লীগ নেতাও লিখে গেছেন কী করে এসব গ্রুপের সদস্যরাও সহায়তা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'শুধু

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ছোট-বড় অফিসারই না, পাক-সরকার নিয়োজিত শান্তি কমিটি, রেজাকার ও বদর বাহিনীর বহু লোকও তলে তলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুত, নিজেদের স্বরূপ ঢাকার মতলবেই এঁদের বেশির ভাগ শান্তি কমিটি, রেজাকার ও বদর বাহিনীতে নাম লেখাইয়াছেন। এমনকি পাকবাহিনীর দেওয়া অস্ত্র দিয়াই এঁদের অনেকে পাক সৈন্যকে গুলি করিয়াছেন।'[২২]

চরম অস্বাভাবিকতার সেই দিনগুলোতে পরিস্থিতিই উভয় পক্ষের মানুষকে পথে নামতে বাধ্য করেছিল। অনেকটা মোহগ্রস্ত মানুষের মতো পূর্বাপর বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছিল সবাই। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর দল ভুলেও কল্পনা করেনি যে এক শিকল তো তারা ছিঁড়ল ঠিকই, কিন্তু বদলে গলায় পরতে হলো আরও এক শক্ত-কঠিন শিকল। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের আগ্রহে অন্য দল মুখ বুজে হজম করল পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর পাশবিকতা। একদল চাইল দেশ বাঁচাতে, অন্য দল দেশ স্বাধীন করতে। ফল দাঁড়াল— জিতল না কেউই, কিন্তু চিরকালের মতো জাতির বুক চিরে রেখে গেল বিভেদের আর প্রান্তিকতার চরম অভিশপ্ত এক সীমারেখা।

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলল প্রচ্ছন্ন সংঘাত, সামনাসামনি যুদ্ধ তো নয়ই, এমনকি পুরোপুরি গৃহযুদ্ধও বলা চলে না। পশ্চিমা সেনাবাহিনীকে বিব্রত করার জন্য মুক্তিবাহিনী সময়-সুযোগমতো হানা দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাত সড়ক, পুল ইত্যাদি সরকারি স্থাপনার ওপর। আর আহত জন্তুর আক্রোশে বদলা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত পাকিস্তানি সৈন্যরা। তাতে শুধু যে হানাদার মুক্তিরাই মারা পড়ত তা নয়, প্রায়ই মারা পড়ত অসহায় জনসাধারণও।

ঢাকাসহ প্রদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ছিল বটে, তবে উপস্থিতি ছিল একান্তই নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও আবাসিক হলগুলো যথারীতি খোলাই ছিল, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা এতই কম ছিল যে বন্ধ না খোলা বোঝা যেত না। সীমান্তের ওপারে যারা পাড়ি জমাতে চায়নি তাদেরও কারও কারও পরিবার প্রদেশের মধ্যেই অন্যত্র স্থান বদল করতে হয়েছিল। অনেকে উপস্থিত হতো না জানের ভয়ে, পাছে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে সাহায্য করার অপরাধে বিদ্রোহীদের হাতে সাজা পেতে না হয়। শিক্ষকদেরও কতক তো ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন,

২২. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১১৫।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যারা যাননি তারাও মহা আতঙ্কে কাল কাটাচ্ছিলেন। কারণ যারা এখনো দেশে থেকে কাজ করে যাচ্ছিলেন পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরাতে কলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্র অনুষ্ঠানে এম আর আখতার মুকুল প্রাণদণ্ডের হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই হাওয়াই মৃত্যুদণ্ডের কিছু কিছু কার্যকর করা হয়েছে বিজয় দিবসের পূর্বমুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর রাতে। সরকার আবার পাকিস্তানের সংহতি বিশ্বাসী বলে যাদের মনে করেছিল তাদের দেশ-বিদেশে পাঠিয়ে জনমত তৈরিতে নিজেদের অতীত অযোগ্যতার ক্ষতিপূরণের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। ফলে এদের অনেককেও থাকতে হচ্ছিল অনুপস্থিত। অধ্যাপকদের মধ্যে পলাতকদের বরখাস্ত এবং উপস্থিতদের মধ্যে যাদের দেশবিরোধী (মনে রাখতে হবে, দেশ মানে তখনো পাকিস্তান) বলে মনে করা হচ্ছিল, তাদের হয় বরখাস্ত, নয়তো সতর্ক করে দিয়ে টিক্কা খান নোটিশ জারি করলেন। যেসব পদ খালি ছিল, সেখানে এখান-ওখান থেকে এনে পূর্ণ করার চেষ্টা করা হলো। যেমন— রাজশাহী থেকে ড. সাজ্জাদ হোসেন সাহেবকে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর করা হলো। মোটামুটিভাবে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করতে লাগল এক গুমোট অস্থিরতা, যার ফায়েদা কুড়াল সীমান্তপারের বিদ্রোহীরা।

আগেই বলেছি ছাত্রসংঘ থেকে আমার পদত্যাগের কথা। সে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা— এক পা বাইরে আর এক পা ভেতরে। এই অভিনব অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ঠিকই সময় লাগল, তবে শিগ্‌গিরই সৃষ্টি হলো একটা নতুন বাস্তবতা। সংগঠন থেকে বেরিয়ে এলাম যদিও, কিন্তু সংগঠনের সাধারণ কর্মী ও সদস্যদের জন্য এতকালের পুঞ্জীভূত আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব থেকে গেল সম্পূর্ণ অটুট। সভা-বৈঠকে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন আর রইল না বটে; কিন্তু তবু পথেঘাটে যেখানেই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই ঠিক আগের মতোই দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরত, কোনোমতেই বোঝার উপায় ছিল না যে আমাদের সম্পর্কে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন এসে গেছে। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বন্ধু ইস্কান্দার আলী খান এবং শেষের দিকে মুহাম্মদ ইউনুস তখনো আমার সঙ্গে একই বাসায় থাকত। মেডিকেলের শেষ বর্ষের ছাত্র আমার একান্ত স্নেহাস্পদ মোস্তফা শওকত ইমরান, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরসহ অন্য স্নেহভাজন কর্মীরা বায়তুল মোকাররমে, নিউ মার্কেটের খাবারের দোকানগুলোতে তাদের খাওয়াবার জন্য যখন-তখন আবদার ধরত। আর তাদের সেই আবদার রক্ষা করতে পেরে আমিও বড় ভাইয়ের মতো আত্মতৃপ্তি অনুভব করতাম।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দিনের সিংহভাগ *পূর্বদেশ* অফিসেই কাটত, কখনো লিখে, কখনো পড়ে। আর পড়ার উপাদানেরও অভাব ছিল না *পূর্বদেশ* অফিসে। সারা দেশের ছোট-বড় সব পত্রিকা, ম্যাগাজিন ছাড়াও *পূর্বদেশ* ছিল সম্ভবত ঢাকার একমাত্র বাংলা দৈনিক, যার প্রকাশনাগ্রুপ (অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স) আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের যথাসম্ভব অবহিত রাখার জন্য দুনিয়ার নামকরা সব পত্রিকা-জার্নাল কিনে আনত। বিদেশি সাংবাদিকতার কাছে আমাদের শেখারও ছিল যথেষ্ট, বিশেষ করে সৃজনশীল সংবাদ প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে। দেশের আসল অবস্থার রিপোর্টিং যেহেতু অনেকটা অসম্ভব ছিল, তাই সমাজ, পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন লিখে দায়িত্ব আদায় করেছিলাম। ঘরে ফিরে এলে খাওয়াদাওয়া ও গল্পগুজব ছাড়াও তাৎক্ষণিক সংবাদের জন্য রেডিও শুনে সময় কাটাতাম। রেডিও পাকিস্তানের সরকার অনুমোদিত নিরস সংবাদ বুলেটিনই শুধু নয়, বেতার সংবাদের ময়দানে শ্রোতাদের সামনে খোলা ছিল আরও একরাশ বিকল্প পরিবেশনা। ভারতীয় বেতারকেন্দ্র আকাশবাণী, ভারত থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি।

অফিসের বাইরের পৃথিবীটাতে রাজনীতির মেরুকরণ তখন প্রায় চূড়ান্ত। এক পক্ষ পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অন্য পক্ষ আপসহীন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নতুন দেশ গড়ার স্বপ্নে। গ্রামেগঞ্জে, শহরে-শহরতলিতে উভয় পক্ষ নিয়েছে মুখোমুখি অবস্থান। পাকবাহিনী সেনানিবাসে অবস্থান করলেও ট্যাংক ও আরমার্ড ভিহিকেল নিয়ে প্রতিনিয়ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল যত্রতত্র। পাকিস্তান সমর্থক স্বেচ্ছাবাহিনী রাজাকারদের জন্য কোথাও বা কায়েম করা হলো পৃথক ক্যাম্প আবার কোথাও সামরিক ছাউনির ভেতরেই করা হলো তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা। অবস্থান যেখানেই হোক, তাদের কাজ করতে হতো সম্পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণে। এসব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী অনেক ছাত্রও যোগদান করল। আমার ছেড়ে আসা সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের অনেকেও যোগ দিল এতে। মতবিরোধের কারণে দলত্যাগ করলেও এদের অনেকের সঙ্গে মানবিক পর্যায়ে আন্তরিকতার সম্পর্ক তখনো ছিল অটুট। বড়ভাইয়ের মতো সম্মান করত অনেকে, তাছাড়া সংগঠনের পলিসির সঙ্গে সাংঘর্ষিক মত পোষণ করা সত্ত্বেও আমার স্বাধীন মতপ্রকাশের সাহসিকতাকে শ্রদ্ধা করত তারা। তাই এই নতুন পরিস্থিতিতেও প্রয়োজনের মুহূর্তে আলোচনা-পরামর্শ করতে যোগাযোগ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

করত কেউ কেউ। মনে আছে, সেপ্টেম্বর মাসে শেষবার দেশের বাড়িতে আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করতে যাই।

রাস্তাঘাট নানা প্রতিকূলতায় ভরা, গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পথে পথেই মুক্তিরা উড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পুল, রেল চলাচল তো বন্ধই, সড়কপথেও অবিচ্ছিন্ন— যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। ঢাকা থেকে বেবিট্যাক্সি নিয়ে দাউদকান্দি এসে সেখান থেকে ছোট লঞ্চে করে চাঁদপুর পার হয়ে নোয়াখালী জেলার নীলকমলে এসে নামলাম। ভাবছিলাম, কী চমৎকার একটা কাব্যিক নাম। তবে মনে করতে পারলাম না নীল রঙের কমল বা পদ্মফুল কখনো দেখেছি কিনা। নীলকমল থেকে আবার খানিকটা রিকশা আর খানিকটা বাসে করে আমার অঞ্চল দাগুনভুঞাঁয় পৌঁছালাম। তারপর আবার রিকশা নিয়ে বাড়ি।

মাত্র দুইদিন বাড়িতে কাটাই। দেখলাম আমাদের বাড়িতেও শরণার্থীরা রয়েছে। আমার কলেজজীবনের মেজবান অধ্যাপক জাহাঙ্গীর চৌধুরী ও তার বন্ধু নিজামুদ্দিন সাহেবরা তাদের পুরো পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে উঠেছেন আমার জেঠাদের ঘরে। আগে তারা কোনোদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন বলে মনে নেই। উঁচু মানের আয়েশি জীবনে অভ্যস্ত তারা, সংকটে না পড়লে এই পাড়াগাঁয়ের সাদামাটা জীবন মেনে নেওয়া সহজ হতো না তাদের জন্য। ফেরার পথে ফেনীতে আল ফালাহ মাদরাসায় কিছু সময় কাটাই। পুরাতন বন্ধুবান্ধব অনেকের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হয়। ইলিয়াস তখন ফেনী ছাত্রসংঘের সভাপতি আর অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক (রাজাকার) বাহিনীরও প্রধান। ইলিয়াসের কথা আগেই বলেছি। লম্বা-চওড়া গড়নের সুঠাম যুবক ইলিয়াস। কিন্তু মনটা তার মোমের মতোই নরম। চেহারায় সব সময়ের মতোই নিখুঁত আত্মবিশ্বাসের ছাপ। অন্যরা হয়তো লক্ষ নাও করতে পারে, কিন্তু আমি যেন কী এক উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ্য করলাম তার চোখে-মুখে। আগে থেকেই আমাকে সে দাদু ডাকত। আবদারের সুরে বলল, দাদু, চলেন আপনাকে ফেনীর আশপাশে একটু ঘুরিয়ে দেখাই, প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে তদারক করে দেখতে পারবেন। আমার সাংবাদিক মন সহজেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নিল। সোনাগাজীর পথ ধরে চলতে শুরু করলাম, খোলা জিপের সামনের সিটে ড্রাইভার, মাঝে আমি ও ইলিয়াস আর পেছনে খাকি পোশাকে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়ানো দুই রাজাকার যুবক। বললাম, এসবের আবার দরকার কী ছিল? নিরাপত্তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, একটু পরেই দেখতে পাবেন—

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

হেঁয়ালিভরা হাসি হেসে ইলিয়াস জবাব দিলো। রাস্তার দুপাশে জমিনে চাষিরা কর্মরত, পথের পাশ ধরে গৃহপালিত পশুদের নিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ। জিপের সামনে এলেই তারা এমনকি জমিন থেকে চাষিরাও সসম্ভ্রমে সালাম দিচ্ছে। গম্ভীর স্বরে ইলিয়াস বলল, দাদু, সালাম কিন্তু ওরা আমাদের দিচ্ছে না, দিচ্ছে ওই রাইফেল দুটোকে। আমাদের এই ভূমিকা কেউ পছন্দ করছে না। রাইফেল দুটো না থাকলে সালামের বদলে ডান্ডা দিত। আমার আশঙ্কার বাস্তব প্রমাণ দেখে বিচলিত হলাম। বুঝলাম, আমি সংগঠনের পুরোপুরি বাইরে, আর ইলিয়াসের শুধু দেহটা ভেতরে, মনটা নয়। আমার অবস্থান সে জানে, তাই মন খুলে অনেক কথা বলল। দুঃখ, গ্লানি আর তিক্ততাভরা কণ্ঠে সে যা শোনাল তার সারসংক্ষেপ হলো—

আমাদের এই ভূমিকাটা বোধ হয় মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। এই ভূমিকার বিরোধিতা করে সংগঠন থেকে আপনার পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তটা শুরুতে আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারিনি, ভেবেছিলাম আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এখন যতই ভেতরে ঢুকছি, ততই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে আপনার কথাই ঠিক ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা আর তাদের সঙ্গে আসা অশিক্ষিত, অমার্জিত মিলিশিয়ারা যে ব্যবহার করছে, তাকে বর্বরোচিত বললেও কম বলা হয়। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার প্রধান অন্তরায় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা নিজেরাই। এতদিন যারা এক পাকিস্তান রাখার পক্ষে ছিল, তারাও নিরাশ হচ্ছে অনেকটা বাধ্য হয়ে এবং ধীরে ধীরে জয়বাংলার দিকে ঝুঁকছে। দেশরক্ষার সহায়তা কী করব, এদের বর্বরতা থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচানোই এখন আমাদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে।

গ্রামাঞ্চল ঘুরে ফিরে এলাম ফেনীতে। ট্রাংক রোডে একটা দোতলা ঘরের ওপরতলায় ছাত্রসংঘের অফিসে নিয়ে এলো ইলিয়াস। চা-নাশতার সঙ্গে কথাবার্তাও চলতে থাকল। কোন ধরনের আচরণকে ইলিয়াস বর্বরোচিত বলছিল তার বাস্তব প্রমাণ মিলতেও দেরি হলো না। দীর্ঘদিন ধরে ভেবেছি, কেমন করে কদর্যতার এই চরম জঘন্য বিবরণ লিখে প্রকাশ করি। শেষ পর্যন্ত লেখারই সিদ্ধান্ত নিলাম, দুই কারণে— পাকিস্তানি নরপশুদের বর্বরোচিত আচরণ আর তার মোকাবিলা করতে আমাদের অক্ষমতার পরিমাপে সাহায্য করতে। দুজন সশস্ত্র সিপাহি অফিসে এসে ঢুকল একটা ২০-২১ বছরের বাঙালি যুবককে সঙ্গে নিয়ে। সিপাহি দুটো রাইফেল হাতে দরজার কাছে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল, ছেলেটা সালাম দিয়ে ইলিয়াসের সঙ্গে একান্তে কিছু বলতে চাইল।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ইলিয়াস ছেলেটাকে নিয়ে পেছনের এক কামরায় গিয়ে বসল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মলিন মুখে বেরিয়ে এসে বলল, দাদু আপনিও আসুন, ছেলেটার কথাগুলো শুনুন। কেঁদে কেঁদে যে বর্ণনা সে দিলো, তা শুনতে শুনতে আত্মগ্লানির এক ঢেউ এসে যেন তিক্ততায় ভরে দিলো সমস্ত অন্তর-মন। সেই বর্ণনা খাঁচাবদ্ধ এক অসহায় যুবকের পাকিস্তানি সৈন্যরূপী হিংস্র হায়েনাদের পাশবিকতা থেকে মুক্তির আকুতি। ছাউনির রাতগুলো তার জন্য বয়ে আনে বীভৎস নারকীয় ভীতি। অথচ জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া এ থেকে পালাবারও কোন পথ নেই তার। পালাতে গেলেই শত্রুর চর বলে গুলি করে মারতেও দ্বিধা করবেনা তারা। তাই ছাউনি থেকে বেরোতে হলেও দুজন পাহারা থাকে তার সঙ্গে। রাগে, ক্ষোভে যেন রক্ত চেপে গেল আমার মাথায়। বললাম, ওই হারামজাদা দুটোকে বিদায় কর, সে থাকুক এখানে। অসহায় কণ্ঠে ইলিয়াস বলল, তারও কোনো উপায় নেই। সেই চেষ্টা করলে ওরা এখানেই খুনখারাবি শুরু করতে দ্বিধা করবেনা। নিরুপায় হয়ে বললাম, তাহলে ফেনীর কমান্ডারের কাছে চল, আমিও সঙ্গে যাব। ইলিয়াস বলল, তাতেও কোনো লাভ হবেনা। সেটা একটা আস্ত কাদিয়ানি, আমাদের মোটেই পছন্দ করে না। সে তার সিপাহিদেরই পক্ষ নেবে, উলটো আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আর আপনাকে তো নেওয়াই যাবে না, আপনি গেলে আপনাকে বাইরের লোক বলে আটকেও ফেলতে পারে। সেদিনের মতো নিজেকে এতটা অক্ষম, অপদার্থ জীবনে আর কোনোদিন মনে হয়নি। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত মাথায় বয়ে নিয়ে ফেনী থেকে বিদায় হলাম।

ঢাকায় ফিরে এসেও স্বাভাবিকভাবে কাজকর্মে মন দিতে পারলাম না। অনেকটা যান্ত্রিক গতানুগিকতায় অফিসে যাই আর বাসায় ফিরি। মাঝেমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও পুরোনো সহকর্মীরা টেলিফোন করে খোঁজ-খবর নেন। জানতে চান দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত। তাদের প্রায় সবার কণ্ঠেই নিরঙ্কুশ হতাশার ধ্বনি। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজনরা কেউ কেউ চাইত পরামর্শ বা আশ্বাস। যেমন একদিন ফোন এল জাহাঙ্গীরের। মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল সে। তুখোড় মেধাবী, সুঠাম-সুদর্শন, দুর্বার-দুরন্ত, জাহাঙ্গীর অনায়াসে জয় করে নিত মানুষের মন। সংগঠনের অগ্রসর সদস্য হিসেবে তার ওপরও পড়েছিল রাজাকার বাহিনীর এক ইউনিটের কমান্ডের দায়িত্ব। প্রায়ই সে আবদার করত একদিন গিয়ে তাদের দেখে আসার জন্য। গিয়েছিলামও একবার, সে ঘুরেফিরে দেখাল আর সেই সঙ্গে পাকিস্তানিদের অযোগ্য পরিচালনার বর্ণনাও দিল অনেক।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দেশের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ তখন ঝড়ের আগের থমথমে মেঘের কালিমাঘেরা। মফস্বলের ছোট-বড় অনেকগুলো শহর ইতোমধ্যে হিন্দুস্তানি সেনাবাহিনীর হামলায় 'মুক্তাঞ্চলের' মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সব এলাকার পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা আশপাশের পাকিস্তানি সেনানিবাস অথবা ঢাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। ঢাকা শহরে তাই অনেক নতুন মুখের আনাগোনা। এই সুযোগ নিয়ে আরও অনুপ্রবেশ করেছে অনেক হিন্দুস্তানি সেনা ও তাদের মুক্তিবাহিনী সহযোগীরা। কোথাও কোথাও হচ্ছে গোলাগুলি বা বোমার বিস্ফোরণ। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ এম মালিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা এক বার্তায় জেনারেল নিয়াজির এক রিপোর্টের যে অংশবিশেষ যোগ করেন, তা থেকেই পরিস্থিতির পরিপূর্ণ চিত্র মেলে। তিনি লিখেছিলেন, 'পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং মেঘনার পূর্বাঞ্চলের পতন এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। ...চট্টগ্রাম অথবা প্রদেশের অন্য কোথাও থেকে কোনো কিছুই আনা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে ঢাকায় সবকিছুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সাত দিন পর ঢাকায় খাদ্য ও জ্বালানি তেল পাওয়া যাবে না এবং জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে।'

যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি বটে, কিন্তু যুদ্ধের দামামা যেন ক্রমেই বাজতে শুরু করেছিল প্রবল আওয়াজে। প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্ব জনমত তৈরির জন্য ইন্দিরা গান্ধী বের হলেন সোভিয়েত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানিসহ দুনিয়াজোড়া এক সফরে। তিনি বিশ্বনেতাদের বোঝালেন যে বাংলাদেশ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হওয়ার আগে ভারত বর্ডার থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারে না।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন *পূর্বদেশ* অফিসে বসে কাজ করছি, জাহাঙ্গীরের টেলিফোন কল পেলাম। বলল, একটা কঠিন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সে আমার পরামর্শ চায়। তাদের সেনাপরিচালকেরা সেই রাতে তাদের একটা টিমকে নারায়ণগঞ্জের কাছে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিফৌজের এক যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে পাঠাতে চায়। তাদের লড়তে হবে একাই, পাকিস্তানি সেনারা কেউ সঙ্গে যাবে না। এদিকে ভালো কোনো অস্ত্রও তাদের দেওয়া হচ্ছে না, সাদামাটা রাইফেল হাতে নামতে হবে শত্রুপক্ষের মর্টার-মেশিনগানের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় তার সাথিরাও ইতস্তত করছে। নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা সে করে না বটে, তবে তরুণ কর্মীদের এভাবে নিশ্চিত আত্মহত্যার

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মুখে ঠেলে দিতে তার নিজেরও মন টানছে না। এ অবস্থায় আমি তাকে কী পরামর্শ দিই? সত্যিই তো, কী পরামর্শ দিই তাকে! জীবনে এই প্রথম এত জটিল একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। জাহাঙ্গীরকে আমি আদ্যোপান্ত চিনি। অসম সাহসী সে, ভয়ভীতির কোনো তোয়াক্কা করতে কোনোদিন তাকে দেখিনি। সেই জাহাঙ্গীরের কণ্ঠে আশঙ্কার সুর শুনে চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। নিজের জীবন বাজি রাখতে যে সে ভ্রুকুটিও করবে না, তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। কিন্তু যে সহকর্মীদের সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে, তাদের কেমন করে নিজ হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে, সে দুশ্চিন্তাই তাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। কী পরামর্শ দিই তাকে, আমি তো আরও এক দোটানার মধ্যে, শুরু থেকেই পাকসেনাদের সহযোগিতার আমি প্রচণ্ড বিরোধী, তার ওপর আমার অনুজপ্রতিম জাহাঙ্গীর ও তার সাথিদের আত্মনিধনের অভিযাত্রায় পা বাড়াতে কেমন করে বলি? অন্যদিকে এতটা অগ্রসর হওয়ার পর সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পা বাড়াবার পরামর্শই বা কেমন করে দিই? বললাম, কী আর করবে, নেমেছ যখন, তখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পার! তাছাড়া এপথে অস্ত্র ভারী হোক বা হালকা, যা আছে তা নিয়েই তো নেমে পড়ার কথা। সে একমত হলো, কিন্তু টেলিফোন রাখার পরও মনের অস্থিরতা কাটাতে পারছিলাম না।

সারা রাত দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটালাম। পরদিন দুপুরে অফিসে যেতেই জাহাঙ্গীরের এক সহকর্মীর টেলিফোন পেলাম। আমার সমস্ত ভয়, সব আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। কাল রাতে ঢাকার অদূরে এক জলাভূমিতে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এক তুমুল যুদ্ধে শহিদ হয়েছে আমাদের একান্ত প্রিয় জাহাঙ্গীর। আমার মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ল। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলাম জাহাঙ্গীরের মোহাম্মদপুর টেকনিক্যাল কলেজের ক্যাম্পে। কলেজ ভবনের সামনেই একটা খাটে সাদা কাপড়ে ঢাকা জাহাঙ্গীরকে দেখলাম। তার সারা শরীর মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। তার সাথিরা জানাল, সে লড়ছিল শুধু একটা রাইফেল দিয়ে। চোখের অবিরাম ঝরতে থাকা অশ্রুধারা মুছতে মুছতে আবারও তাকিয়ে দেখলাম জাহাঙ্গীরের দিকে, উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত সারা অবয়বে তার যেন এক স্নিগ্ধ অথচ অবজ্ঞাভরা বিজয়ী হাসি। যেন আমাকে তিরস্কার করে বলছে, গেলাম তো আপনার কথামতো, এখন দেখুন কী হয়েছে! স্তব্ধ-বিদ্ধস্ত আমি পরাজিত এক গ্লানি বয়ে নিয়ে ফিরে এলাম অফিসে।

www.nagorikpathagar.org

CS CamScanner

তারপরের দিনগুলোতে যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকল অবিরাম। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো মফস্বল জেলা শহর পতনের খবর আসতে থাকল। পরাজিত পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের সহযোগী পাকিস্তান সমর্থক বাঙালিরা আশ্রয় নিতে ঢাকায় এসে জড়ো হতে লাগল। মানুষের চোখেমুখে শঙ্কা আর আতঙ্কের ছায়া ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। ঢাকায় তখন অদ্ভুত এক-দুই মুখী যাওয়া আর আসার পালাবদল চলছে। একদল বাড়িঘরের দখল ছেড়ে চলে যাচ্ছে, অন্যরা নতুন করে এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেই সব খালি ঘরবাড়িতে। ২৫ মার্চের আগে থেকেই অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে বহু পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা ও মার্চেন্টরা বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছে। এখন যুদ্ধ নিশ্চিত মনে করে বাদবাকিরা এবং বহু অবস্থাপন্ন বিহারিরাও চলে যেতে শুরু করেছে। সেই সব বাড়িতে এসে ঢুকছে স্থানীয় অধিবাসীরা অল্প দামে ভালো বাড়িতে থাকার সুযোগ নিতে অথবা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। আরও আশ্রয় নিচ্ছে মফস্বল অঞ্চল থেকে আসা নতুন শরণার্থী ও কলকাতা থেকে ফিরে আসা বাঙালিরা এবং সেই সঙ্গে অনেক ভারতীয়ও। নয়াপল্টনে আমাদের বাসাটা *পূর্বদেশ* অফিসের কাছে হলেও যথেষ্ট নিরাপদ ছিল না। খবর পেলাম, কারকুন বাড়ি লেনে ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর অফিস কাওসার হাউজের পাশের বাড়িটা খালি হয়েছে। তিন বেডরুম, ড্রইংরুম, বাগান ইত্যাদিসহ দেয়াল ও গেটে ঘেরা সুন্দর একতলা ভবন। ভাড়াও খুব বেশি নয়। আমি ও ইস্কান্দার তো নয়াপল্টনেই এক বাসায় ছিলাম, আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ইউনুস ভাই। তিন বন্ধু মিলে ভাড়া নিয়ে নিলাম বাড়িটা। দুটো বাড়িই সম্ভবত এক মালিকের সম্পত্তি হবে, তাই পাশের চৌহদ্দির দেয়ালে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া-আসার জন্য একটা গেটও ছিল। কাজ থেকে ফিরে এসে কাওসার হাউজে বসে গল্পসল্প ও আড্ডা দিয়ে সময় কাটত। আজান হলে পাশের মসজিদটায় দল বেঁধে গিয়ে জামাতে শামিল হতাম।

পূর্ব পাকিস্তানের সব সীমান্তে, এমনকি প্রদেশের অভ্যন্তরেও ভারতীয় সৈন্যদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী প্রতিনিয়ত হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের চিরাচরিত মূর্খতার ঐতিহ্য বজায় রেখে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শুধু পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই সম্ভব' (The defence of East Pakistan lies in the West) উর্বর-মস্তিষ্ক আইয়ুব খানের এই বেয়াকুফি সমরকৌশলমতো ৩ ডিসেম্বর বিকালে হিন্দুস্তানি বিমানবাহিনীর পশ্চিম সীমান্তের ১১টা ঘাঁটির ওপর চালাল স্বপ্রণোদিত আচমকা হামলা। ৩০ নভেম্বর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ খান

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ও চিফ অব আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান খান ১৯৬৭ সালে মিশরের ওপর ইসরাইলি হামলার অনুকরণে এই স্বপ্রণোদিত আচমকা হামলার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্ভট নামকরণে ওস্তাদ পাক বাহিনী এই তুঘলকি অভিযানের নাম দিল 'অপারেশান চেঙ্গিস খান'। অমৃতসর, আম্বালা, আগ্রা, অনন্তপুর, বিকানির, হালওআরা, যোধপুর, জলসামের, পাঠানকোট, ভুজ, শ্রীনগর ও উত্ত্রানিসহ মোট ১১টি ভারতীয় বিমানঘাঁটির ওপর বোমা বর্ষণ করল পাক বিমানবাহিনী। অবশ্য অমৃতসরসহ কয়েকটা ঘাঁটির রানওয়েতে দু-চারটা গর্ত করা এবং রাডার কেন্দ্রের ক্ষতি করা ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হলো না। উলটো ভারতীয় প্রতিরক্ষা হামলায় হারাল চারটি জঙ্গি বিমান।

সেই দিন সন্ধ্যায়ই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে বললেন, এই হামলা চালিয়ে পাকিস্তান মূলত হিন্দুস্তানের ওপর যুদ্ধই ঘোষণা করল। রাতেই ভারতীয় জঙ্গিবিমান পাল্টা হামলা চালাল বিভিন্ন পাকিস্তানি ঘাঁটি ও শহরের ওপর। সেই আক্রমণ আরও প্রচণ্ড রূপ নিল পরদিন সকালে। হিন্দুস্তানি বিমানবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের মুরিদ, মিয়ানয়ালি, সারগোদা, চান্ধহার, রিসালেওয়ালা, রাফিকুল ও মসরুর এবং পূর্ব পাকিস্তানের তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা চালায়। উভয় দেশই যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এই মর্মে বিবৃতি প্রচার করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকে। ৫, ৬ ও ৭ ডিসেম্বরও চলতে থাকে তুমুল আকাশযুদ্ধ আর বিভিন্ন সীমান্তে হামলা ও পাল্টা হামলা। তেজগাঁ ও কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটি দুটোই সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল। পূর্ব পাকিস্তানে সামান্য যে কয়টা জঙ্গি বিমান ছিল, তার সবই কিছু আকাশে ডগফাইটে আর কিছু বিমানঘাঁটিতেই ধ্বংস হয়ে গেল। ৭ ডিসেম্বর বিকাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানে ভারত লাভ করল সম্পূর্ণ এয়ার-সুপেরিয়রিটি। প্রদেশের সারা আকাশে হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র আধিপত্য।

যুদ্ধ চলাকালেও নিয়মিতই অফিসে যাচ্ছিলাম। ছোট আকারে হলেও পত্রিকা প্রতিদিনই প্রকাশিত হচ্ছিল। রিপোর্ট করার উপযোগী খবরের অভাব ছিল না, তবে কড়া সামরিক সেন্সরশিপের কারণে সেসব লেখা ছিল অসম্ভব। শুধু টেলিপ্রিন্টারে আসা বিদেশি সংবাদ আর সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ অফিস থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতেই যা কিছু খবর বানিয়ে কোনো রকম দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। বাকি সময় কাটত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সাম্প্রতিক অবস্থা আর ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নিতে পারে, সেই সব বিষয়ে অলস আলোচনা-সমালোচনায়। 'যত জন তত মত' থিওরির অভাব ছিল না। তবে পাকিস্তানের জেতার সম্ভাবনা যে প্রতিদিনই সংকীর্ণতর হয়ে উঠছে— এ ব্যাপারে প্রায় সবাই ছিল একমত। রাতের শিফট আগের মতো দীর্ঘ রাত অবধি চলত না, ১০টা সাড়ে ১০টার মধ্যেই কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে যাওয়া যেত। কারফিউর জন্য যানবাহনের অভাব ছিল, তাই পত্রিকার মাইক্রোবাসে করেই আমাদের পৌঁছে দেওয়া হতো।

যুদ্ধ চলছে, সারা প্রদেশের আকাশসীমা পুরোপুরিই তখন হিন্দুস্তানি বিমানবাহিনীর দখলে। নিয়মিতই তারা উড়ে বেড়াচ্ছিল সারভেইলেন্স মিশনে আর পাকবাহিনীর ছাউনি, ক্যান্টনমেন্ট, অস্ত্রাগারগুলো শনাক্ত করে অবাধে উড়িয়ে দিচ্ছিল বোমা মেরে। প্রথম প্রথম তো পাকিস্তানিরা এনটি এয়ারক্রাফট দিয়ে গুলি চালিয়ে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করত, পরে এয়ারক্রাফট কেন্দ্রগুলোও ভারতীয় বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়ে গেলে পাক সেনাকেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানি বাহিনীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি রইল না।

ডিসেম্বরের ৮ তারিখ দুপুরে অফিস থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে খানিকটা ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সফল হলাম না; দেশ, জাতি, যুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের চিন্তার পাহাড় ডিঙিয়ে ঘুমের নৌকাখানি কূলে ভেড়ার কোনো সুযোগই পেল না। নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে কাউসার হাউজে গেলাম। দেখলাম খুররম ভাইও এসেছেন, সম্ভবত তাদের কোনো সভা ছিল। একটু পরেই পাশের মসজিদটা থেকে আছরের নামাজের আজান শুনে আমরা তিনজন একসঙ্গে নামাজের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে আলোচনা চলছিল, খুররম ভাই বললেন, দেখো সারওয়ার, যত জলদি সম্ভব পুরান ঢাকায় বেসমেন্টওয়ালা কয়েকটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেলো। 'কী জন্যে'? সারওয়ার ভাই জানতে চাইলেন। খুররম ভাই বললেন, এই যুদ্ধে পাকিস্তানের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই, ঢাকার পতনের পর ছেলেপেলেদের বাঁচাতে হলে এই রকম আশ্রয়ের খুব প্রয়োজন হবে। সারওয়ার ভাই অনেকটা উত্তেজিত সুরে বললেন, আপনার মুখে এসব কথা শুনলে কর্মীরা সাহস হারিয়ে ফেলবে। আর পাকিস্তান হারবে কেন? ইতোমধ্যেই তো পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য মার্কিন সেভেনথ ফ্লিট আসছে। তার স্বভাবসুলভ স্মিত হাসিমুখে খুররম ভাই জবাব দিলেন— সেভেনথ, এইটথ কোনো ফ্লিটই আসবে না। পাকিস্তানের পরাজয় হয় ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে, নয়তো আর

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। সুতরাং, আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে রাখতে হবে। সংগঠনের ভেতরে পরিস্থিতির বিশ্লেষণক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির জন্য খুররম ভাইয়ের সুখ্যাতি ছিল, তারপরও পাকবাহিনীর লজ্জাকর আত্মসমর্পণের দীর্ঘ আট দিন আগে এই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি দৈববাণীর মতোই আশ্চর্যজনক ছিল।

দিনকয়েক পর সকালবেলা অফিসে গেলাম, মোস্তফা ভাই এলেন না। সিনিয়র সাব-এডিটর এবং শিফট ইনচার্জ হিসেবে নিউজরুমে নিউজ এডিটর, চিফ রিপোর্টার ও অপর সিনিয়র সাব-এডিটর কামাল লোহানী ভাইয়ের পরই মোস্তফা ভাইয়ের স্থান। এমনিতেই কিছু সাংবাদিক কলকাতায় চলে যাওয়ায় অফিসে সাংবাদিকের সংখ্যা কম, তার ওপর তারমতো প্রথম শ্রেণির সাংবাদিকের অভাব যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছিল সংগত কারণেই। শুরুতে সবাই ভাবছিল হয়তো কোনো অসুবিধার জন্য আসতে পারেননি, হয়তো পরে এসে যাবেন। কিন্তু সেই ভুল ভাঙল যখন তার ছোটভাই অফিসে ছুটে এলেন তাকে খোঁজার জন্য। তিনি বললেন, গতরাতে তাকে বাসা থেকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে। বাসায় কান্নার রোল পড়ে গেছে, কী করা যায় কারও মাথায় আসছে না। তার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য পত্রিকা অফিসে ফোন করা হলো, কিন্তু কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। পরে নিউজ এডিটর এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ভাই আমাকে ডেকে বললেন, চৌধুরী, তুমি তো ইসলামী ছাত্রসংঘে ছিলে, সবাই বলছে তাদের অফিসে খোঁজ করে দেখতে, তুমি মোস্তফার ছোট ভাইকে নিয়ে কিছু খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করতে পার কিনা! আমি ও মোস্তফা ভাইয়ের ছোটভাই (নামটা এখন মনে পড়ছে না) একটা রিকশা নিয়ে ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনে ইসলামী ছাত্রসংঘের দপ্তরে গেলাম। তারা কিছু বলতে পারল না, তবে বিভিন্ন রাজাকার ক্যাম্পে ঠিকানা দিয়ে সেগুলোতেও খোঁজ নিতে পরামর্শ দিল। সেখান থেকে আবারও রিকশায় করে ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুরের ক্যাম্পগুলোতে গেলাম। ওদের অনেকেই আমার চেনাজানা, সুতরাং অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই তারা আমাদের ঘুরেফিরে দেখাল এবং বলল যে তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো খবর নেই। সুতরাং একরকম নিরাশ হয়েই অফিসে ফিরে এলাম। ডিসেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছিলাম, পাঁচ পাতা করে হলেও পত্রিকা কোনো রকম বের হচ্ছিল। নিউজপ্রিন্টের অভাব, ঘন ঘন আক্রমণ ও দীর্ঘ কারফিউ ইত্যাদির কারণে চলাচলের অসুবিধার কারণে ১৩ তারিখ থেকে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

CS CamScanner

এদিকে প্রতিদিনই যুদ্ধ দোরগোড়ায় এসে হাজির হতে থাকল, ভারতীয় বোমারু বিমান যেখানে খুশি নিশ্চিন্তে বোমা মেরে যাচ্ছিল অবিরাম। কুর্মিটোলা, ক্যান্টনমেন্টও নিস্তার পেল না। ফলে সেনাসদর ঘন ঘন স্থানান্তর করতে হচ্ছিল সেনা কম্যান্ডকে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সেফ জোন ভেবে অত্যন্ত গোপনে জেনারেল নিয়াজি লটবহর নিয়ে এসে ঢুকলেন মুহসীন হলে। হলগুলো তখন সম্পূর্ণ খালি, ছাত্ররা অনেক আগেই হল ছেড়ে যার যার বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু সারা ঢাকায় তখন হিন্দুস্তানি গোয়েন্দা ও তাদের বাঙালি চরেরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হলো না। পরদিনই মুহসীন হলের ওপর হামলা চালাল ভারত। ঢাকায় অবস্থানকারী সৈন্যদের সঙ্গে মফস্বল শহরগুলো থেকে পরাজিত সৈন্যরাও জমায়েত হয়েছে। এদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতাও নিয়াজি সাহেবের ছিল না। ফলে তিনি যে চোখে সর্ষে ফুল দেখছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এর পরের তিন-চারটা দিন কেটেছে চরম আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা আর খবরের অন্তহীন অনুসন্ধানে। পত্রপত্রিকা বন্ধ, রেডিও পাকিস্তানের সংবাদও হয় অসম্পূর্ণ নয় বানোয়াট। সুতরাং খবরের সন্ধানে অন্যত্র ঢুঁ মারা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সারাদিন বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও পাকিস্তান, আকাশবাণী কলকাতা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার শুনে, মিলিয়ে, যাচাই করে সঠিক খবর বের করার চেষ্টাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। বাকি সময় কাটত নামাজে, বই পড়ে আর কাউসার হাউজে গল্পগুজবে। কাউসার হাউজে তখন বিভিন্ন জেলা শহর থেকে আসা উদ্বাস্তুও জড়ো হয়েছেন অনেকজন। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা ও টানা কারফিউর মধ্যে সঠিক খবরের অভাবে গুজবের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য। কেউবা খবর দিচ্ছিল যে ভারতীয় সৈন্যরা ইতোমধ্যেই সাদা পোশাকে শহরে ঢুকে পড়েছে, আবার কেউ বলছিল ইউনিফর্ম পরা ভারতীয় অফিসারদেরও ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে দেখা গেছে। অন্যদিকে টেলিফোনে কেউ কেউ জানাচ্ছিলেন বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট নাগরিককে অপহরণ করার সংবাদ।

১৫ ডিসেম্বর রাতে কাওসার হাউজে ইস্কান্দার ও ইউনুস ভাইসহ আমরা তিন বন্ধু এবং আরও কজন সারওয়ার ভাইয়ের অফিসে বসে বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের খবর শুনে প্রকৃত অবস্থা অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম। একে একে রেডিও পাকিস্তান, অল ইন্ডিয়া রেডিও, বিবিসি ও ভয়েস অব অ্যামেরিকা বেতারকেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন বুলেটিন শুনলাম, যুদ্ধের খবর প্রায় প্রতিটি সংবাদেই

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কিছু না কিছু ছিল। কিন্তু সেই সব সাদামাটা খবরে আমরা যা জানতাম তার চেয়ে এমন অতিরিক্ত কিছু ছিল না। তবে রাত ১০টার ভয়েস অব অ্যামেরিকার সংবাদে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলল। এতে বলা হলো, 'ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক হাইকম্যান্ডের একটি বার্তা কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে ভারতীয় পূর্বাঞ্চল সামরিক হাই কমান্ডের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।' বার্তাটা যে কী তার কোনো বিবরণ অবশ্য সংবাদে দেওয়া হলো না। উৎসুক কণ্ঠে গোলাম সারওয়ার ভাই বললেন, কী বুঝলেন, কী হয়েছে মনে করেন? বললাম, বুঝব আর কী, সারেন্ডার হয়ে গেছে। তা কেমন করে বুঝলেন? সারওয়ার ভাই জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, এতে আর না বোঝার আছেটা কী? যুদ্ধরত দুই দেশের সেনাকম্যান্ড একে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণের দাসখত ছাড়া আর কী বার্তা পাঠাবে মনে করেন? এতকাল পরে চির-আশাবাদী সারওয়ার সাহেবের যেন বোধোদয় হলো, নিরাশ কণ্ঠে তিনি বললেন, আপনার কথাই বোধহয় ঠিক। অন্যরাও একমত হলেন। এই সময়ে টেলিফোন করলেন *পূর্বদেশ* সম্পাদক মাহবুবুল হক সাহেব, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী তা জানতে চাইলেন তিনি। আমি ভয়েস অব অ্যামেরিকার খবরের উল্লেখ করে আমাদের ধারণার কথা বললাম। মাহবুব ভাই একমত হলেন, এই প্রথমবার লক্ষ করলাম তার চিরসাহসী উচ্চকণ্ঠে এক অসহায়, পরাজিত ক্লান্তির সুর। এরপর আলোচনা শুরু হলো এখন কী করা যায়, তা নিয়ে। সবাই একমত হলাম যে স্বেচ্ছাসেবক নিরীহ যুবকদের বাঁচাতে হলে বিভিন্ন ক্যাম্পের দায়িত্বশীলদের তখনই কাউসার হাউজে ডেকে এনে প্রকৃত ঘটনা বিশ্লেষণ করে তাদের যথাসম্ভব জলদি ক্যাম্প ত্যাগ করে সাধারণ কাপড়ে যার যার মতো বেরিয়ে যেতে পরামর্শ দেওয়া হবে। ঢাকা শহর জামায়াতের তহবিলে টাকা যা আছে, তার সবই তাদের দিয়ে দেওয়া হবে ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য। সারওয়ার ভাই আমাকে ক্যাম্প দায়িত্বশীলদের টেলিফোন করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আসার জন্য খবর দিতে বললেন। আসতে বললেই যে তারা আসতে চাইবে, এমন কথা তো নেই। একে একে সবাইকেই টেলিফোন করলাম। প্রত্যেকের আওয়াজই ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে হলো, সবাই জানতে চাইছিল, এমন গুরুতর কী হয়ে গেছে যে যুদ্ধ ও কারফিউর মধ্যে এত রাতে আসতে হবে? আগামীকাল সকালে এলে হয় না? বললাম, না এখনই আসতে হবে, সকালে আসার কোনো উপায় আর না-ও থাকতে পারে। এ সময় মুরাদ ভাইয়ের ফোন এলো, তিনিও আমাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে পুরো একমত হলেন এবং বৈঠকে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জানালেন। তবে বললেন,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কারফিউর মধ্যে নিজের গাড়িতে তো তিনি আসতে পারবেন না, ছেলেরা যেন আসার সময় তাদের গাড়িতে করে তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। সারওয়ার ভাই মুজাহিদকেও ফোন করলেন এবং ওদের সঙ্গে আসতে বললেন। অন্যদের মতো মুজাহিদও প্রথমে না আসার নানা যুক্তি দেখাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলো আসতে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের পদস্থ নেতাদের মধ্যে আমিরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম, কেন্দ্রীয় জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব ও মাওলানা আব্দুস সুবহান কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য তখন লাহোরে রয়েছেন। আব্বাস আলী খান সাহেব ও মাওলানা এ কে এম ইউসুফ সাহেব গভর্নর মালেকের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে সরকারি তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এই জটিল মুহূর্তের সিদ্ধান্তের পালা তাই এসে পড়ল এই সম্পূর্ণ সাধারণ সমাবেশের ওপর।

তারপর অপেক্ষা, সংশয় আর অসহ্য নীরবতার সুদীর্ঘ একঘণ্টা প্রতীক্ষা শেষে একে একে সবাই এসে হাজির হলে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ আলোচনা শুরু হলো। সারওয়ার ভাই ও মুরাদ ভাই পরিস্থিতির একটা বর্ণনা দিলেন, আমরাও আমাদের মতামত দিলাম। সরলমনা যুবক নেতারা ব্যাপারটার গভীরতা সহজে বুঝে উঠতে পারছিল না। পরাজয়ের সম্ভাবনা কল্পনা করতেও যে তাদের কষ্ট হচ্ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু-একজন যুক্তি দিল যে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের আচরণে তো হেরে যাওয়ার বিন্দুমাত্রও লক্ষণ তারা দেখতে পায়নি, বরং মনে হচ্ছিল যে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আরও শক্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। প্রমাণ হিসেবে তারা বলল, এতদিন তো তাদের সাদামাটা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছাড়া আর কিছু দেয়নি। কিন্তু গতকাল আর আজ তো তারা মেশিনগান, রকেট প্রপেলড গ্রেনেড এবং আরও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রও বিপুল পরিমাণে তাদের দিয়ে দিচ্ছে। দুঃখ ও বিদ্রুপভরা কণ্ঠে বললাম, তারা তো তোমাদের বোকা বানাচ্ছে, আত্মসমর্পণের আগে তাদের জঞ্জাল তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা হালকা হচ্ছে আর তোমাদের আরও ডুবানোর বন্দোবস্ত করছে। পাকসেনাদের ব্যাপারে আমার শক্ত অবস্থানের কথা জানে, তাই কেউ সরাসরি জবাব দিলো না বটে, তবে মনে হলো সম্ভাবনাটা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানও তারা করল না। অনেক যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির শেষে মোটামুটি সবাই একই সিদ্ধান্তে এলো। তবে তারা বলল, এত রাতে কোথায় যাবে ছেলেরা, তারচেয়ে কাল সকালেই সবাইকে বিদায় দেওয়া হবে। আগের আলোচনা মতো সারওয়ার ভাইকে টাকা দেওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। তিনি অফিসের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সিন্দুক থেকে পাঁচ হাজার টাকা এনে ওদের হাতে দিলেন। ভাবলাম, মাত্র পাঁচ হাজার টাকা? এতগুলো ছেলে, এই সামান্য টাকায় কার কী হবে?

পরদিন সকাল হলো, অনেকটা অন্যান্য দিনের মতোই, কিন্তু তারপরও এক সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের সকাল। জয়-পরাজয়, উল্লাস-উৎসব, বিলাপ-বিক্ষোভ, আত্মহনন ও আত্মসমর্পণের চরম পরস্পরবিরোধী দ্বান্দিক অনুভূতির এক অদ্ভুত বিচিত্র সকাল। সারওয়ার ভাই জানালেন তার পরিবারসহ আমি, ইস্কান্দার, ইউনুস ভাই ও (প্রিন্সিপাল) রুহুল কুদ্দুসকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। ১০টা নাগাদ আমরা যেন তৈরি হয়ে থাকি। ভাবলাম, সম্ভবত দু-এক রাত বাইরে কাটাতে হবে, তাই মাত্র গোটা দুই কাপড়-জামা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো কয়েকটা জিনিসপত্র ব্যাগে নিয়ে নিলাম। তখনো আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে বাসায় ফিরে আসব। আমার বড় শখের বইয়ের আলমারিটার দিকে চোখ পড়ল। ভাবলাম, দুয়েকটা বইও সঙ্গে নেব কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলাম না। কে জানত যে ওই বাসায় জীবনে আর কোনোদিন দ্বিতীয়বার পদার্পণ করব না! নির্দিষ্ট সময়ে জিপ এসে হাজির হলো। আমরা কজন, সারওয়ার ভাই ও তার স্ত্রীসহ জিপে গিয়ে বসলাম। আমাদের বলা হলো ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, সবাইকে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব হবে না। কাউসার হাউজের মাঝখানের বড় মিটিং রুমটায় অবস্থানরত মফস্বল এলাকা থেকে আসা আশ্রয়প্রার্থী জামায়াত ও ছাত্রসংঘের অনেক নেতা-কর্মী জানতেও পারলেন না যে তাদের ফেলে রেখে আমরা কজন চলে যাচ্ছি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। জিপের পেছনে মাল বহনের খোলা অংশটায় দাঁড়াল জিপ নিয়ে যারা এসেছে সেই দুজন যুবক— মোস্তফা শওকত ইমরান ও শেলি। তাদের পরনে সামরিক উর্দি আর হাতে রাইফেল। ইমরানকে অনেকটা ভর্ৎসনার সুরে বললাম, এসব করছ কী, এখনো এগুলো পরে আছ? সারা শহরে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাল রাতেই না তোমাদের এগুলো খুলে ফেলতে বলা হয়েছে? ইমরান কেঁদে ফেলল। বলল, যা হওয়ার হবে, আপনাদের নিরাপদে পৌঁছাতে হবে তো। রাস্তার দুপাশে তামাশা দেখার জন্য জমায়েত মানুষের উৎসুক নজরদারির মাঝ দিয়ে আমাদের জিপটা এসে হাজির হলো ধানমন্ডির একটা বাড়িতে। মুরাদ ভাইয়ের কোম্পানির একটা বাসভবন। ভেতরে মুরাদ ভাই নিজে এবং নিরাপত্তার জন্য ইতোমধ্যে নিয়ে আসা কয়েকজন জামায়াত নেতা অপেক্ষা করছেন। তাদের মধ্যে জনাব আবদুল খালেক সাহেবও ছিলেন। আমাদের নামিয়ে দিয়ে হেফাজতের দায়িত্ব পালনকারী দুই আত্মত্যাগী যুবক ইমরান ও শেলি বিদায় চাইল। কেঁদে কেঁদে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কোলাকুলি করলাম, তারাও কাঁদছে অবিরত। এবার আর দেরি না করে সাধারণ কাপড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য মিনতি করলাম ইমরানকে। চোখের জলে ভিজে সে বলল, সবাইকে নিরাপদ করে বের করার আগে তো বেরোতে পারব না। ক্রমেই আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল বাড়িটাতে। আশপাশের বাড়ি থেকে তাকাতে লাগল প্রতিবেশীরা। ঠিক করা হলো যে এত বেশি মানুষ এক বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়, তাই কিছু কিছু করে যেখানে যেখানে সম্ভব পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হলো। মুরাদ ভাইয়ের ড্রাইভার (নামটা এখন মনে নেই, সম্ভবত বশির হবে) আমরা কাউসার হাউজ থেকে আসা কজন এবং জনাব আবদুল খালেক সাহেবকে নিয়ে মুরাদ ভাইয়ের গাড়িতে করে রওয়ানা হলো গুলশানে তাদের কোম্পানির অপর একটা বাসভবনের দিকে। পথে ড্রাইভার ছেলেটা অঝোরে কাঁদতে লাগল এই বলে, সবাইকে তো নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার সাহেবের (মানে মুরাদ ভাইয়ের) কী হবে? লজ্জায়, শ্রদ্ধায় এই সামান্য শিক্ষিত যুবকটার আত্মত্যাগী মানবতাবোধে মাথা হেঁট হয়ে গেল। তার নিজের কী হবে সে কথা নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, সে পেরেশান তার সেই আত্মত্যাগের মূর্তিমান আদর্শ মনিবের নিরাপত্তার চিন্তায়, যিনি উর্দুভাষী হওয়া সত্ত্বেও নিজের নিরাপত্তার জন্য অস্থির না হয়ে পরম ধৈর্যসহকারে সাথিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য ছিলেন ব্যতিব্যস্ত। নিজের স্থান কোথায় হবে মুহূর্তের জন্যও তা চিন্তা করে পেরেশান হননি তিনি। নজরুলের কবিতার ওমর ফারুকের মতো মুরাদ ভাইও ‘বুকে করি সবে বেড়া করি পার আপনি রহিলে পিছে’র এক অসামান্য নমুনা পেশ করে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শুনেছি রব্বুল আলামিন স্বয়ং মুরাদ ভাইয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন সম্পূর্ণ এক অকল্পনীয় স্থানে। মুরাদ ভাইয়ের কোম্পানিতে চাকরি করতো আওয়ামী লীগ নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের ছেলে মাহবুব আনাম। খুররম মুরাদের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম মানবতাবাদের কারণে সে তার একান্ত ভক্তে পরিণত হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের মতো সে নিজেও মুরাদ ভাইয়ের নিরাপত্তার জন্য বিচলিত হয়ে উঠল এবং একরকম জোর করেই তাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে তুলল। অবশ্য উদারপ্রাণ মুরাদ ভাই নিজের মেজবানদের কোনোরকম অসুবিধায় না ফেলার জন্য তাদের মেহমানদারি বেশি দিন গ্রহণ করেননি। বরং নিজেই উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় সেনা কমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে চলে গিয়েছিলেন। গুলশানের যে বাড়িটায় আমাদের নিয়ে তোলা হলো, সেটা প্রায় এক বিঘা জমির ওপর বাগানসহ একটা মস্ত বড় দোতলা মেনশন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কোম্পানির গেস্ট হাউজ হিসেবে সমস্ত আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো যেন শুধু মেহমানের প্রতীক্ষায়। আমাদের কজনের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড় বাড়ি। গোলাম সারওয়ার ভাই ও তার স্ত্রী ওপরের তলায় জায়গা করে নিলেন, আমরা কজন নিচের রুমগুলোতে আবাস গাড়লাম। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো, কিন্তু নতুন দেশের নতুন রাজধানীতে তখনো নেমে এলো না প্রশান্তি। মুহুর্মুহু বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হতে লাগল সারা শহর। রাতে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু খুব একটা সফল হতে পারলাম না। সকালবেলা উঠে সাদামাটা নাশতার পর সবাই মিলে চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম কী করা যায় তা নিয়ে। তাছাড়া ফেলে আসা বন্ধু-সাথিদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমি অন্তত ভাবছিলাম যে দু-একদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হলে আমি অফিসে যেতে শুরু করব। বিশেষ করে প্রথম দিন তো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অন্যরা আমার সঙ্গে একমত হলেন না। তাদের বক্তব্য ছিল, বর্তমান অরাজকতার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ কী ছিল তা কেউ খতিয়ে দেখবে না। সুতরাং পত্রিকায় ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত বেশ কিছুদিনের জন্য হলেও স্থগিত রাখতে হবে।

প্রথমেই সারওয়ার সাহেবের পরামর্শমতো নিজেদের হুলিয়া বদলের কঠিন পদক্ষেপ নিতে হলো। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সবাই কোরবানি দিলাম আমাদের এতকালের যত্নে লালিত স্বপ্নগুলো। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুঃখপূর্ণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, যেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিতজনের সামনাসামনি হলাম। এদিকে আশ্রয়প্রার্থী আমরা সবাই হলেও সারওয়ার ভাই মোটামুটি বাড়ির মালিকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ক্রমেই তিনি বাড়িটাতে লোকসংখ্যা কমাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আকারে-ইঙ্গিতে হলেও এই মত প্রকাশ করলেন যে বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যরা ছাড়া বেশি লোক থাকলে আশপাশের লোকের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। বেচারা ইউনুস ভাই ও ইসকান্দারকে তিনি একরকম প্রকাশ্যেই অনুরোধ করলেন পুরান ঢাকায় কোনো জায়গা খুঁজে নিতে। রুহুল কুদ্দুস তার মামা শ্বশুর হিসেবে অনেকটা তার পরিবারের সদস্য। সুতরাং তিনিও যে থেকে যাবেন, সেটা পরিষ্কার হলো। জামায়াত নেতা জনাব আব্দুল খালেক সাহেবও রইলেন। আমাদের সবার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। আমাকে থাকা না-থাকার ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলা হলো না, তবু মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ১৮ ডিসেম্বর সকালে ইউনুস ভাই ও ইস্কান্দার বিদায় নিলেন। ওদের বিদায় দিয়ে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। কোনোরকম নামাজে, কোরআন তিলাওয়াতে ও অন্যান্য বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। ইতোমধ্যে খোঁজখবর নিয়ে আমার বড় ভাই (বড়দা) আফতাব উদ্দিন চৌধুরী আমাকে দেখতে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আমার বাসা থেকে আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জরুরি কাপড়-চোপড় ও দু-চারটা বইপত্র। বড়দা সেই সময় নিকটে মহাখালীতে পিইআই'র একটা বাসভবনে পরিবারসহ থাকছিলেন। তার সঙ্গে যত জলদি সম্ভব অন্যত্র স্থান পরিবর্তন করার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। আমরা একমত হলাম যে তার বাসায় থাকাটাও নিরাপদ হবে না। কারণ কেউ খুঁজতে এলে প্রথমে তার বাসায় আসাটাই স্বাভাবিক। সেজন্য বড়দা যত জলদি সম্ভব কাছাকাছি কোনো জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। প্রকাশ্যে পথেঘাটে পাকিস্তানের সমর্থক সন্দেহে অনেক লোকজনকে হত্যা করা হচ্ছে বলে চতুর্দিক থেকে নানা গুজব শোনা যাচ্ছিল। পরদিন সন্ধ্যার একটু আগে পায়ে হেঁটে এসে হাজির হলেন নিজামী ও শামসুল হক ভাই। দুজনের গায়ের কাপড় ধূলিধূসরিত হয়ে আছে, সারা চোখে-মুখে ক্লান্তি ও অসহায়ত্বের স্পষ্ট চিহ্ন। আরও উদ্বেগের ব্যাপার যে আমাদের মতো দাড়ি কামিয়ে তারা তখনো হুলিয়া বদল করতে পারেননি। তারা আরও জানালেন যে, এ পর্যন্ত থাকার জন্য তারা কোনো নিরাপদ জায়গা বের করতে পারেননি। উদ্যোগের স্বরে আমি আশ্বাস দিতে চাইলাম, এখানেই থেকে যান না কেন আমাদের সঙ্গে? সঙ্গে সঙ্গে সারওয়ার ভাই আপত্তি করে বললেন, না এখানে কেমন করে থাকবে! লোকসংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে ইস্কান্দার ও ইউনুসকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। এখন আবার সংখ্যা বাড়ালে আশপাশের প্রতিবেশীরা সন্দেহ করতে থাকবে। আগন্তুক দুজন যা বোঝার বুঝে নিলেন এবং এই ভরসন্ধ্যায় অসহায়ের মতো পা বাড়ালেন অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। মন তো খারাপ আগেই ছিল, এখন আরও খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, কপালে যাই থাকুক, আগামী দিন আমিও অন্যত্র চলে যাব। বড়দাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বললাম। পরদিন তিনি মহাখালীতেই তার বাসার কাছাকাছি একটা ব্যাচেলরস মেসে জায়গা করলেন। সারওয়ার ভাই অবশ্য মৃদু আপত্তি করলেন। বললেন, আমার যাওয়ার তো কোনো দরকার ছিল না, আমি সেখানেই থাকতে পারতাম।

ব্যাচেলরস মেসে সবাই ভিন্ন ভিন্ন অফিস-আদালতে চাকরি করত। অবশ্য মেসে পিআইএর অন্য কোনো কর্মচারী ছিল না, তাই আমার পরিচয় দেওয়া হলো পিআইএর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। করাচিতে কাজ করতাম, এখন দেশে ফিরে এসেছি। বড়দা আমাকে ইআইএর কিছু ইউনিফর্ম দিলেন, যেগুলো গায়ে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

দিয়ে সকাল ৭টায় কাজে যাওয়ার নামে বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু বিমানবন্দরে নয়, গিয়ে উঠতাম বড়দার বাসায়। অফিসের কয় ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে বেলা আড়াইটার দিকে মেসে ফিরে আসতাম।

মেসে দুপুরের খাবার সেরে বিশ্রাম নিতাম। বিকেলে আসরের নামাজের পর চা খেতে খেতে রেডিওর খবর শুনে এবং কেউ কোনো দৈনিক পত্রিকা নিয়ে এলে তাতে চোখ বোলাতাম। পত্রিকায় যা-ই থাকুক, লোকমুখে যেসব খবর মিলত, তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। রাজধানীর প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে, চলছে একরকমের অরাজক বর্বরতা। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তো ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, বেসামরিক প্রশাসন প্রায় ভেঙে পড়েছে আত্মসমর্পণের আগেই। ভারতীয় বাহিনী ঢাকা দখল করলেও এসব অরাজকতায় হস্তক্ষেপ না করে অনেকটা প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেই শোনা যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলা সরকার পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের পর আরও সপ্তাহখানেক পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি। রোজই খবর আসতে লাগল, সাধারণ মানুষকে রাজাকার সন্দেহ করে ব্যাপক অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হচ্ছে। পাইকারি হারে পাকিস্তানবাদী ও ইসলামপন্থি সন্দেহে ধরে এনে হত্যা করা হচ্ছে মানুষকে। খবর পেলাম, স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্য কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল সাধারণ বাঙালি যুবককে রাজাকার বলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করছে। সেই অনুষ্ঠানে তামাশা দেখতে এসেছে শত শত লোক, এমনকি দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের চোখের সামনেই ঘটেছে এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ। ফটো নিয়েছেন, এমনকি ভিডিও করেছেন অনেকে। আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ সাহেব তার *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* বইতে এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'ঢাকায় তখন আরও সপ্তাহখানেক কোনো সক্রিয় সরকার বা তাদের শান্তিরক্ষক বা আইনকানুন প্রণয়নকারী শাখা-প্রশাখা ছিল না। ক্ষণিকের জন্য মনে হইল কার্ল মার্কস এই অবস্থাকেই বোধহয় স্টেটলেস সোসাইটি বলিয়াছেন।'[২৩]

আবুল মনসুর আহমদ সাহেব আওয়ামী ঐতিহ্য বজায় রেখে সত্যের প্রতিফলন পুরোপুরি করতে চাননি অথবা করতে সাহস করেননি। আইনকানুন প্রয়োগকারী কোনো শাখা-প্রশাখা না থাকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'মনে হয় তার দরকারও ছিল না। চোর, ডাকাত, পকেটমার, দাঙ্গাকারীরা

---

২৩. তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩০।

www.nagorikpathagar.org
CS CamScanner

সবাই যেন কয় দিনের জন্য ফেরেশতা হয়ে গিয়াছিল এবং নিজেদের ওপর চুয়াল্লিশ ধারা জারি করিয়াছিল।' এবং 'হঠাৎ মনে পড়িল: ওভার অল কমান্ডে ত ভারতীয় বাহিনী আছে।' যে সত্য তিনি এবং তার মতো আওয়ামীরা পাশ কাটিয়ে গেছেন, তা হলো চোর-ডাকাত, পকেটমার, দাঙ্গাকারীরা তখন ফেরেশতা নয় বরং মুক্তিবাহিনীর লেবাস পরে চুরি-ডাকাতি ও পকেট মারার পরিবর্তে আরও লাভজনক, আরও ভয়ানক উন্মত্ত উল্লাসে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়েছিল। তারা বিহারি, পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি আমলা এবং যাকেই তাদের কাছে পাকিস্তানের সমর্থক বলে মনে হয়েছে, তাদের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে করছিল বেদম লুটপাট, বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে তাদের করছিল মারধর, পাইকারি লাঞ্ছনা, হাত-পা বেঁধে লটকিয়ে রেখে, হাত-পা কেটে, চোখ উপড়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অথবা গুলি করে হত্যা করছিল। ঢাকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেলে রাখা হয়েছিল লাঞ্ছিত-নিহত মানুষের লাশ।

দেশের ভেতরে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও এসব হৃদয়বিদারক পাশবিকতার কিছু কিছু খণ্ডচিত্র আন্তর্জাতিক সাংবাদিকেরা বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছিলেন। এসব সংবাদে দেখা গেছে কীভাবে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী শিল্পপতি, সরকারি-বেসরকারি আমলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং অন্যান্য অধ্যাপকের বাড়িতে হামলা দিয়ে তাদের ধরপাকড় করা হয়েছে। এ যেন নৃশংসতা ও হিংস্রতার প্রতিযোগিতায় বাঙালিরা পাকিস্তানি সেনাদের চাইতে কোনোক্রমেই পিছিয়ে না থাকে তার প্রাণপণ চেষ্টা। ১৭ ডিসেম্বর নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মৌলবি ফরিদ আহমদ সাহেবকে তার ঢাকার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাগ থানায়। ১৮ ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মৌলবি ফরিদ আহমদের গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশিত হয়। অবশ্য তারপর ফরিদ আহমদ সাহেবের কী হয়েছে, তার কোনো খবর ঢাকার কোনো পত্রিকায় কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি। দুই দিন পরে ১৮ ডিসেম্বর একদল সশস্ত্র যুবক লালবাগ থানা থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ইকবাল হলে (এখনকার সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) অন্তরীণ করে। সেখানে তার সঙ্গে আরও যারা বন্দি ছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাত্তার ম্যাচ ফ্যাক্টরির মালিক সাত্তার ফারাওদিয়া এবং আদমজী জুট মিলের তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল করিম কালা। সে সময় ঢাকায় অবস্থানরত বদরে মুনীর নামক এক সাংবাদিকের

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

রিপোর্ট[২৪] অনুযায়ী শেখ কামালের সরাসরি হস্তক্ষেপে চরম লাঞ্ছনা ভোগের পর উর্দুভাষী পুঁজিপতি দুজন তো জহুরুল হক হল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, কিন্তু ছাড়া পাননি মৌলবি ফরিদ আহমদ। আর নির্যাতন সেলের সাথি আব্দুল করিম কালার বর্ণনামতে এই প্রতিভাবান জাতীয় নেতাকে যে অমানুষিক নৃশংসতার শিকার হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আব্দুল করিম কালা বলেন, ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রেখে একে একে নির্দয়ভাবে হাত-পা কেটে চোখ উপড়ে ফেলে ধারালো ছুরি দিয়ে দেহের চামড়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাশবিক কায়দায় তাকে রাতের আঁধারে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষককে পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী বলে ধারণা করা হয়েছিল, তাদেরও একে একে অপহরণ করে নির্মম জুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন এই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর হাসান জামান, ইতিহাস বিভাগের ড. মোহর আলীসহ আরও অনেকে।

অল্পদিন পরেই শুধু আমার নিজের পত্রিকা *পূর্বদেশ*-এ ছাড়া ঢাকার অন্যান্য পত্রিকায় আমার ছবিসহ এক আজগুবি সংবাদ প্রকাশিত হলো যে আমি নাকি আলবদরের অপারেশন ইনচার্জ হিসেবে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান অধিনায়ক ছিলাম। দিন দুই পরে অবশ্য *পূর্বদেশ*-এও আমার ছবিসহ 'এই নরঘাতককে ধরতেই হবে' শিরোনামে প্রকাশিত হলো সংবাদ। এই দুই দিনের ব্যবধানে ভেতরের খবর অবশ্য পেয়েছি পরে। খবরটার পরিবেশক আমার নিজের সহকর্মী *পূর্বদেশ*-এর স্টাফ রিপোর্টার আতিকুর রহমান প্রথমে এই রিপোর্ট লিখে আমাদের পত্রিকার নিউজ এডিটর এহতেশাম হায়দার চৌধুরী সাহেবকে (এবং সে সময় সম্পাদক মাহবুবুল হক সাহেবের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) প্রকাশ করার জন্য চাপ দেন। কিন্তু প্রথম দিন হায়দার ভাই এই সংবাদের সত্যতা মানতে অস্বীকার করে এটা ছাপেননি। ফলে আতিকুর রহমান অন্যান্য পত্রিকায় খবরটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। দিন দুই পরে সশস্ত্র একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে আতিকুর রহমান হায়দার ভাইকে খবরটি প্রকাশ করার জন্য বাধ্য করেন। মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যায় রাতের খাবারের টেবিলে মেসের একজন সদস্য *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর দিনের কপিটা এনে সবার সামনে পড়তে শুরু করেন। ছবিটা দেখিয়ে আমাকে এই প্রশ্ন করেন, দেখুন তো, কী সুন্দর

---

২৪. *দৈনিক জাসারত*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮০।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চেহারা, এ ধরনের যুবক কেমন করে এ ধরনের কাজ করতে পারে? ভাবলাম, লোকটা আমাকে চিনতে পেরেই সরাসরি এমন প্রশ্ন করল কিনা। কিন্তু তার পরবর্তী ব্যবহারে অবশ্য বোঝা গেল যে, আমাকে শনাক্ত না করেই ভদ্রলোক কথাটা বলেছেন। তবু এটা অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই প্রকাশনার পর ঢাকায় অবস্থান করাটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আত্মবিশ্বাস যাই থাক না কেন, বড়দা এবং অন্য মুরুব্বিরা এই অরাজকতার মধ্যে সাহস দেখিয়ে বেরিয়ে পড়তে আমাকে দুহাতে মানা করছিলেন। ইতোমধ্যে খবর পেলাম, আমার বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের ঘরে ঘরেও আমাকে তালাশ করে ফেরা হচ্ছে। দুই দিন তো এমনও গেছে, যখন নিকটাত্মীয়দের ঘরে থাকা অবস্থায় সন্ধানকারীরা সেসব বাড়িতেও আমাকে খুঁজতে এসেছিল। একদিন তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের স্টাফ কোয়ার্টারে আমার জেঠাতো বোন মাহফুজা আপার বাসায় চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ একদল যুবক এসে দরজায় টোকা দিল। তারা আমাকে খুঁজছে। সহজেই বোঝা গেল যে সন্ধানকারীদের মধ্যে আমাদের কোনো আত্মীয় বা এলাকার মানুষ নিশ্চয়ই ছিল, না হলে মাহফুজা আপার বাসার খবর জানা সম্ভব ছিল না। অবশ্য আমার আত্মীয়দের উপস্থিত বুদ্ধির কারণে সেদিনও তাদের বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। অন্য একদিন সকালবেলা অফিসে যাওয়ার নাম করে বড়দার বাসায় গিয়ে উঠেছি। একটু পরেই এক জিপ সশস্ত্র যুবক বাড়িটার সামনে এসে থামল। ঘরে আমি, ভাবি এবং আমার ছোট দুটো ভাতিজা-ভাতিজি ছাড়া আর কেউ নেই। বড়দার দোতলার ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে জিপটার দিকে তাকিয়ে ভাবি সাহেবা প্রমাদ গুনলেন। যুবক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদেরই পরিচিত এক চ্যাংড়া শাহরিয়ার কবির। ভাবি কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, এখন কী করা যায়? ওদের হাত থেকে তোমাকে তো কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না। বললাম, আল্লাহ মালিক, আপনি বসুন আমি নিজেই দরজা খুলে তাদের সঙ্গে দেখা করছি। দরকার হলে তাদের সঙ্গে চলে যাব। একটু পরেই ওপরে উঠে এসে তারা বাসার দরজায় নক করল। কিন্তু ভাবি সংকট মুহূর্তে বাঙালি নারীর ঐতিহ্যবাহী সাহসিকতার আরও এক নমুনা পেশ করলেন, আমাকে কোনোমতেই দরজা খুলতে দিলেন না। আমাকে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ভেতরের কামরায় ঠেলে দিয়ে নিজে গিয়ে সামনের দরজা খুললেন। শাহরিয়ার কবির বলল, তারা ঘরে ঢুকতে চায় আমাকে খোঁজার জন্য। সম্পূর্ণ নির্ভীক স্বরে ভাবি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, তা কেমন করে হবে? ঘরে আমি একা মেয়ে মানুষ, তোমাদের এখন ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না। বেলা

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আড়াইটার দিকে সাহেব কাজ থেকে ফিরে এলে তখন তোমরা আসতে পারো। শাহরিয়ার কবির অনেক ন্যাকামি করে ভাবিকে বলল, আপনি তো আমাকে চেনেন, আমি আপনাদের আত্মীয়, আমার হাতে তাকে দিয়ে দিলে আমি অন্তত তাকে জানে বাঁচাতে পারব। অন্যরা যদি তাকে হাতে পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই খুন করবে। কিন্তু ভাবি কোনোমতেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বললেন, তোমাদের তো বললামই সে এখানে নেই এবং এ সময় আমি তোমাদের ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না। বিকালবেলা আসো, তখন ঘরে এসে দেখতে পারবে। তারা অনেক চেঁচামেচি করল। বলল, ঠিক আছে, আমরা গেটেই বসে আছি। আমরা জানি সে ঘরে আছে। কোনোমতেই তাকে ঘর থেকে যেতে দেওয়া হবে না। তারপর ঘণ্টাখানেক তাদের জিপটা বাড়িটার গেটের কাছেই অবস্থান করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেল। একটু পরে আমি বড়দার বাসা থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে আমার মেসের দিকে রওন হলাম। আবাসিক কম্পাউন্ডের গেট থেকে বড় রাস্তায় পা দিতেই দেখি উল্টো দিক থেকে একজন আরোহী মোটরসাইকেলে করে আসছেন। লম্বা সুঠাম কালো গ্লাস পরা সেই আরোহীকে চিনতে মোটেই কষ্ট হলো না। তিনি ছিলেন *পূর্বদেশ* পত্রিকায় আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার আব্দুর রকিব ভাই। একবার ভাবছিলাম তাকে ডাক দিয়ে কথা বলি। কাজে ফিরে যাব কি না, সেই পরামর্শ করি তার সঙ্গে। কিন্তু ডাক দেওয়ার আগেই তিনি একদম আমার সামনে দিয়েই মোটরসাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি আমাকে সামনাসামনি দেখেছেন এবং সম্ভবত চিনতেও পেরেছেন। হয়তো না চেনার ভান করেই চলে যাওয়া সংগত মনে করেছেন।

এরপর বড়দা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আমার মহাপ্রস্থানের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুরান ঢাকায় আমাদের এক বন্ধু হান্নানরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, কলকাতার আদি অধিবাসী। তাদের পরিবারের অন্য আত্মীয়রা এখনো কলকাতায় রয়ে গেছেন। সে বড়দার কাছে প্রস্তাব করল আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে। বলল, সে তার মামাকে চিঠি লিখে আমার হাতে দেবে এবং আমাকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য নুরুল আমিন নামে তার এক বন্ধুকেও সঙ্গে দেবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল, যাব কী করে? কোনো পাসপোর্ট অথবা কোনো রকমের ভ্রমণ দলিল তো আমার নেই। অবশ্য সবাই আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজনই হবে না। বিজয়ের এই উৎফুল্ল আনন্দের স্রোতে সীমান্ত রক্ষার বিধিনিষেধ প্রায় ভেসে চলে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই, তাই আওয়ামী লীগের সমর্থক আমার এক ছোট

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

চাচাতো বোনের স্বামী ৫২ নম্বর পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর থেকে আমার জন্য একটা ভ্রমণ দলিল বানিয়ে আনল। দলের অফিশিয়াল সিলমোহর দেওয়া এই দলিলে আমার নাম লেখা হলো শাহেদুর রহমান। বলা হলো, আমি সপরিবারে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিজয়ের সময় পরিবার ভারতে রেখে ঢাকায় এসেছি, এখন পরিজনদের ফিরিয়ে আনার জন্য আবার কলকাতায় যাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ, যেন আমাকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য দেওয়া হয়— ব্যস, এইটুকুই। এই কৃত্রিমতায় জড়িত হতে মনটা মোটেই সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। দলিলটা অবশ্য সঙ্গেই ছিল, কিন্তু সারা পথে কোথাও এর প্রয়োজন পড়েনি।

তারপর এলো যাত্রা শুরুর দিন ৩০ ডিসেম্বর। সকালবেলা হান্নানের বন্ধু নুরুল আমিন এসে হাজির হলো, ঘরের লোকেরা আগেই প্রয়োজনীয় দু-চারটা জিনিস দিয়ে আমার জন্য একটা ছোট্ট সফরের ব্যাগ তৈরি করে রেখেছিলেন। একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আমরা দুজন রওনা হলাম আরিচা অভিমুখে। পথে পথে নজরে পড়ল ভারতীয় সৈন্যদের ছোট-বড় গ্রুপ, কোথাও ব্যস্তসমস্ত মুক্তিবাহিনীর জওয়ানদের গমনাগমন। মিরপুরের শেষ প্রান্ত পার হতে হতে মনটা খারাপ হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল সারা হৃদয়। মনে পড়ে গেল মক্কা শরিফ থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় শহর থেকে বেরিয়ে নিজের উটটায় চড়ে বসার আগে মহানবি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)ও আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'হে প্রিয় নগরী, এখন সময় তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার, যদিও সারা দুনিয়ায় তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়ভূমি। তোমার অধিবাসীরা যদি আমাকে বাধ্য না করত, তাহলে কোনো দিনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'[২৫] ঠিক একইভাবে আমার বিক্ষত হৃদয় থেকেও পুঞ্জীভূত বেদনা যেন প্রকাশের ভাষা খুঁজল: বিদায় ঢাকা, বিদায় আমার প্রিয় নগরী, যার পথে পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আমার অগুনতি পদচিহ্ন। সম্পূর্ণ বিনা কারণে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে অন্যায়ভাবে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে যেতে। জানি না কখন আবার ফিরে আসব তোমার বুকে, জানি না আমার রেখে যাওয়া পদচিহ্নগুলোর কোনো প্রতিধ্বনি কোনোদিন অনুরণিত হবে কিনা, তোমার বাতাসে। বিদায়।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পথঘাট কুশমাস্তীর্ণ ছিল না, বরং ছিল নানা প্রতিবন্ধকতায় ঘেরা। পথে পথে থেমে থেমে এগোতে হচ্ছিল একটু একটু করে। সংগত

---

২৫. সুনান তিরমিযি : ৩৯২৬।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

কারণেই দুই ঘণ্টার রাস্তায় সময় লেগে গেল চার ঘণ্টার মতো। বেবিট্যাক্সিটা আরিচায় এসে পৌঁছাতেই দেখলাম সামনে মূর্তিমান বিপদ। একটা জিপে একদল ইউনিফর্ম পরা চ্যাংড়া যুবক বসে আছে— মুক্তিবাহিনী হবে নিশ্চয়ই। আমরা থামতেই জিপ থেকে নেমে এসে তারা লেগে গেল আমাদের তল্লাশিতে। পরিচয় জানতে চাইল— কোথা থেকে আসছি, যাব কোথায়, তার বিবরণ নিয়ে হাজারো জিজ্ঞাসা। আমাদের পক্ষ থেকে নুরুল আমিনই বেশ সফলতার সঙ্গে তাদের প্রশ্নের জবাব দিল। কিন্তু আশ্চর্য হলাম দেখে যে তদন্তকারী দলের সর্দার ছেলেটা আমাদের আস্তাবলের অন্য পত্রিকা *চিত্রালী*তে কাজ করত, আমি তাকে চিনি এবং সেও আমাকে চেনে। নামটা বোধহয় ছিল জমিল, মিরপুরের এক উর্দুভাষী পরিবারের ছেলে, কিন্তু ভালো বাংলা জানত এবং সর্বক্ষণ বকবক করতে পছন্দ করত। সে কেমন করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার হয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে এ যাত্রা আর বাঁচা যাবে না, নিঃসন্দেহে সে আমাকে শনাক্ত করতে পারবে এবং ধরে ফেলবে। সে আমার ঠিক সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই নুরুল আমিনের সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু আমাকে মোটেই চিনতে পারল না। একটু পরে তারা তাদের জিপসমেত বিদায় হলো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নুরুল আমিন খবর নিয়ে জানাল যে ফেরি ছাড়তে আরও এক ঘণ্টা বাকি আছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল, সুতরাং রাস্তার পাশের একটা মুসাফিরদের খাবার হোটেলে (রেস্তোরাঁয়) গিয়ে আমরা খেতে বসে গেলাম। সাদামাটা মাছ-ভাত আর সবজি, কিন্তু এই দারুণ ক্ষুধার মুহূর্তে অমৃতের মতো গিললাম। খাবারের বাঁধা দামটা এরা আগেই আদায় করে নেয়, তারপর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই চেঁচাতে শুরু করে— ফেরি ছেড়ে দিলো, ফেরি ছেড়ে দিলো বলে। তাই দ্বিতীয়বার নেওয়ার সুযোগ হয় না, খদ্দেররা তড়িঘড়ি ছুটতে শুরু করে ফেরিঘাটের দিকে। আমাদের বেলায়ও তা-ই হলো। ফেরিতে এসে জায়গা করে বসে পড়লাম। পথে পথে অন্যান্য আরোহী কে কোথায় কী দেখে এসেছে তার বর্ণনা দিচ্ছিল। তাদের আলোচনায় যেমন ছিল মুক্তির আনন্দের আপাত উচ্ছ্বাস, তেমনি ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাপা সন্দেহ-শঙ্কা। এক কি দেড় ঘণ্টা পরে নগরবাড়ী পৌঁছে রাজশাহীর জন্য বাস নিলাম। রাজশাহী পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ৮টা বেজে গেল। হান্নানের আত্মীয় এক উকিল সাহেবের বাসায় আমাদের রাত কাটাবার আয়োজন করা ছিল। অত্যন্ত সহৃদয় লোক তারা, দুহাত মেলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করলেন। রাতে ঘুমাবার আগে নুরুল আমিনের কাছে জানতে চাইলাম আমাদের সামনের পথ চলার বিবরণ। কোথা থেকে কোন দিক

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

হয় কোথায় যাব। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় শোনা নবাব সিরাজদৌলা নাটকের একটা ডায়ালগ। মনে মনে হাসলাম, পরাজিত সিরাজ তার বিশ্বস্ত সহকারী গোলাম হোসেনকে জিজ্ঞেস করছেন, পালিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? গোলাম হোসেন জানাল-পাটনায়। তারপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি পরাজিত নবাব সিরাজদৌলা জিজ্ঞেস করলেন: 'গোলাম হোসেন, পাটনা যেতে কতদিন লাগে?' নুরুল আমিন জানাল, আমাদের যাত্রাপথও ছুঁয়ে যাবে সিরাজের রাজধানী মুর্শিদাবাদ হয়ে। তারপর ট্রেনযোগে কলকাতায়।

পরদিন সকাল সকাল নাশতা সেরে আমাদের সহৃদয় মেজবানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম পদ্মাতীরের দিকে। নদীতীরে এসে রিকশাটা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম নদীর আধা শুকনো উঁচু-নিচু বালুচরগুলোর মধ্য দিয়ে। শীতকাল, তাই নদীর শুকনো-শীর্ণ অবশিষ্ট জলধারা শুধু মাঝখানটায় খানিকটা স্থান করে নিয়েছে। দীর্ঘ বালুচর দিয়ে পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেক দূর পায়ে হাঁটতে হলো। তারপর পানির কিনারায় এসে একটা নৌকা নিয়ে রওনা হলাম পদ্মার অন্য কূলের দিকে। নদীর অপর তীরটাই বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তরেখা। এখান থেকে কিছুদূর পায়ে হেঁটে ভারতের জলঙ্গিতে পৌঁছাব। তারপর স্থানীয় বাসে করে মুর্শিদাবাদ হয়ে যেতে হবে বহরমপুর, কলকাতাগামী ট্রেন নেওয়ার জন্য।

আমার সারা অন্তর-মনে তখন এক দারুণ আদ্র-অসহায় অনুভূতি উপচে পড়ছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে যাচ্ছি আমার একান্ত প্রিয় মাতৃভূমি। যে ভূমি আমাকে আপন করে নিয়েছিল জীবনের বিগত পঁচিশটা বছর। নতুন গজানো গাছের চারার মতো যেখানে মেলেছিলাম জীবনের প্রথম দুটো পাতা, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছি, শাখা মেলে পত্র-পল্লবে গজিয়ে তুলেছি জীবনের এই মহিরুহ। এ দেশ ছেড়ে যেতে মনটা যে কাঁদবে, তা তো অতি স্বাভাবিক। ইসলামের যে শিক্ষা এতদিন পেয়ে এসেছি, তার আলোকে এই নিরাশার অমানিশার মধ্যেও আশার আলো খোঁজার প্রেরণা জোগাল। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেল উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুজন কবির কয়েকটা কবিতার ছত্র।

ইকবালের ভাষায়:

> কনাআত ন কর আলমে রঙ্গও বু পর
> সিতারোঁ সে আগে জাহাঁ আওর ভি হ্যায়।

'জড়িয়ে পড়ো না তুমি
ক্ষুদ্র এ ধরিত্রীর বর্ণ ও গন্ধের ফাঁসে,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

গ্রহ তারকার শেষে
অসংখ্য জগৎ আরও ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে।'

আর রবীন্দ্রনাথের:
'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।'

সেই অসংখ্য-জগৎ আর বিশ্ব-নিখিল খুঁজে নেওয়ার জন্য মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালাম এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

পরিশিষ্ট

মোহাম্মদ কাবিল চৌধুরীর ওয়াক্‌ফনামা
১৮৭৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর
মোতাবেক: ৯ আশ্বিন ১২৮৩ বাংলা সাল
(অনুমোদিত কপি)

আমি, মোহাম্মদ কাবিল চৌধুরী, পিতা মরহুম মোহাম্মদ তকী ভূঞা, ফেনী থানার ভুলুয়া পরগনার চান্দপুর গ্রামের অধিবাসী নিম্নোক্ত ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করলাম।

এই যে এটা সর্বজনবিদিত চিরাচরিত নিয়ম যে, এই পৃথিবীর সমুদ্রে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাকে একদিন অবশ্যই মরতে হয়। আল্লাহ ছাড়া মরণশীল কোনো মানুষেরই কোনো জ্ঞান নাই সেই মৃত্যু কখন আসবে। বিশেষত যখন আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং জানি যে মৃত্যু ধীরে ধীরে নিকটে উপস্থিত হচ্ছে, তাই নিচের পরিচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত বিবরণমতো আল্লাহর ওয়াস্তে এই ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করে দিলাম। আর রচনা করে দিলাম এই ওয়াক্‌ফ পরিচালনার আইন ও নীতিমালা, এতে শামিল করে দিলাম আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্ব-অর্জিত যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর, মুফাস্বিল প্রজাদের দেয় খাজনা ও বকেয়া। মহাজনি ব্যবসা বাবদ প্রাপ্য যাবতীয় অর্থ, বন্ড ও ডিক্রি ইত্যাদি। এ সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি অবস্থিত রয়েছে নোয়াখালী জেলার ফেনী, সুধারাম, বামনী ও কোমলগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলার লাকসাম থানা ও সাব-রেজিস্ট্রিতে। এসব আমার নিজস্ব মালিকানার অথবা অন্যদের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় রয়েছে। এই ওয়াক্‌ফ এই উদ্দেশ্যে করলাম যে এর আয় দিয়ে আমার বাড়ির দরওয়াজায় নবনির্মিত পবিত্র পাকা মসজিদ ও নতুন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমার বাড়িতে

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আগত সকল আগন্তুক, পথিক, পরবাসীদের মেহমানদারি করা হবে। এ থেকে সাদুল্লাপুর গ্রামে আমার পরলোকগত পির ও মুর্শিদ হজরত মাওলানা ইমামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির দরজায় আমি যে পাকা মসজিদ তৈরি করে তার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমার জমিদারি এলাকার মধ্যে যত বিচ্ছিন্ন মসজিদ রয়েছে তার সবগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে, এসব এলাকায় ফকির-মিসকিনদের খাওয়ানোর জন্য এবং আমার কন্যাসন্তানদের কেউ যদি তাদের জীবনের কোনো পর্যায়ে অসুবিধায় পড়ে, তবে সেই সব অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে এসব আমার ও আমার পরিবারের বর্তমান ও অনাগত সদস্যদের রুহানি উন্নতি ও আখেরাতে নাজাত ও মুক্তির উছিলা ও মাধ্যম হয়। মহামহিম আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই ওয়াক্ফের নিবেদনটুকু কবুল ও মঞ্জুর করে অনন্তকাল পর্যন্ত এটা এই দলিলে বিধিবদ্ধ যাবতীয় কাজে ব্যবহার সুনিশ্চিত করুন।

১. যেহেতু আমি আমার সমুদয় সম্পত্তির, যা দিয়ে এই ওয়াক্ফ গঠন করা হলো, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইতোমধ্যেই আমার দুই পুত্র[২৬] মুনশী মুনাওয়ার আলী চৌধুরী ও মুনশী মুজাফফর আলী চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি। সেই হেতু আমি আমার কথিত দুই পুত্র মুনশী মুনাওয়ার আলী চৌধুরী ও মুনশী মুজাফফর আলী চৌধুরীকে নিম্নলিখিত শর্তে, এই ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে আইনানুযায়ী এই ওয়াক্ফের সমস্ত সম্পত্তি তাদের হাওলা করে দিলাম।

২. মুতাওয়াল্লিরা আমার বাড়ির পাকা করা মসজিদের জন্য একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করবে, যে কোরআনে পাক সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতে ও শিক্ষা দিতে পারবে।

মুসল্লিদের যথাযথভাবে নামাজের জন্য ডাকতে পারবে, মসজিদ গৃহটি নিয়মিত ঝাড়ামোছার দায়িত্ব নেবে। মুতাওয়াল্লিরা তার ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত ভাতা-মাসোহারা দেবে। মসজিদে চেরাগ (বাতি) জ্বালাবার তেল বাদাম তেল। কাঠের বাতিদানের ওপর পিতলের খোলা প্রদীপে (চেরাগ) কাপড়ের পাকানো সলতে দিয়ে চেরাগ আমাদের ছেলেবেলা পর্যন্ত এই মসজিদে জ্বলতে থাকে। তেল কিনতে ও নামাজের চাটাই কিনতে এবং যদি কখনো মসজিদ গৃহে কোনো মেরামতের প্রয়োজন হয়, তা করতে সমস্ত খরচাদি বহন করবে।

৩. পবিত্র রমজান মাসে মসজিদের সমস্ত মুসল্লির জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করবে।

---

২৬. মুনশী ও মৌলবি সে সময়ে সম্মানার্থে নামের আগে ব্যবহার হতো, ধর্মীয় পদবি হিসাবে নয়।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

৪. মুতাওয়াল্লিরা মসজিদের এমন একজন মৌলবি নিযুক্ত করবে যিনি আরবি, ফারসি, ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন), ফিকাহ-উসুল ও যুক্তিবিদ্যা-মানতেক পড়তে এবং আমার বাড়ির দরজায় (বর্তমানে) নির্মীয়মাণ মাদরাসায় পড়াবার যোগ্যতা-দক্ষতা রাখবেন। তিনি আমার বাড়ির মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুম্মা, ঈদ, বকরা ঈদের নামাজও পড়াবার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি কমপক্ষে সাতটি বিদ্যাশিক্ষায় আগ্রহী ছেলেকে এই মাদরাসায় নিয়মিত শিক্ষা দিবেন। এ কাজের জন্য মুতাওয়াল্লিরা তাকে মাসে বার (১২) টাকা মাসোহারা দিবে। এ ছাড়া ছাত্রদের ভরণ-পোষণের জন্যও মাসিক জনপ্রতি দুই টাকা হারে সাতজনের জন্য মোট চৌদ্দ (১৪) টাকা ভাতা দেবে।

৫. একইভাবে মুতাওয়াল্লিরা সাদুল্লাপুরে নির্মিত মসজিদটির জন্যও নিয়োগ করবে ইমাম ও মুয়াজ্জিন, যাতে মসজিদের সকল দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দেওয়া হয়— লোকদের নামাজের দিকে ডাকা, মসজিদে চেরাগ জ্বালাবার জন্য তেল সরবরাহ করাও নিয়মিত ধুলোবালি ঝাড়া মোছা করা হয়।

৬. মুতাওয়াল্লিরা নিচে বর্ণিত সকল দায়িত্ব পালন ছাড়াও এই মসজিদে পবিত্র রমজান মাসে মুসল্লিদের ইফতারের ব্যবস্থা করবে।

৭. আমার জমিদারির চৌহদ্দির ভেতর যেসব বিরান মসজিদ বর্তমানে রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে বিরান হয়, সেসবের পুনর্নির্মাণের দায়িত্বও মুতাওয়াল্লিরা পালন করবে।

৮. মুতাওয়াল্লিরা প্রতি বছর লোকদের বদলা-হজ করতে পাঠাবে এবং হাজিদের এই পরিমাণ অর্থ দেবে, যেন হজের খরচপত্র ছাড়া কাবা শরিফ ও মক্কা-মদীনায় তারা দান-খয়রাত করতে পারেন, যেন আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের রুহের ওপর সওয়াব পৌঁছায়।

৯. যেসব মুসাফির-পথচারী, পির-ফকির, বিদেশি আগন্তুক, আত্মীয়স্বজন বা রায়ত-প্রজা আমার বাড়িতে আসেন, মুতাওয়াল্লিরা তাদের সকলের থাকা-খাওয়া ও উপযুক্ত মেহমানদারির ব্যবস্থা করবে।

১০. মুতাওয়াল্লিরা আমার বাড়ির দরজায় কাঁচা মাদরাসা ঘরটি (পাকা করা দালানঘর নয়) নির্মাণ সম্পূর্ণ করবে এবং ওয়াক্ফর আয় থেকে সকল সময়ে উপযুক্ত আলেম শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করার এবং সাতজন ছাত্রের খরচাদি (ওপরে বর্ণিত নিয়মে) প্রদান, মাদরাসা ঘরটির প্রয়োজনমতো মেরামত ও উন্নয়ন এবং যদি কখনো পড়ে বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব পালন করবে।

১১. আমার কন্যাসন্তানদের কোন একজন অসচ্ছলতায় পড়লে মুতাওয়াল্লিরা আজীবন তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

১২. যদি কখনো মামলা-মোকদ্দমা করার বা আইন-বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, তাহলে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করে মুতাওয়াল্লিরা এ কাজে অগ্রসর হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে দুজনকেই একমত হতে হবে। যদি কোনো কারণে একমত হওয়া না যায়, তাহলে তারা তাদের দুজনের সঙ্গে আরও তিনজন গণ্যমান্য লোককে যারা শরা-শরিয়ত ও সমাজের নিয়ম-প্রথা সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান রাখেন, তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেবে। এই কমিটিতে সংখ্যাধিক্যের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। মোশারেফের নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় খরচপত্র ও মামলা-মোকদ্দমা যা বিভিন্ন সময়ে দরকার হবে, সে বিষয়ে মুতাওয়াল্লিদের অনুমোদন সাপেক্ষে এই কাজের জন্য নিযুক্ত প্রধান কর্মচারীরা বিল তৈরি করে মূল অঙ্ক লিখে রাখবে। এ কার্য নির্বাহ করতে গিয়ে যদি কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে পরিচালনার জন্য উভয় মুতাওয়াল্লির যে কোনো একজন ১০০ টাকা পর্যন্ত এবং প্রধান কর্মচারী ২৫ টাকা পর্যন্ত হাওলাত হিসাবে অগ্রিম নিতে পারবে। পরে ওপরে বর্ণিত নিয়মে যথাযথ অনুমোদন খরচ বাদে বাকি টাকা হাওলাত পরিশোধ করবে। খরচ অগ্রিম অঙ্ক থেকে বেশি হলে যথারীতি বিল তৈরি করে তারা বাকি টাকা নিজেরা খরচ করে বাকি টাকার জন্য আলাদা বিল তৈরি করে ওয়াক্‌ফ স্টেট থেকে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু এভাবে খরচ করা হাওলাত ও থাকা খরচ বাবদ নেওয়া কোনো অঙ্ক যদি অযথা বা অন্যায়ভাবে খরচ করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তা নিজে ফেরত দিতে অসমর্থ হয়, তাহলে যে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বা মুতাওয়াল্লির অনুমোদনে এ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার নিকট থেকে তা আদায় করা হবে। কোনো ব্যক্তিকে পাট্টা ও চিট্টা দিতে হলে তা উভয় মুতাওয়াল্লি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। শুধু একজন মুতাওয়াল্লি স্বাক্ষর করলে সে দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ওয়াকফের সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং সময়মতো উভয় মুতাওয়াল্লি একসঙ্গে উপস্থিত না থাকলে সমস্ত করাদি বর্ণনা করে একজনের দস্তখতে দলিল প্রদান করা যাবে। তবে এভাবে প্রদত্ত দলিলের কারণটি যথারীতি বর্ণনা না করে হলে এবং এতে ওয়াক্‌ফ স্টেটের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে অনুপস্থিত মুতাওয়াল্লি এই দলিল বাতিল করতে পারবে।

মুতাওয়াল্লিরা মোশারিফদের খরচাদি, তাদের বকেয়া উসুলের খরচাদি, জমিদারি ও তালুকের খরচাদি, মোক্তারদের বেতন ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন এবং মামলা-মোকদ্দমার খরচপত্র আমার দেওয়া ব্যবসায়ের চিরস্থায়ী নিয়মানুসারে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সমুদয় আয় থেকে নির্বাহ করতে পারবে।

যদি কখনো আকস্মিক অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে সে বাবদ যে খরচ হয়, তা বাদ দিয়ে বাকি মুনাফার অঙ্ক থেকে মুতাওয়াল্লিরা তাদের নিজ নিজ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

মাসোহারা, আমার স্ত্রী ও কন্যাদের মাসোহারার অর্থ প্রতিবছর দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে। এ ছাড়া তারা নির্দিষ্ট সময়ে সকল ধর্মীয় ও খয়রাতি (দাতব্য) কাজের ওয়াক্‌ফনামায় বর্ণিত নিয়মানুসারে এবং শরিয়তের বিধান মোতাবেক পরিশোধ করতে থাকবে। তারা এই ওয়াক্‌ফনামার পরিপন্থি কোনো অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ অথবা কোনো জাল জুয়াচুরির আশ্রয় নেবে না। ওয়াক্‌ফনামার বিধান মোতাবেক যাবতীয় অঙ্ক পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত টাকা সংরক্ষিত তহবিলে দুই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে জমা রাখা হবে।

১৩. বার্ধক্য রোগব্যাধি অথবা ব্যবসা পরিচালনায় অক্ষমতার কারণে মুতাওয়াল্লিদের কোনো একজন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চাইলে যথারীতি সনদ জারি করে তার নিজের কোনো পুত্র অথবা নিজ পুত্রের অবর্তমানে আমার কন্যাদের পুত্রসন্তানদের মধ্যে যাকে যোগ্য, দ্বীনদার বিবেচনা করে, তাকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারবে। অবশ্য আল্লাহ তা'লার ইচ্ছায় যদি কোনো একজন মুতাওয়াল্লির আকস্মিক মৃত্যু আসে, তাহলে জীবিতজন ইতোপূর্বে বর্ণিত নিয়মে যোগ্য ও ধার্মিক একজনকে উক্ত পদে নিয়োগ করবেন। খোদা না করুন, যদি মুতাওয়াল্লিদের উভয়েই একসঙ্গে অথবা পরপর মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের পুত্র অথবা তাদের কন্যাদের পুত্র অথবা তাদের অধস্তন কোনো বংশধরদের মধ্য থেকে দ্বীনদার ও যোগ্য কাউকে উক্ত পদে নিয়োগ করে যাওয়ার সময় না পান, তাহলে এমতাবস্থায় যথাবিহিত উক্ত সন্তানদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হলে সরকারের কর্মচারীরা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের (সন্তানদের) যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ করতে পারবে। এইভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিরা শুধু 'সরবরাহকারী' (ম্যানেজার) হিসেবে মাসোহারা পাবেন। এই ক্ষেত্র ছাড়া এই ওয়াক্‌ফ স্টেটের ওপর আর কোনো সরকারি এক্তিয়ার (ক্ষমতা) থাকবে না।

১৪. ওপরের পরিচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, মাসোহারা ও খরচপত্র নির্বাহের পর বাদবাকি জমা অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা মামলার মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তির নামে কেনা সম্পত্তি এবং এই টাকা ব্যবহার করে পরিচালিত মহাজনি ব্যবসার যাবতীয় মুনাফা ওয়াক্‌ফ স্টেটে যোগ বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুনাফাও ওয়াক্‌ফই বটে।

১৫. এতদ্দ্বারা আরও ঘোষণা করা যাচ্ছে যে ভাতা ও মাসোহারার প্রাপকগণের নিজ নিজ মাসোহারা বিক্রি বা নিজেদের কর্জ ও দেনা শোধের জন্য তা লোন, ইজারা বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার থাকবে না। তারা নিজের ইচ্ছায় বা আদালতের হুকুমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেনা। কারণ ওয়াক্‌ফ স্টেট পরিচালনা ও তদারকের দায়িত্ব এবং এ থেকে এসব মাসোহারা তাদের দেওয়া হয় শুধু এই পৃথিবীতে জীবিত থাকা সময়ের জন্য।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

১৬. কোনো দুর্ঘটনা ও হাকিমের (কোর্টের) হুকুমে ওয়াক্ফ স্টেটের কোনো অংশ নষ্ট বা হাতছাড়া হলেও বাদবাকি অংশের ওপর মুতাওয়াল্লি ও ম্যানেজারদের পূর্ব অধিকার বজায় থাকবে।

১৭. আমার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত খোদ খাস্তা মহলগুলোর জমিজমার খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে যদি মুতাওয়াল্লিরা কোনোরূপ হাওয়ালা অথবা স্থায়ী বা অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করে এবং এতে তালুকদারি, হাওলাদারি অথবা তালুকের তথা ওয়াক্ফ স্টেটের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে মুতাওয়াল্লিদের এইরূপ বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

১৮. যেহেতু আমার পুত্র মুনশী মোহাম্মদ মুজাফফর আলী চৌধুরী বাবুপুর পরগনার চাকলা পূর্ব জোয়ারের নেওয়াজপুর মৌজার তালুক মিজান ভূঞা, ফয়েজ ভূঞা ও মোহাম্মদ কামিলের ১ আনা ২৯ গন্ডা তালুকটি নিজের টাকায় খরিদ করেছে, সুতরাং সে নিজে এই তালুকের মালিক। এ ছাড়া আমার পুত্র মুনশী মনোয়ার আলী চৌধুরী ও মুনশী মাজাফফর আলী চৌধুরী তাদের নিজস্ব টাকায় যে নিম্নোক্ত চারটি তালুক, যথা— যুগিদিয়া পরগনার চর হাজারি মৌজার আবাদকারীর (কাজেম ব্যাপারী নামেও পরিচিত) তালুক নম্বর ১২৯, সন্দ্বীপ পরগনার চাকলা বামনীর মুছাপুর মৌজার খালে আজিম রাজার তালুকের অন্তর্ভুক্ত হাওলা আবদুল আলী, যুগিদিয়া পরগনার চর দরবেশ মৌজার আবাদ রামধন দাসের ৬৮ নম্বর তালুক এবং ভুলুয়া পরগনার বাটোইয়া মৌজার রামহরিধরের তালুক, খরিদ করেছে তাও তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে। এই পাঁচটি তালুক সে কারণে আমি আমার ওয়াক্ফনামায় শামিল করলাম না। আমার অন্যান্য ওয়ারিশ এসব সম্পত্তিতে কোনো দাবি করতে পারবে না আর কখনো তা গ্রাহ্য হবে না।

১৯. এতদ্বারা আরও ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি আমার পুত্রদের পুত্রসন্তান দুইয়ের অধিক হয়, তবে তাদের থেকে দুজনকে আমার দুই পুত্রের ছেড়ে যাওয়া আসলে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা হবে। মুতাওয়াল্লিরা তাদের ক্ষমতা ও ইনসাফ ব্যবহার করে অবশিষ্ট পুত্রসন্তানদের জন্য একটা নিয়মিত মাসোহারা ঠিক করে দেবে। এ ধরনের মাসোহারা কম বা-বেশি হলো কিনা,তা নিয়ে কোনো ওজর-আপত্তি করা যাবে না। তারা কোনো চাকরি বা ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবনযাপন করবে। প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের কোনো একজনকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হবে অথবা যাকে নিয়োগ করা হবে, তার আয় ও সম্পত্তি ওয়াক্ফ স্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যে এভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হবে না, তাকে মুতাওয়াল্লি পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে না। বর্তমানে নিযুক্ত প্রথম দুজন মুতাওয়াল্লির নামে যেসব সম্পত্তি

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আমার টাকায় খরিদ করা হয়েছে এবং আমার স্ত্রী ও কন্যাদের বেনামিতে ও ভোগদখলের সব সম্পত্তি এই ওয়াক্‌ফনামায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২০. যখন কোনো একজন পুরুষ উত্তরাধিকারী না রেখে এবং কেবল স্ত্রী ও কন্যাসন্তান রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন যতদিন সেই স্ত্রী জীবিত থাকে, এই বাড়িতে বসবাস করে এবং পুনর্বিবাহ না করে, ততদিন পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ স্টেট থেকে তার যথাযোগ্য খোরপোশ ও খরচপত্র বহন করা মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব হবে। একইভাবে কন্যাসন্তানের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তারও একই রকম অধিকার থাকবে। পরিবারের কন্যাসন্তানদের বিবাহের জন্য ১০০ টাকা, পুত্রসন্তানদের বিবাহে ২৫০ টাকা, পুত্রসন্তানদের জন্মের সময় ২৫ টাকা, শিশুপুত্রের মৃত্যুতে ১০ টাকা, বালকপুত্রের মৃত্যুতে ২৫ টাকা প্রদান করা মুতাওয়াল্লিদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে ওয়াক্‌ফ স্টেটের সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের অনুপাতে প্রয়োজনমতো এসব ভাতা ও মাসোহারা কমাবার ক্ষমতা মুতাওয়াল্লিদের থাকবে এবং এ ব্যাপারে কোনো আপত্তির অধিকার কারও থাকবে না। কারও মাসোহারা বৃদ্ধি অবশ্য করা যাবে না।

২১. যদিও শরা (ইসলামি শরিয়ত) মোতাবেক নগদ ও অস্থাবর সম্পদ ওয়াক্‌ফবদ্ধ করার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে, তবু ওয়াক্‌ফ সৃষ্টির সময় মোশারেফ (ব্যয়)-এর হার নির্ধারিত করে দিলে এ ধরনের সম্পদও ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেহেতু এখন খরচপত্রের হার নির্ধারণ করে দেওয়ার পর এ ধরনের কাজে ব্যয় করার জন্য আমি এসব তহবিল ও মুতায়াল্লিদের হাতে সোপর্দ করে গেলাম। ওয়াক্‌ফ স্টেটের আয় ও সার্বিক পরিস্থিতির বিচার করে এই তহবিল নেক ও পুণ্য কাজে ব্যবহার এবং অযথা ও নিষ্ফল কাজে ব্যবহার না করার দায়িত্ব মুতাওয়াল্লিদের থাকবে। শুধু নেক ও কল্যাণময় কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই তহবিল পূর্বোক্ত দুজনের তদারকিতে ওয়াক্‌ফ স্টেটের পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে ব্যবহার করা যাবে।

২২. এ ছাড়া আমার তহবিল বাক্সে আমার নিজের হাতে রাখা অর্থ আমি মুতাওয়াল্লি দুজনের কাছে সোপর্দ করলাম। এই তহবিল থেকে তারা আমার দস্তখত করা এবং খাসে বদ্ধ করা তালিকা অনুযায়ী আমার রুহের মাগফিরাতের জন্য একজন লোককে হজে পাঠাবে, গরিব-মিসকিনের জন্য জিয়াফত দেবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করবে। একটা বড় দিঘি খনন করবে এবং আমার মরহুমা আম্মাজান তাইউব বিবি সাহেবানীর দিঘিটির সংস্কার সাধন করবে। অনুরূপভাবে মুতাওয়াল্লিদের হাতে আমি যথারীতি দস্তখত ও খাসবদ্ধ করে আর একটা তালিকা দিলাম। এই তালিকায় আমি আমার বাদবাকি বংশধর ও অন্যদের আমার যাবতীয় বকেয়া পাওনা, খাজনা,

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

ঋণীদের ফেরত দেওয়া টাকা ও অন্য সমস্ত পাওনা তহবিল উপহার হিসেবে দিয়ে গেলাম। এই তালিকায় আমার স্ত্রী ও অপরাপর বংশধরদের মাসোহারাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। মুতাওয়াল্লিরা এসব মাসোহারা দিতে বাধ্য থাকবে এবং স্বেচ্ছায় না দিলে আমার স্ত্রী ও বংশধররা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে। তবে আমার পাওনা উসুল করার অধিকার মুতাওয়াল্লিরা ছাড়া আমার অপর কোনো বংশধরের থাকবে না। যদি কোনো কিছু তারা উসুল করে, তবে তা ওয়াক্‌ফে শামিল করা হবে। অন্য কারও এর ওপর কোনো দাবি থাকবে না এবং করলেও গ্রাহ্য করা হবে না। আর আমি যতদিন বাঁচি, ততদিন ওয়াক্‌ফের আয় থেকে মুতাওয়াল্লিরা আমার খোরপোশ বহন করবে।

২৩. আমি এবং আমার পুত্র ও প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে যেসব মামলা-মোকদ্দমা শুরু করেছি, তা নিজেদের নামে পরিচালনা করে যাওয়ার ক্ষমতা মুতাওয়াল্লিদের দেওয়া হলো। তারা নতুন মামলাও প্রয়োজনমতো দায়ের করার ক্ষমতা রাখবে। আমার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুনাফা নিশ্চিত করা বা পুনর্দখল করার জন্য প্রথমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং সেই প্রচেষ্টা কার্যকর না হলে মোকদ্দমার সাহায্য তারা নেবে। তবে এ ধরনের পদক্ষেপ উভয়ে মিলে এবং উভয়ের দস্তখতে করতে হবে— একা একজনে নয়। একাকী মামলা দায়ের করলে তা অগ্রাহ্য হবে।

২৪. আমার নামে অথবা আমার পুত্র, প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্যক্তির বেনামিতে কেনা সব জমিজমার রেভিনিউ ও সিভিল কোর্টে মামলার সময় এগুলো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসেবে দেখাতে হবে। তারা হাল ও বকেয়া খাজনা ও মহাজনি ব্যবসার বন্ড-সুইট ও অন্য সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বকেয়া আদায়ের জন্য মোকদ্দমা, আপিল ও ডিক্রি জারি করার মামলা বা অন্যদের করা মামলার বিবাদী হিসেবে পরিচালনা করার অথবা সালিশ-মীমাংসার পূর্ণ ক্ষমতা রাখবে।

২৫. আমার স্ত্রীর[২৭] মৃত্যুর পর তার গর্ভজাত পুত্র মুনশী মুজাফফর আলী চৌধুরী আমার স্ত্রীর প্রাপ্য মাসোহারার হকদার হবে, কন্যারা পাবে না এবং দাবি করতে পারবে না। আমার কন্যা শ্রীমতী সাইফুন্নেছার মৃত্যুর পর তার ছেলে আমিন উল্লাহ মিয়া তার মাসোহারার হকদার হবে। আমিন উল্লাহর মৃত্যুর পর সাইফুন্নেছার কন্যারা তার মাসোহারার অর্ধেক পাবে। বাকি অর্ধাংশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটে শামিল করে আমার ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে ব্যবহার করা হবে। আমার অন্যান্য পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিশরা মিরাসের আইন অনুযায়ী যার যার অংশ পাবে এবং তা যথাযথ পরিশোধ করার দায়িত্ব মুতাওয়াল্লিদের

---

২৭. সম্ভবত দ্বিতীয় স্ত্রী আলীমা বিবি।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

থাকবে। এই মাসোহারা ছাড়া অন্য কোনো সম্পত্তি আমার পাওনা টাকাপয়সা তারা দাবি করতে পারবে না।

২৬. মুতাওয়াল্লিরা পারস্পরিক আলোচনা-পরামর্শের ভিত্তিতে মোকদ্দমা দায়ের, নকশা ইত্যাদি নথিপত্র ও আগের বছরগুলোর জমা-খরচের হিসাব ইত্যাদি আমার নিয়োগকৃত তহশিলদার ও গোমস্তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। কোনো কর্মচারী কর্তব্যে অবহেলা করার প্রমাণ পাওয়া গেলে মুতাওয়াল্লিরা তাকে বরখাস্ত করে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করে কাজ চালাবে। বছর শেষে মুতাওয়াল্লিরা জমা-ওয়াসিল-বাকির কাগজপত্র, রসিদ ও ব্যয়ের পরচা এবং সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তালিকা তৈরি করে সেরেস্তায় জমা রাখবে। আমি আমার সকল সম্পত্তির দলিললপত্র মুতাওয়াল্লিদের হাতে সোপর্দ করলাম। মুতাওয়াল্লিরা এসব এবং অন্য যেসমস্ত দলিল রেভিনিউ কোর্টে জমা করা হয়েছে তার দায়িত্ব নেবে এবং নিজেদের কাজে ও মোকদ্দমায় ব্যবহার করবে। তারা ওয়াক্‌ফের এসব দলিল পূর্বতন নাম পরিবর্তন করে কালেক্টরেট ও (ঊর্ধ্বতন) জমিদারি সেরেস্তায় এগুলো নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করবে। আমি নিজে কারও কাছে কোনো দেনা নেই, সুতরাং আমার কোনো দেনা পরিশোধ করতে হবে না। যেসব সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ এস্টেটে শামিল করা হলো, তা আমার কোনো ওয়ারিশ অথবা মুতাওয়াল্লি, মৌলবি ও মুয়াজ্জিনদের ওয়ারিশদের দেনা শোধের জন্য নিলামে বিক্রি করা যাবে না। আমি নেক কাজের জন্য এই ওয়াক্‌ফনামা কার্যকর করে গেলাম। এতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকারের থাকবে না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ-সচেতন মনে ওপরে বর্ণিত বিধিবিধান ধার্য করে দিয়ে একান্ত আল্লাহর ওয়াস্তে এই ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করে গেলাম।

২৭. আজ থেকে এই ওয়াক্‌ফনামা কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন পর্যন্ত কেবল আমি প্রধান তদারককারী হিসেবে মুতাওয়াল্লিরা কেমন কার্য পরিচালনা করছে, তার তদারক করতে পারবে। তবে জীবিত থাকা অবস্থায় আমি অন্য কোনো উইল বা হেকনামা করতে পারব না এবং করলেও অগ্রাহ্য গণ্য হবে। আমি আমার ওয়ারিশদের সকলের সম্মতি নিয়ে এই ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করলাম। এতদ্দ্বারা আরও ঘোষণা করা যাচ্ছে যে মুতায়াল্লিরা যদি মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং এই ওয়াক্‌ফনামার ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ নম্বর পরিচ্ছদে বর্ণিত এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনে যেভাবে আমি চেয়েছি সেভাবে টাকাপয়সা ব্যয় না করে ও গাফলতি করে, তাহলে তারা আখেরাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আদালতে দায়ী হবে।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

যেহেতু ওয়াক্ফে অন্তর্ভুক্ত আমার সমুদয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, জায়গা-জমি, পাকা ও কাঁচা (খড়ের) ঘর-দুয়ার, গরু-মহিষ, পশু-পাখি, হাট-বাজার অন্যান্য সম্পত্তি আদী তালিকাভুক্ত করা সম্ভব নয়, তাই ১৮৫৬ সালের ১৮ নং আইনের ৫১ ধারায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নম্বর উপধারা মোতাবেক মোট ১৬ টাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই ওয়াক্ফনামা রেজিস্ট্রি করা হলো।

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১২৮৩ বাংলা সাল

মোতাবেক: ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬

লেখক: ধর্মপুর নিবাসী কালি কিংকর দাস মজুমদার

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

পুনশ্চ

আমার বইটা যখন মুদ্রণের জন্য যাচ্ছিল, তখন ৫ আগস্ট (২০২৪) এক ভূমিকম্প হয়ে গেল বাংলাদেশে। মানসিক বিকারগ্রস্ত, জনসমর্থনহীন, স্বৈরাচারী হাসিনা ছাত্র-জনতার উত্তাল বিপ্লবের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়ে ঠেকলেন দিল্লিতে তার আসল প্রভুদের পায়ের তলায়। হাসিনার ১৫ বছরের শাসন বাংলাদেশের জনগণের মিলিত মননে চিরকাল এক বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো জাগরূক হয়ে থাকবে। নির্বাচনের মিথ্যা খোলস পরে ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশে তিনি রচনা করেছিলেন গণতন্ত্রের কবর। একে একে ধ্বংস করেছিলেন পুলিশসহ সব নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিচারব্যবস্থা। দুর্নীতিবাজ মাফিয়া চক্রের দস্যুরানি হাসিনা অবাধ লুটতরাজের চারণভূমিতে পরিণত করেছিলেন গোটা দেশটাকে। তিনি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা লুট করে পাচার করেছেন অযুত লক্ষ কোটি ডলার। দেশের সব ব্যাংককে করে গেছেন দেউলিয়া। গুম, খুন, হত্যার এক অবর্ণনীয় প্রলয়লীলা চালিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক ভয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীরও বালির বাঁধের মতো মুহূর্তে উড়ে গেল, যখন বাংলার বীর তরুণেরা ভয়কে জয় করে দুহাত মেলে প্রবল বিক্রমে বুক পেতে দিলো বন্দুকের সামনে। জল্লাদিনী হাসিনার জুলুমবাজ, অভিশপ্ত অধ্যায়ের অবসান হলো বাংলাদেশে।

এর মাত্র দেড় মাস আগে অনেকটা যেন হাসিনার পতনের পূর্বসংকেত হিসেবে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আদালত ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট দেশের হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে করা মানহানির মামলায় আমার সপক্ষে ঘোষণা করলেন এক যুগান্তকারী রায়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লর্ড রিডের সভাপতিত্বে পাঁচজন লর্ড জাস্টিসের সমন্বয়ে গঠিত এই বেঞ্চ ২০২৩ সালের ১ ও ২ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী শুনানির পর ২০ জুন ২০২৪ এই রায় ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৪৫ পৃষ্ঠার এই ঐতিহাসিক রায়ে বিজ্ঞ বিচারপতিরা সর্বসম্মত হয়ে আমার আনা মানহানির মামলা খারিজ করার ব্রিটিশ হোম অফিসের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দেন। রায়ের শুরুতে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই মামলার ইতিহাস বর্ণনা করে বলা হয়:

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

'২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে হোম অফিসের কমিশন ফর হেটফুল এক্সট্রিমিজম কর্তৃক "চ্যালেঞ্জিং হেইটফুল এক্সট্রিমিজম" শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টের "হোয়াট এক্সট্রিমিজম লুকস লাইক ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস" পরিচ্ছেদে (৫৪ পৃষ্ঠা) ইডিওলজিকেল অ্যান্ড সেকটেরিয়ান ভায়োলেন্স হেডিংয়ে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭১ সালে (বাংলাদেশের) হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে পূর্ব লন্ডনে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্কের বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার। যেমন— ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মুঈনুদ্দিনকে তার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক বিচারে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। (দেখুন চ্যানেল ফোর–২০১৩, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ব্রিটিশ মুসলিম নেতার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ)'

২০২০ সালের ১৯ জুন এই রিপোর্টের জন্য চৌধুরী মুঈনুদ্দিন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (সেই সময়ে প্রীতি পেটেল) বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেন। ১৯২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের প্রাথমিক শুনানিতে লেডি জাস্টিস টিপলস রায় দেন 'যেহেতু রিপোর্টে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে বাদী (চৌধুরী মুঈনুদ্দিন) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী, সত্যিকার অর্থে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের চেয়ে অধিক গুরুতর কোনো অপরাধ কল্পনাও করা যায় না। এটা আরও বেশি গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন এ দেশের সরকার দেশের এক নাগরিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে। স্বাভাবিক ও সাধারণ উভয় অর্থেই এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, সুতরাং সাধারণ আইনে (কমন ল) মানহানিকর।'

অতঃপর হোম অফিস নিজেদের জবাব দাখিল করার পরিবর্তে মামলাটিকে পদ্ধতির অপব্যবহার (অ্যাবিউজ অব প্রসেস) আখ্যায়িত করে খারিজ করে দেওয়ার আবেদন করলে ২০২১-এর ১৫ নভেম্বর সার অ্যান্ডরু নিকল হাইকোর্টের জাজ হিসেবে বসে শুনানি করেন এবং মামলাটি খারিজ করে দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে চৌধুরী মুঈনুদ্দিন কোর্ট অব এপ্রিলে আপিল করলে ২৮ জুলাই ২০২২ তিন সদস্যের একটি বেঞ্চে এর শুনানি হয়। ডেইম ভিক্টোরিয়া শার্পের সভাপতিত্বে গঠিত এই বেঞ্চের অপর দুজন সদস্য ছিলেন লর্ড জাস্টিস ডিঙ্গহাম ও লর্ড জাস্টিস ফিলিপস। দুই দিনব্যাপী শুনানি শেষে কোর্ট অব এপ্রিল বিভক্ত রায় দেন, দুজন হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার পক্ষে এবং একজন লর্ড জাস্টিস ফিলিপস বিপক্ষে রায় দেন। তিনি অপর দুজনের রায়ের কঠোর সমালোচনা করে একে সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত (আন-প্রিন্সিপল্ড) বলে মন্তব্য করেন। এরপর বাদী চৌধুরী মুঈনুদ্দিন এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করেন।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, বিবাদী পক্ষ (হোম অফিস) বাদীর অভিযোগের কোনো জবাব বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রতিবেদন দাখিল করা ছাড়াই মামলাটি খারিজ (স্ট্রাইক অফ) করায় হাইকোর্ট তা অনুমোদন করা সংগত হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাদী চৌধুরী মুঈনুদ্দিনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে অপারগ হলেও তিনি নির্বিচারে বাদীর মানহানি করতে পারেন— একথা মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশি আইসিটির রায় অবিচারমূলক হলেও বাদীর মানহানির মামলা খারিজ করে দেওয়া হোক— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই আবেদন নিতান্তই আশ্চর্যজনক। অপব্যবহারের বিরোধিতা এজন্য করা হয়, যেন বিচার পদ্ধতির ওপর জনগণ আস্থা না হারায়, কিন্তু মন্ত্রীর আবেদন অনুমোদন করলে সম্পূর্ণ উল্টো ফল হবে। সুতরাং এই মামলা আইসিটির রায়কে চ্যালেঞ্জ করলেও এটা মোটেই বিচার পদ্ধতির অপব্যবহার নয়।

রায়ের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশি আইসিটির রায় কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তার প্রমাণ হিসেবে ইন্টারপোলের চৌধুরী মুঈনুদ্দিনের ওপর জারি করা 'রেড নোটিশ' প্রত্যাহারের রায় থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্টারপোল বাংলাদেশ সরকারের আবেদনে চৌধুরী মুঈনুদ্দিনের ওপর একটি 'রেড নোটিশ' জারি করে। এই নোটিশ জারি করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাকে আবেদনকারী দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য গ্রেপ্তার করতে। ২০১৮ সালে চৌধুরী মুঈনুদ্দিনের পক্ষ থেকে পেশ করা বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রেড নোটিশটি বাতিল করা হয়। বাতিল করার কারণ হিসেবে ইন্টারপোল কমিশন রায়ের ৪৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলেন: বাদীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের দাখিল করা তথ্য ও আইসিটির বিচার পদ্ধতি ইন্টারপোলের গঠনতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার শর্ত পূরণ করে না। ইন্টারপোল কমিশন আরও বলেন, বাতিল করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিশ্বজোড়া কীভাবে এই ট্রাইব্যুনালের বিচার ও রায় নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তা-ও তারা বিবেচনায় নিয়েছেন।

ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের এই যুগান্তকারী রায়ে সমাজমাধ্যম ও নেট দুনিয়ায় বিপুল সাড়া পড়ে যায়। প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক পিনাকী ভট্টাচার্য ২৯ জুন ২০২৪ এই রায়ের ওপর ভিত্তি করে একটা তথ্যবহুল ভিডিও প্রতিবেদন প্রচার করেন। ইউটিউবের পরিসংখ্যান মতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিবেদনটি এক মিলিয়নের ওপর দর্শক আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাংলাদেশি ট্রাইব্যুনালের বিচার কীভাবে আন্তর্জাতিক মানে সম্পূর্ণ

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

অগ্রহণযোগ্য, তার বিবরণের সঙ্গে পিনাকী ভট্টাচার্য আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ও অপপ্রচারের উৎসমূল থেকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে এর সূচনা হয়েছে শুধু এক সহকর্মী *পূর্বদেশ*-এর সাংবাদিক আতিকুর রহমানের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের ফলে। ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই সে আমাকে আলবদরের অপারেশন ইনচার্জ হিসেবে চিত্রিত করে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনই ঢাকায় এবং সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে প্রচার ও পুনঃপ্রচার হতে থাকে। শুধু আমার (ও আতিকুর রহমানের) পত্রিকা *দৈনিক পূর্বদেশ*-এ প্রকাশ করা হয়নি। আমাদের পত্রিকার বার্তা সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, যিনি সে সময় পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকও ছিলেন, কোনোমতেই একথা মানতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত আতিকুর রহমান সশস্ত্র যুবকদের এনে ভয় দেখিয়ে ছাপতে বাধ্য করেন। পিনাকী তার প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন যে এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ আতিকুর রহমান তার রিপোর্টের একমাত্র সোর্স হিসেবে ১৬ ডিসেম্বরের পর তার কাছে দেওয়া আবদুল খালেক মজুমদারের স্বীকারোক্তিকেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবদুল খালেক মজুমদার একটা সিলমোহর করা এফিডেভিটে পরিষ্কার করেছেন যে এ ধরনের কোনো কথা তিনি আতিকুর রহমানকে বলা তো দূরে থাক, তার দীর্ঘ মামলায় কোনো পর্যায়ে কারও কাছে বলেননি। আর আতিকুর রহমানের সঙ্গে তার কখনো দেখাও হয়নি। সুতরাং পুরো গল্পটাই যে সম্পূর্ণ বানোয়াট, এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টে যখন আমার মামলার রায় ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন দেশে সাধারণ নির্বাচনে নতুন লেবার দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসে। প্রধান বিচারপতি লর্ড রিড রায় ঘোষণা করার পর আমার লিগ্যাল টিমসহ আমরা সুপ্রিম কোর্টের ক্যাফেটেরিয়ায় চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় হোম অফিসের ব্যারিস্টার আমাদের আইনজীবীকে ফোন করে বললেন, এই রায়ের ফলে হোম অফিস ২৮ দিনের মধ্যে তাদের ডিফেন্স দাখিল করতে বাধ্য। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের এই পালাবদলের মুহূর্তে তারা আরও ২৮ দিনের বাড়তি সময় চান, আমরা তা দিতে সম্মত আছি কিনা। আমরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করলাম। এই বাড়তি সময় শেষ হলে তারা আরও ১৫ দিন বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে তাও দেওয়া হলো। তারপর হোম অফিস শর্তহীন ক্ষমা চাইতে এবং মামলার এ পর্যন্ত সকল খরচাদি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার প্রস্তাব দিলে আমরা তা গ্রহণ করি।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

আলোকচিত্র

www.nagorikpathagar.org

CamScanner

কলকাতায় লেখকের আব্বা, আম্মা, বড় দুই ভাই ও ছোট খালা। লেখকের জন্মের আগের ছবি।

কলকাতার খিদিরপুরে যে বাসায় লেখকের জন্ম।

www.nagorikpathagar.org
CamScanner

বংশলতিকা

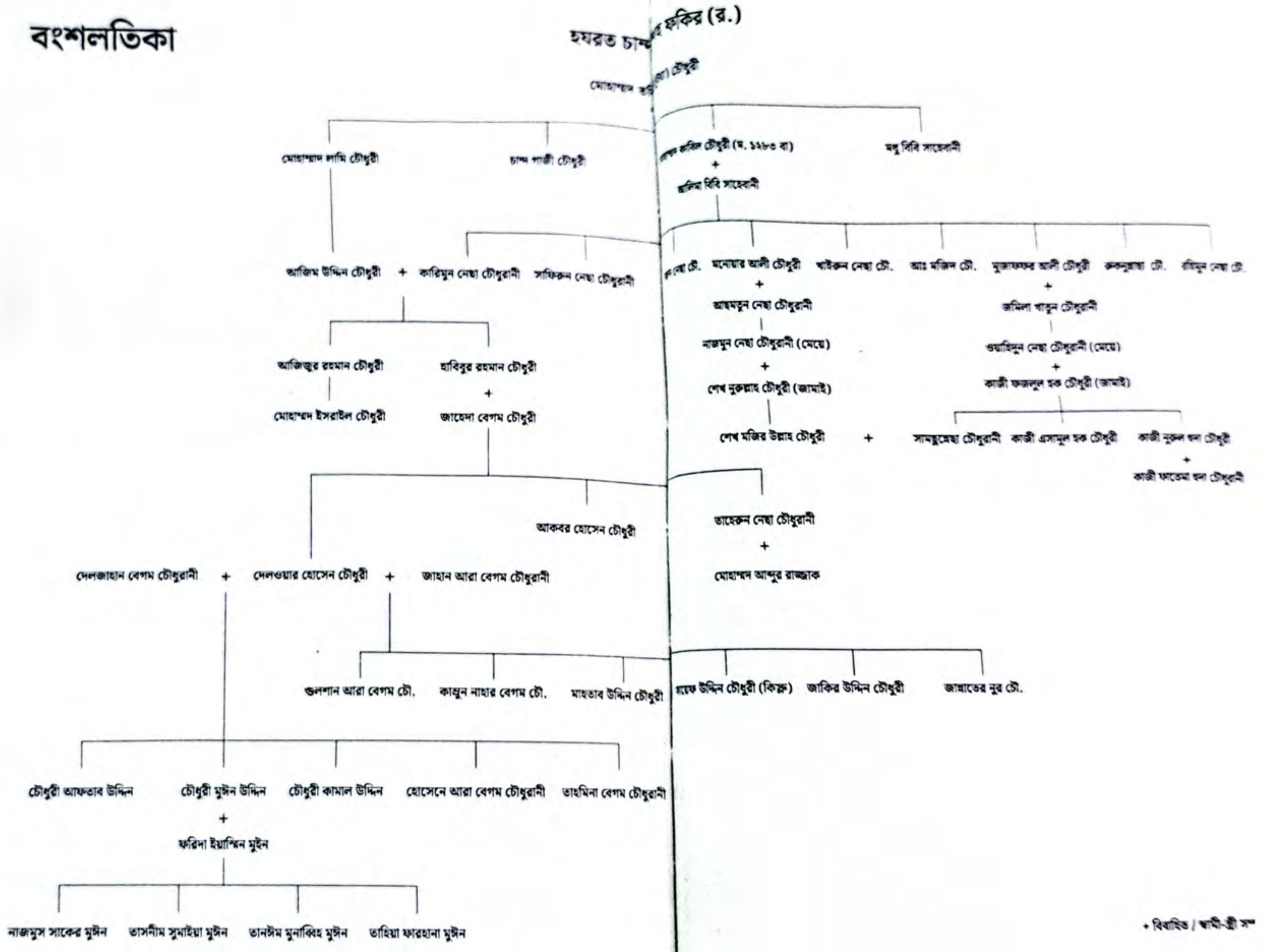

CamScanner